বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭৫

১ম প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৬
পৌষ	১৪১২
ডিসেম্বর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BTORKETO JERUJALEM NAGORE by Prencipal Mohammad Abdul Majid. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 120.00 Only.

প্রথম অধ্যায়

জেরুজালেম নগরীর ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেরুজালেম ও ক্রুসেড

তৃতীয় অধ্যায়

জায়নবাদীদের চক্রান্ত ও ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

প্যালেস্টাইনের ইহুদী ও মুসলিম নেতাদের জীবনী

পঞ্চম অধ্যায়

ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ স.-এর ভবিষ্যদ্বাণী

চিত্রসূচী

মানচিত্র সূচী

প্রথম অধ্যায়

জেরুজালেম নগরীর ইতিহাস

১.১ জনশ্রুতিতে পবিত্র জেরুজালেম নগরী

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত নগরী—'জেরুজালেম'। মহান এ জেরুজালেমকে অনেকে অনেক নামেই আখ্যায়িত করেছেন ; কেউ বলেন, 'আল-কুদ্স', কেউ একে বলেন, 'আওরোশোলিম', আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট এটা 'দারুস্ সালাম' ও 'বায়তুল মুকাদ্দাস' নামেই অধিক পরিচিত। তবে এ মহান নগরীকে যে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, আন্তর্জাতিকভাবে এটা 'জেরুজালেম' নামেই খ্যাত।

১.২ পবিত্র জেরুজালেম নগরীর ঐতিহাসিক মূল্য ও গঠন বৈচিত্র

প্রাচীনকালে সভ্যতা, সৌন্দর্য ও পবিত্র শিক্ষার বিচিত্র সম্মীল ও কীর্তিমান স্থান বলে বিশ্বে যে সকল নগরী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলো তন্মধ্যে প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরী অন্যতম। বিশ্বে একমাত্র পবিত্র মক্কা ছাড়া জেরুজালেম নগরীর সাথে অন্য কোনো নগরীর নাম উল্লেখ হবার যোগ্য নয়। গৌরবের দিনে জেরুজালেমের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ, শিক্ষা ও সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ ও বিজয়-উল্লাস একত্রিত হয়ে একে কবিচিত্ত সম্মোহন, কল্পনাতীত সুন্দরী ও সুখময়ী করে তুলেছিলো। সারা জাহানের বিভিন্ন দেশ থেকে তীর্থ যাত্রী ও ভ্রমণকারীরা কৌতূহল বশত জেরুজালেমের বিশ্ব-বিশ্রুত, পূত-পবিত্র ও সৌন্দর্য গরিমায় বিমুগ্ধ হয়ে যুগ যুগ ধরে এখানে আগমন করতো এবং বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এর অবস্থান গঠনশৈলী, সৌন্দর্য, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সুখ-শান্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে মুক্তকণ্ঠে এর প্রশংসাকীর্তনে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতো। নবী-রাসূল কুঞ্জপুরী এ জেরুজালেম নগরী থেকে যখন সভ্যতার স্বর্গীয় প্লাবন, বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান গরিমার উত্তাল তরঙ্গমালা বুকে ধারণ করে কুসংস্কার-জঞ্জাল পরিপূর্ণ বিশ্বকে বিধৌত করবার জন্য দিকে দিকে তীরবেগে ছুটে যায়, তখন বর্তমান জ্ঞান-গর্বিত তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইংরেজ, ফরাসী-জার্মান, মার্কিন এবং রাশান জাতির পূর্বপুরুষরা পহাড়ের গুহায় ও বনে জঙ্গলে আদিম জীবনযাপন করতো। নগরীকুল সম্রাজ্ঞী পূত-পবিত্র জেরুজালেম সৌন্দর্যচ্ছটা ও ঐতিহ্য ঘটনা—নবী-

খলীফাদের প্রাণঢালা দোয়া অজস্র অর্থব্যয় ও আন্তরিক কর্মতৎপরতা, ভাস্কর-কারু ও স্থপতিদের কারুকৌশল ও গঠন নৈপুণ্য এবং উন্মুক্ত সৌন্দর্যের স্বর্গীয় ভাব-ভঙ্গীমায় বিচিত্র পটের ন্যায় প্রতীয়মান হতো। নবী নগর জেরুজালেমের তুষারধবল মর্মর প্রস্তর নির্মিত কারুকার্য শোভিত অসংখ্য প্রাসাদ ও সৌধ, নানা জাতীয় সুস্বাদু, সুদৃশ্য ও সুগন্ধ ফল-ফুলে ভরপুর তরুলতা শোভিত বিস্তৃত ময়দান ; নাগরিকদের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, সদাচার ও সদালাপ ; তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞান ও বাকপটুতা দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রগণের রণনৈপুণ্য ও বিজয় গাঁথা এবং গিরি-বুরুজ, স্বর্ণচূড় রমণীয় মসজিদসমূহ ; অভ্রভেদী সুদৃঢ় দুর্গ ইত্যাদির মনোরম দৃশ্যে জেরুজালেম ভুবনমোহিনী নগরী হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি লাভ করেছিলো। ফলত তৎকালের সুসভ্য ও সুমুন্নত জাতির নাগরিক জীবনের যাবতীয় আবশ্যকীয় উপকরণ এবং দ্রব্যাদি একত্র সম্মিলিত ও সুশৃংখলিত হয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত ত্রিধর্মের চারণক্ষেত্র পবিত্র এ জেরুজালেমকে ভূ-স্বর্গে রূপান্তরিত করেছিলো। তাই বর্তমান কালের ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী উক্ত নগরীর প্রতি পুরাকাল থেকেই ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান জাতির এক গভীর প্রাণের টান রয়ে গেছে। এজন্য জেরুজালেম সমস্যা বর্তমান বিশ্বের একটি জটিলতম সমস্যা। পর্যবেক্ষকদের ধারণা এ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

১.৩ পবিত্র জেরুজালেম নগরীর সৃষ্টির ইতিহাস

জেরুজালেম নগরীর নামকরণ ও সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রয়োজন।

প্যালেস্টাইনের আদি অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলো গোত্র ছিলো ; 'জেরুসাইতরা' গোত্র এদের অন্যতম। যেমন প্রাচীন ভারতে 'ইউ-চি' গোত্রসমূহের মধ্যে 'কুষাণ' গোত্রই ছিলো প্রভাবশালী এবং কালক্রমে নিজেদেরকে ইতিহাসের পাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয় ; ঠিক তেমনিভাবে এ 'জেরুসাইতরা' গোত্র নিজেদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের ইতিহাসে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, অতি প্রাচীনকালে প্যালেস্টাইনের সবচেয়ে প্রভাবশালী এ 'জেরুসাইতরা' গোত্র জর্দান নদীর মোহনার পশ্চিমস্থ দু' হাজার পাঁচ শো ফুট উচ্চ পর্বতের উপর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র গড়ে তোলে। দূর-দূরান্তের দেশ থেকে দলে দলে বহু কাফেলা আসতো এখানে কেনা-বেচার জন্য। ফলে ব্যবসার এ নতুন কেন্দ্রটিকে কেন্দ্র করে অতি অল্পকালের মধ্যেই গোটা

প্যালেস্টাইনই এত দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্যালেস্টাইনবাসী উক্ত ব্যবসা কেন্দ্রটির নামকরণ করেন 'জেরুসালেম' বা 'শান্তির নগরী'।

আবার লোক-কাহিনী হতে জানা যায়, 'ইউরোশালেম' নামে এখানে বসবাসরত একটি জনপদের নাম হতেই 'জেরুজালেম' নামের উৎপত্তি। এ মতবাদে বিশ্বাসী কিছু গবেষকের মতে—হিব্রু 'ইউরোশেলিম'-এর বিবর্তিত নামই 'জেরুজালেম'। ল্যারিকলিন্স এবং ডোমিনিক লেপিয়ার এ মতেরই উল্লেখ করে বলেন ঃ

"Yet her name, according to legend, came from the ancient Hebrew 'Yerushalayim', meaning 'City of Peace', and her first settlements had stretched down from the Mount of Olives under a grove of palm trees whose branches would become a universal symbool of peace. An unending stream of prophets had proclaimed her the peace of God to man, and David, the Jewish King who had made the city his capital, had celebrated it with the words—'Pray for the peace of Jerusalem'."

ইহুদীরা হেব্রন থেকে জেরুজালেম আসার এক হাজার বছর আগে এ জেরুজালেম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব দু' হাজার শতকের মাঝামাঝি সময়ে। মিসরীয় পত্র লিপিতে উল্লেখ আছে যে, ঐ সময় জেরুজালেম শহরে 'কানানীয়রা' বসবাস করতো। উল্লেখ্য, তখন বর্তমানের প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনের নাম ছিলো 'কানান'। তাওরাত ও ইঞ্জিলে, এ 'কানান' শব্দটিই বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। "যে বাইবেলকে ইহুদীবাদী ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদরা এ মহান নগরীর উপর ইসরাইলী অধিকার স্বীকৃতির "তর্কাতীত উৎস" বলে প্রচার করে, তাতে উল্লেখ আছে যে, জেরুজালেমে কানানীয়দের অন্যতম গোত্র জেরুসাইতরা বাস করতো। তখন থেকেই এ শহরের নাম জেরুসালেম অর্থাৎ শান্তির নগরী। অতএব, কানানের আদি বাসিন্দা যে কানানীয়রা এতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। এবং যারাই কানানীয়রা তারাই যে প্যালেস্টাইনী বা ফিলিস্তিনিরা তাও পরিষ্কার হয়ে গেলো। তবুও এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনবোধ করছি।

১.৪ মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে মানুষের আবাদ

হযরত নূহ আ.-এর সময়ে বিশ্বে এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। এ প্লাবনে বিশ্বের প্রাণীকুল ও গাছ-লতারাজি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে

গিয়েছিল। কেবল ঐগুলোই বেঁচে ছিলো যেগুলো নূহ আ. তাঁর বৃহদাকার ঐ নৌকাটিতে সংরক্ষণ করেছিলেন।-চল্লিশ দিন পর—সে মহা'প্লাবন' থেমে গেলে উক্ত নৌকাটি ইরাকের জুদী পাহাড়ের (বর্তমানে অঞ্চলটি মিসরের ভূখণ্ড) পাদদেশে ধীরে ধীরে এসে মাটি স্পর্শ করে এবং এখান থেকেই আবার জনবসতি গড়ে ওঠে।

হযরত নূহ আ.-এর পুত্র হাম, সাম এবং ইয়াফেসের বংশধরেরা কুর্দিস্তান এবং আর্মেনিয়া অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন জনপদ গড়ে তোলে।[১] কালক্রমে এদের বংশবৃদ্ধি ও অবস্থা এমন হয় যেমন হয়ে থাকে বিশাল জলাশয় বা নদীর কচুরিপানার অবস্থা। পটকচুরিগুলো যেমন কালের অমোঘ নিয়মেই দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং স্থান পরিবর্তন করতে থাকে; মহাপ্লাবনের পর মানুষের বেলাতেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়। বংশ বৃদ্ধির কারণে তাদের ভিতর বিভিন্ন কারণে সংঘাত দেখা দেয়। তাই একান্ত বাঁচার তাগিদেই শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠি বিশ্বের বিশাল বক্ষে সুখের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং যেখানেই বেঁচে থাকার ও শান্তির উপকরণ পেয়েছে সেখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসতি স্থাপন করেছে।

১.৫ বিভিন্ন নগররাষ্ট্র

এ জনপদগুলো কালক্রমে সুসমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং এটাকে কেন্দ্র করেই 'নগররাষ্ট্রের' সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে খৃস্টপূর্ব ৫,০০০ সালের দিকে ইউফ্রেতিস নদীর তীরে গড়ে ওঠে 'সুমের' নগররাষ্ট্র। আরো উত্তরে গড়ে ওঠে 'আক্কাদ' নগররাষ্ট্র, আনাতোলিয়া মালভূমির একাংশে 'হাত্তি' নগররাষ্ট্র সমৃদ্ধ হতে থাকে। খৃস্টপূর্ব ৪,৩০০ সাল নীল নদের অববাহিকায় দুটি নগররাষ্ট্র 'মেমফিস' এবং 'থীবীস' বেশ তরতর করে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। খৃস্টপূর্ব ৩০০০ সালে একদল সেমিটিক তাইগ্রিস নদীর তীরে 'আসুর' নগররাষ্ট্র গড়ে তোলে। খৃস্টপূর্ব ২৫০০ সালে আরব উপদ্বীপের 'কানান' গোত্র দক্ষিণ সিরিয়ায় এসে গড়ে তোলে 'কানান জনপদ'। তার ৩০০ বছর পরে ব্যাবিলন নগররাষ্ট্রের পত্তন হয়। কিছুকালের মধ্যে নিকটবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে 'উর' 'লারসা' প্রভৃতি নগররাষ্ট্র।

উল্লেখ্য, এসব সভ্যতার বহু পূর্বেই অর্থাৎ আজ থেকে ৭০০০ বছর পূর্বে এ বঙ্গে ইসলামী সভ্যতার পত্তন ঘটেছিল।–বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ৪র্থ খণ্ড

---

১. 'হাম' থেকে 'হ্যামিটিক', 'সাম' থেকে 'সেমিটিক' এবং ইয়াফেস-এর থেকে 'আর্য' জাতির উৎপত্তি।–বাংলা বিশ্বকোষ

১.৬ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সৃষ্টির ইতিহাস

২০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে ক্রীট থেকে এসে 'ফিলিস্তাইন' গোত্র দক্ষিণ সিরিয়ায় বসতিস্থাপন করে এবং সেখানে তারা 'ফিলিস্তিয়া' নামে এক জনপদ গড়ে তোলে। একই সময়ে লোহিত সাগরের তীর থেকে আগত একটি গোত্র ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে 'টয়ার' 'সিডন', 'বিব্লুস্' এবং 'আবাদুস্' নগর গড়ে তোলে। পুরো এলাকাটি পরিচিত হয় 'ফিনিশিয়া' নামে। পরতীকালে 'কানান' 'ফিলিস্তিয়া' এবং 'ফিনিশিয়া' অঞ্চল 'ফিলিস্তিন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ফিলিস্তিনেরই বিবর্তিত নাম 'প্যালেস্টাইন'। খৃস্টপূর্ব ১৪০০ সালে আরব মরুর যাযাবর 'হাবিরু' গোত্র ফিলিস্তিনে এসে বসবাস শুরু করে। এ হাবিরু গোত্র থেকেই উৎপত্তি হয় 'হিব্রু' জাতির।

ফিলিস্তিন ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় এর পরিবেশ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। ছোট বড় অনেক পাহাড় আছে এখানে। এসব পাহাড়ের উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর। এখানে গম, রাই, বার্লি এবং আঙুর প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ছাগল এবং মেষ পালনের চারণভূমিগুলো অত্যন্ত চমৎকার। ফিলিস্তিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উর্বরতা দেখে যুগে যুগে বহু গোত্র এখানে ছুটে এসে ভীড় জমিয়েছে এবং সারা ফিলিস্তিনে বহু জনপদ গড়ে তুলেছে—জেরুজালেম এগুলোর অন্যতম।

১.৭ পবিত্র জেরুজালেম নগরীর বিন্যাস ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

চাকা ঘুরার সাথে সাথে যেমন বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের দৈহিক গঠনের পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি জেরুজালেম নগরীরও ঢের পরিবর্তন ঘটেছে। বছরে বছরে নগরীটির বক্ষ যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে; পূর্বেকার তুলনায় তাঁর রূপেরও পরিবর্তন হয়েছে আরো অধিক।

এ মহান নগরীটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। পূর্বাংশ 'পুরাতন জেরুজালেম' এবং পশ্চিমাংশ' নতুন জেরুজালেম' নামে খ্যাত। নতুন জেরুজালেম ইসরাঈলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র। এখানে বহু সরকারী ভবন, স্কুল, প্যালেস্টাইন সম্পর্কে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম এবং ইহুদীদের কয়েকটি সিনাগগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাতন জেরুজালেম একটি চতুর্কোণ ক্ষেত্র—দু'টি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এবং হযরত সুলাইমান আ. কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

প্রাচীরের মধ্যে চারটি মহল আছে। পূর্বদিকে মুসলিম মহলে অবস্থিত ঐতিহাসিক 'বায়তুল মোকাদ্দাস'। এটা ধর্মপ্রাণ ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান —উভয়ের নিকটই অতীব পবিত্র। ইতিপূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাসই ছিলো তাওহীদবাদী সকল শ্রেণীর মানুষের 'কেবলা'। ইসরাঈল বংশীয় নবী ও

পবিত্র জেরুজালেমের ঐতিহাসিক স্থান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ
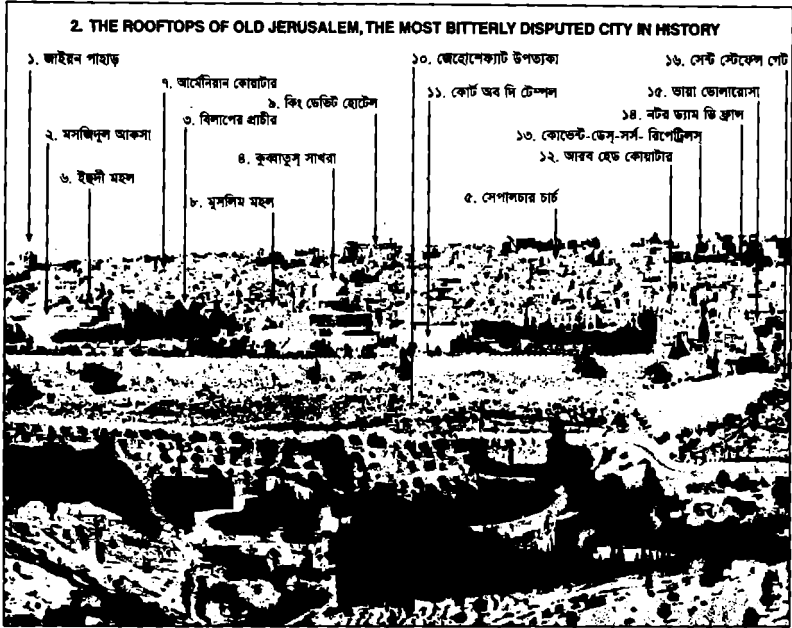
চিত্র ১ ঃ জেরুজালেম নগরীর চিত্র।

১. **জাইয়ন পাহাড় ঃ** পবিত্র জেরুজালেমে হযরত দাউদ ও সুলাইমান আ. এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের উপাসনালয় এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপ যেটাকে কেন্দ্র করে একদা গড়ে উঠেছিলো সেই ঐতিহাসিক অনুচ্চ পাহাড় 'জাইয়ন' নামে পরিচিত। এটাকে কেন্দ্র করেই তাই ইহুদী সম্প্রদায় 'জাইয়নবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো, জেরুজালেমকে রাজধানী করে আবার প্যালেস্টাইনে বনী ইসরাঈলদের জন্য স্বাধীন একটি 'ইসরাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে তারিখে তা তারা করতে পূর্ণ সক্ষম হয়।

২. **মসজিদুল আকসা ঃ** হযরত সুলাইমান আ. এ ঐতিহাসিক মসজিদটি তৈরি করেন। কালের কষাঘাতে এ মসজিদটিও একদা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হতে যায়। খলিফা আবদুল মালেক এর সংস্কার সাধন করে। এজন্য ইউরোপের ঐতিহাসিকেরা ভুল ক্রমে এটাকে 'ওমরের মসজিদ' বলে থাকে। সৌন্দর্য ও গঠন নৈপুণ্যের দিক দিয়ে এ মসজিদটি বিশ্বের মসজিদ-সমূহের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু বরকত ও ফযীলতের দিক দিয়ে এটা তৃতীয় মানের অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধান হযরত দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর গৌরবান্বিত রাজত্বকাল এটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। হযরত ঈসা আ, যিনি খৃস্টানজগতে 'যিশুখৃস্ট, নামেই অধিক পরিচিত, তিনি এ জেরুজালেমেরই নিকট বায়তুল্লাহাম-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এটাকে কেন্দ্র করেই একত্ববাদী ধর্ম 'ইসলাম' প্রচার করতে যেয়েই অভিশপ্ত ইহুদী সম্প্রদায়ের রোষানলে পড়েন। পরিশেষে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাঁকে সশরীরে উঠিয়ে নেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য খৃস্টানরা জেরুজালেমের প্রতি দারুনভাবে আকৃষ্ট। অন্যদিকে পবিত্র কা'বা শরীফকে আল্লাহ্ কর্তৃক 'কিবলা' ঘোষিত হবার পূর্বে এটাই ছিলো মুসলমানদের 'কেবলা'।

মহান জেরুজালেমের বিশ্ব বিশ্রুত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ এবং পূত-পবিত্রতার প্রতি বিশ্ববাসী যুগ যুগ ধরে গভীরভাবে আঁকৃষ্ট হয়েছে এবং সুযোগ পেলেই তারা একে একান্ত আপন করে নিতে চেয়েছে। আর এ জন্যই ঐশ্বর্যময়ী জেরুজালেম আদরিণীর বারবার বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝখানে পড়ে দারুনভাবে হেস্তনেস্ত হতে হয়েছে। তাঁর তুষারধবল সুমসৃণ পেলবতার ওপর হায়ানাদের দন্ত নখরের অসংখ্য ছাপ পড়েছে—রক্তে রঞ্জিত হতে হয়েছে বারবার তাঁকে। এমনিভাবে পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ জেরুজালেম সুন্দরীর একচল্লিশ বার আক্রান্ত হতে হয়েছে। এ আক্রমণ-কারীদের কেউ কেউ দস্যু তস্করের মতো লুটপাট করে ফিরে গেছে ; আবার কেউ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শাসন করেছেন।

এ ঐহিত্যবাহী মসজিদটির সুউচ্চ এবং অত্যন্ত সুন্দর চারটি মিনার আছে। এর তিনটি পবিত্র হেরেম শরীফের তিন কোণায় এবং একটি মিনার পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

এ মসজিদুল আকসার চারদিক ঘিরে নার্গিস, জাইতুন, গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও মনোরম দৃশ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এ মহান মসজিদের দশটি দরোজা আছে। প্রথমটির নাম 'বাবুল-আরাক' দ্বিতীয়টির নাম 'বাবুল বাসালসালা', তৃতীয়টির নাম 'বাবুস্ সাকিনা', চতুর্থটির নাম 'বাবুল মোতহেরা' ; এরূপে পঞ্চমটি 'বাবুল কুস্তাতিন্', ষষ্ঠটি 'বাবুল হামীদ', সপ্তমটি 'বাবুল নাযীর' অষ্টমটি 'বাবুল নাহীম,' নবমটি 'বাবুল হুত' এবং দশমটি 'বাবুল আসাবাত' নামে সুপরিচিত।

তাফসীরকারগণের মতে, এ ঐতিহাসিক মসজিদুল আকসাতেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. মে'রাজে যাবার প্রাক্কালে নবীগণের ইমাম হয়ে নামায পড়েছিলেন। এর চার পাশে অতীতের অনেক নবী-রাসূল ও মহাপ্রাণরা শায়িত রয়েছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, পবিত্র মক্কার পরই মসজিদুল আকসা-ই সর্বাধিক প্রাচীন।

৩. **বিলাপের প্রাচীর ঃ** মসজিদুল আকসার চারদিকে কংকর মিলানো পাথরের তৈরি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এটাকেই হারাম শরীফ বলা হয়।
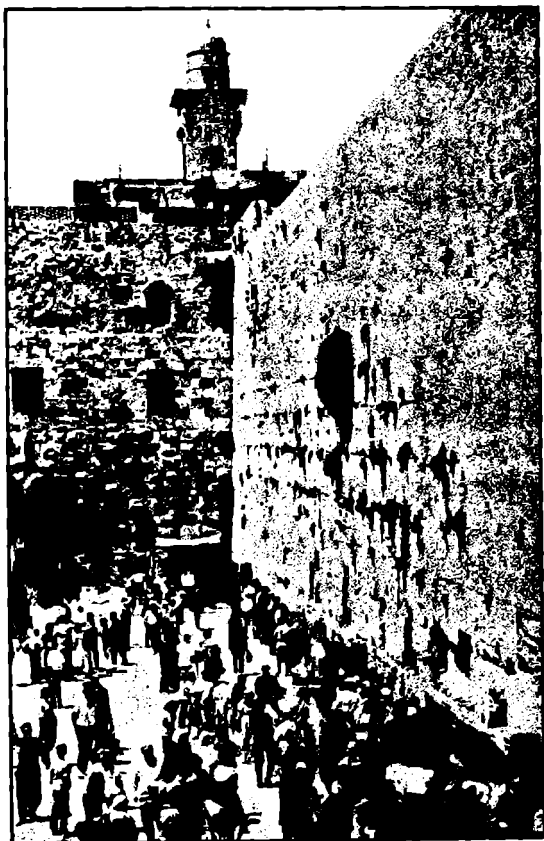
চিত্র ২ ঃ বিলাপের প্রাচীর।

পরিমাপের দিক দিয়ে উক্ত হারাম শরীফের পূর্ব দিকে ২৮০০ ফুট, পশ্চিম দিকে ২৩০০ ফুট, উত্তর দিকে ৩৮০০ ফুট ও দক্ষিণ দিকে ৩৫৫৫ ফুট লম্বা।

গঠন নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের এ হারাম শরীফ মক্কার মহান কা'বা শরীফেরই অনুরূপ।

মসজিদুল আকসার চার দিক ঘিরে এ হারাম শরীফ অবস্থিত। ভিতরে ঢোকার জন্য বারোটি গেট আছে। এগুলোর তিনটি পূর্ব দিকে। যথা—(ক) 'তুলি ফটক, যেটা বাবুল হারাম নামেই অধিক পরিচিত ; (খ) 'সাহরা ফটক', যেটাকে 'বাবুল মারয়াম' বলা হয়, এবং (গ) বাবুল ইসতিফান'।

পশ্চিম দিকে তিনটি। যথাঃ (ক) 'বাবুল খলীল' (খ) 'বায়তুল্লাহাম' এবং (গ) 'বাবুল ইয়াফা'।

উত্তর দিকে তিনটি। যথাঃ (ক) 'বাবুল জায়েরা' (খ) 'বাবুল দামিশক' ও (গ) 'বাবুল হাম্‌দ'।

১.৮ পবিত্র জেরুজালেম নগরীকে যারা শাসন করলো

যারা এভাবে দীর্ঘদিন ধরে (পবিত্র জেরুজালেমকে) শাসন করলো তারা হলো ঃ

এবং দক্ষিণ দিকেও তিনটি। যথা ঃ (ক) 'বাবুল বনী দাউদ' (খ) 'বাবুল গলত', এবং (গ) 'বাবুল মসজিদুল আকসা' নামে খ্যাত।

৪। **কুব্বাতুস্ সাখরা ঃ** বিশ্বস্ত মহান হাদীস গ্রন্থ বুখারী থেকে জানা যায়, বিশ্বের প্রথম মানুষ হযরত আদম আ. যখন পৃথিবীতে আসেন তখন সাথে করে তিনখানা পাথর জান্নাত থেকে এনেছিলেন। এর একটি "হাজরে আসওয়াদ", দ্বিতীয়টি মাকামে ইবরাহীমে রক্ষিত পাথর এবং তৃতীয়টি 'কুব্বাতুস্ সাখরা' নামে বায়তুল মুকাদ্দাসে রয়েছে।
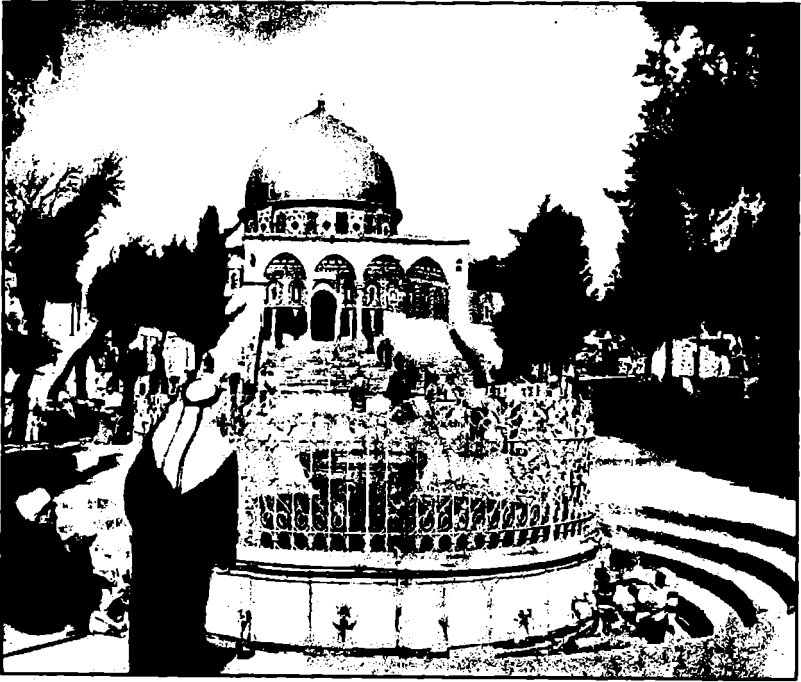
চিত্র ৩ ঃ কুব্বাতুস সাখরার চিত্র।

মে'রাজে যাবার সময় মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. এ পবিত্র পাথরে দাঁড়িয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করেছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত পাথরটা দেখতে একদিকে সরু এবং অপর দিক সামান্য মোটা।

উমাইয়া খলীফা (৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) আবদুল মালিক এটাকে কেন্দ্র করে ৬৯১ খৃস্টাব্দে একটি সুরম্য মসজিদ তৈরি করেন। যেটাকে বর্তমানে ইউরোপিয়ানরা 'Dome of the Rock' বলে থাকে। যার বাংলা হলো 'গিরি গম্বুজ'। সাম্রাজ্যবাদী পারস্য রাজ দ্বিতীয় খসরু পবিত্র

জেরুজালেম আক্রমণ করে ধ্বংস সাধন করে। খলীফা আবদুল মালিক বিধ্বস্ত জেরুজালেমের হর্মরাজির ধ্বংসাবশেষ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আবার মসজিদটি তৈরি করেন। এর গঠন নৈপুণ্যের ভিতর প্রাচীন (মদীনার মসজিদের) আদর্শের মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। গম্বুজ ও নানা বর্ণের পাথরের কারুকার্য মোজাইক প্রভৃতির ব্যবহারে এটা এত সুদৃশ্য হয় যে, অন্যত্র এর জুড়ি নেই বললেই চলে। আব্বাসীয় খলীফা আল মামুনের আমলে (৮১৩-৮৩৩ খৃ) এর পুনঃ সংস্কার হয়।

পূর্বে এটা উন্মুক্ত ছিলো। পরে শেখ মহিউদ্দীন আরাবী নামে একজন ধনী ও দীনদার ব্যক্তি শ্বেত পাথরের প্রাচীরের দ্বারা এর চার দিকে ঘিরে দিয়েছিলেন।

প্রাচীরের ভিতর ঢোকার জন্য তিনটি গেট আছে। এগুলো হলো ঃ (ক) 'বাবুল খোবৃত', (খ) 'বাবুল গারবী' এবং (গ) 'বাবুল কিবলা'।

এ গেট তিনটি সবুজ রং-এর মর্মর পাথর দ্বারা তৈরি। কুব্বাটির ঠিক মাঝখানে আট ফুট উঁচুতে সাখরা পাথরটি ফলকের মধ্যে স্থিত রয়েছে। এর নিচে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে হাত বাড়ালে স্পর্শ করা যায় না। কথিত আছে, এর নিচে দাঁড়িয়ে দু' রাকাআত নফল নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে তা কবুল হয়।

৫. **সেপালচার চার্চ ঃ** তথাকথিত যিশু খৃস্টের মাযার। খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট এটা অতীব পবিত্র স্থান।

চিত্র ৪ ঃ সেপালচার চার্চের চিত্র।

১. ব্যাবিলোনীয়রা	খৃঃ পূঃ	৫৮৬-৫৩৮ =	৪৮ বছর
২. পারসিকরা	" "	৫৩৮-৩৩২ =	২০৬ "
৩. গ্রীকরা	" "	৩৩২-১৬৬ =	১৬৬ "
৪. মেক্কবীরা	" "	১৬৬-৬৩ =	১০৩ "
৫. প্যাগান রোমানরা	" "	৬৩-৩২৩ খৃস্টাব্দ =	২৬০ "
৬. বাইজানটাইনরা	" খৃস্টাব্দ	৩২৩-৬১৪ =	২৯১ "
৭. পারসিকরা	"	৬১৪-৬২৮ =	১৪ "
৮. রোমকরা	"	৬২৮-৬৩৭ =	৯ "
৯. আরবরা	"	৬৩৭-১০৭২ =	৪৩৫ "
১০. মুসলিম তুর্কীরা	"	১০৭২-১০৯২ =	২০ "

জেরুজালেম নগরীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঃ

৬. ইহুদী মহল ঃ

৭. আর্মেনিয়ান কোয়ার্টার ঃ

৮. মুসলিম মহল ঃ

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মহান নগরীতে সুখ-সৌন্দর্যের কলকাকলিতে ভরপুর স্থানে নবী-রসূলদের মালিকা পরে সু-নিদ্রা যেতে কার না ইচ্ছা হয় ? আর এ ইচ্ছায় তাড়িত হয়েই ঐশ্বর্যশালী ইহুদী, মুসলিম ও আর্মেনিয়ানরাও হারাম শরীফের আশেপাশে স্ব স্ব আবাসিক এলাকা গড়ে তোলে।

৯. কিং ডেভিড হোটেল ঃ ইহুদীদের রাজা ও নবী হযরত দাউদ আ, যাঁকে তারা ডেভিড বলে সম্বোধন করে, তাঁর স্মরণে জেরুজালেমের উক্ত বৃহৎ হোটেলটি নির্মিত হয়।

১০. জেহোশেফ্যাট উপত্যকা ঃ

১১. কোর্ট অব দি টেম্পল ঃ

১২. আরব হেড কোয়ার্টার ঃ

১৩. কোভেন্ট–ডেস্-সর্স রিপেট্রিসেস্ ঃ

১৪. নটরড্যাম ডি ফ্রান্স ঃ ফ্রান্স থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য পাঁচশো ছচল্লিশটি সীট বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল।

১৫. ভায়া ডোলোরোসা ঃ

১৬. সেন্ট স্টেফেন্স গেট ঃ

১৯৮১. সালের হিসেব অনুযায়ী জেরুজালেমের লোক সংখ্যা ছিলো তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দু' শো জন। মুসলমান, ইহুদী, খৃস্টান, রাশিয়ান, আরমানী, আরবী ভাষাভাষি মুসলমান খৃস্টান, পারসী প্রভৃতি জাত এখানকার প্রধান অধিবাসী। তবে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি।

এ পবিত্র শহরের সাতটি সদর রাস্তা ও তিনটি বাজার আছে। রাস্তার নামগুলো হলো ঃ (ক) 'মুসলিম এভিনিউ', (খ) 'খৃস্টীয়ান এভিনিউ', (গ) 'ইহুদী এভিনিউ', (ঘ) 'আরমানিয়ান এভিনিউ' (ঙ) 'মাগরিবিস্ এভিনিউ', (চ) 'সুতামি এভিনিউ' এবং (ছ) 'যাহিরা এভিনিউ'।

তাছাড়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন বাজার তিনটি হলো ঃ (ক) 'বাবুল দামিস্ক, (খ) 'সুমুল কারি', ও (গ) 'গামখারি।'

১১. আরবরা	”	১০৯২-১০৯৯ =	৭ ”
১২. খৃস্টানরা	”	১০৯৯-১১৮৭ =	৮৮ ”
১৩. আরবরা	”	১১৮৭-১২২৯ =	৪২ ”
১৪. খৃস্টানরা	”	১২২৯-১২৩৯ =	১০ ”
১৫. আরবরা	”	১২৩৯-১৫১৪ =	২৭৫ ”
১৬. মুসলিম তুর্কীরা	”	১৫১৪-১৯১৭ =	৪০৩ ”
১৭. বৃটিশরা	”	১৯১৭-১৯৪৭ =	৩০ ”

বর্তমানে এটা সাম্রাজ্যবাদী ইসরাঈলের অধিকারে।

১.৯ বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী

রোমান সম্রাট তিতাস ৭০ খৃস্টাব্দে পবিত্র জেরুজালেম নগরী ধ্বংস সাধন করলেও এ মহান নগরীর পুরাতন অংশটি বলতে গেলে প্রায় অক্ষতই রয়ে যায়। ফলে পবিত্র মসজিদুল আকসা, কুব্বাতুস সাখরা এবং সেপালচার চার্চের ন্যায় অন্যান্য মুসলিম খৃস্টান ও ইহুদীদের পবিত্র স্থানগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। খৃস্টানরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যিশুখৃস্ট এখানেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করেন এবং ইহুদীদের একদল কুচক্রীরা এখানেই তাঁকে নিমর্মভাবে হত্যা করে।

আবার ৬২২ খৃস্টাব্দে ২৭ রজবের বুধবার দিন সরোয়ারে দোজাহান, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ স. এখান থেকেই মে'রাজে গমন করেছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত তারিখের দিবাগত রাতে নবী করীম স. উম্মে হানির ঘরে ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল আ. ও মিকাঈল আ. এসে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। তারপর তাঁকে সাথে করে যম্‌যম্ কূপের পাশে নিয়ে যান। এবং সেখানে তাঁর সিনাকে ছাক করা হয়। ঐতিহাসিক পবিত্র যমযমের পানি দ্বারা রাসূলূল্লাহর ভিতর অঙ্গগুলো ধুয়ে মুছে আবার পূর্বের ন্যায় জুড়ে দেয়া হয়। এরপর তিনি হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আ.-এর নির্দেশক্রমে 'বোরাকে' চড়ে মক্কা থেকে সুদূর বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করেন। পথিমধ্যে 'মদীনা শরীফ' ঐতিহাসিক 'তুর পাহাড়' ও 'বায়তুল্লাহাম্' (হযরত ঈসা আ.-এর জন্মস্থান)—এ তিন স্থানে ফেরেশতাদ্বয়ের নির্দেশ অনুযায়ী নফল নামায আদায় করেন। পরে তিনি পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাসের ঐতিহাসিক পবিত্র 'মসজিদুল আকসা'তে সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে দু' রাকাত নামায পড়েন। অতপর তিনি আবার বোরাকে সওয়ার হয়ে ঊর্ধলোকে গমন করেন।

তাই এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জন্য পবিত্র মক্কার পরেই জেরুজালেম মুসলমানদের নিকট অতীব পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত।

আবার বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রাচীর ইহুদীদের নিকটও পবিত্র। কারণ এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি সিনাগগ এবং 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' বর্ণিত

মানচিত্র ১ ঃ হযরত দাউদ ও সোলাইমান (আ)-এর সাম্রাজ্য (১০০০-৯৩০ খৃস্টপূর্ব)
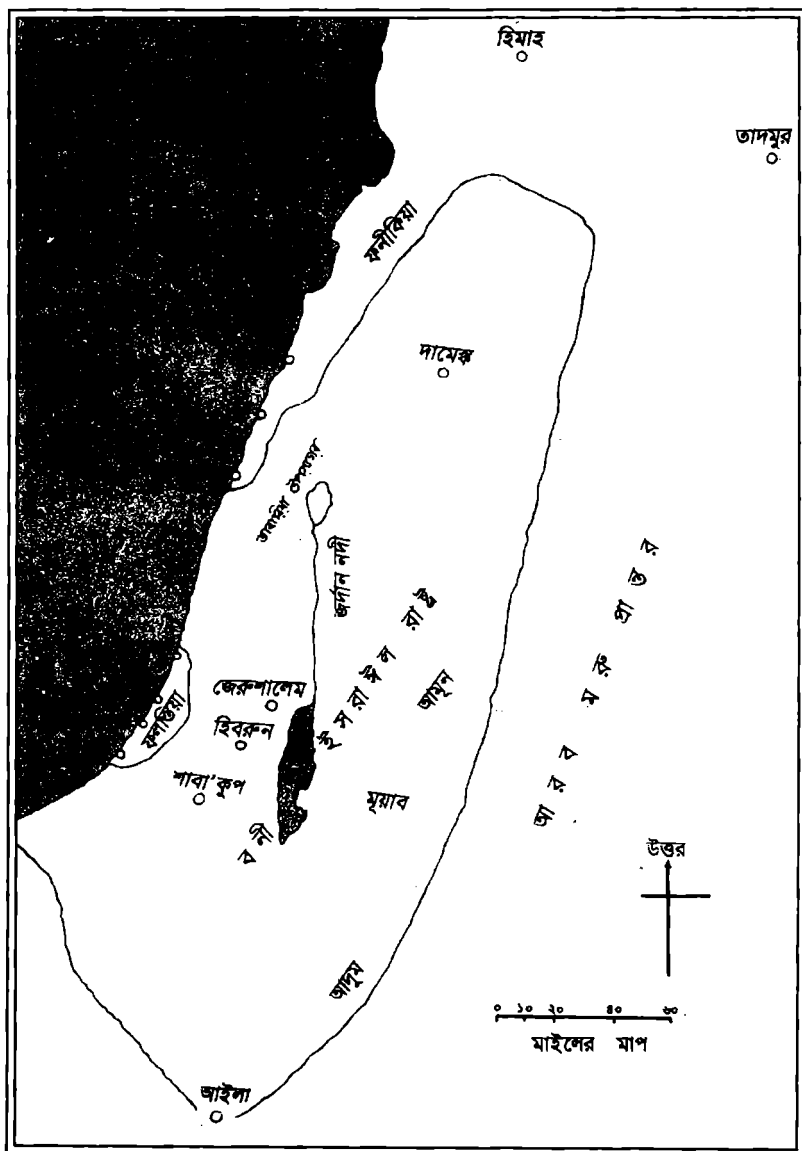
ঘটনাবলী—গিডিয়ান বোয়াজ ও ডেভিডের বীরত্ব, রূথের প্রেম ও আত্মত্যাগ; দেবোরা, লিয়াহ, রেবেকা র‍্যামেল ও অন্যান্য মহিলার কীর্তি কাহিনী এবং সল, ডেভিড ও সলোমান (দাউদ ও সুলাইমান আ.) কর্তৃক প্যালেস্টাইনে এক বিশাল ও সমৃদ্ধিশালী ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনের স্মৃতি—যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে।

অন্যদিকে জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনের ওপর আরবদেরও জোরালো দাবী রয়েছে। তাদের এ দাবীর ভিত্তি দুটি ঃ

১. ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং

২. বাস্তব পরিস্থিতি।

যে ঐতিহাসিক স্মৃতি ইহুদীদের উদ্বেলিত করে আসছে যুগ যুগ ধরে তার এক বড় অংশের উত্তরাধিকারী আরবগণও। বহু মহাপুরুষ দু ধর্মাবলম্বীদের নিকটই ঐশী পুরুষরূপে সম্মানিত। তাছাড়া কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতিও মুসলমান আরবদের নিজস্ব। মহানবীর মি'রাজ গমনের সাথে জেরুজালেমের সম্পৃক্ততা, খোলাফায়ে রাশেদার আমলে প্যালেস্টাইনকে মুসলিম শাসনাধীনে আনয়ন, কুব্বাতুস্ সাখরা ও মসজিদুল আকসার ন্যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত হর্মরাজি নির্মাণ এবং দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর বলতে গেলে গোটা বিশ্বের ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে বিশ্ববিশ্রুত বীর গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ও মামলুক সুলতানগণ কর্তৃক জেরুজালেম পুনরুদ্ধার—উক্ত স্মৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক।

এছাড়া বাস্তব পরিস্থিতিও আরব মুসলমানদের দাবী সমর্থন করে। প্রথমতঃ ৬৩৭ খৃস্টাব্দে হযরত ওমর রা.-এর হাতে খৃস্টানরা বিনা যুদ্ধেই পবিত্র জেরুজালেম নগরীর চাবী তুলে দিয়েছিল।

❑

দ্বিতীয় অধ্যায়
জেরুজালেম ও ক্রুসেড

২.১ আরব মুসলমানগণ কর্তৃক পবিত্র জেরুজালেম বিজয়

৬৩৭ খৃস্টাব্দে হযরত ওমর রা.-এর নির্দেশে সেনাপতি আবু ওবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্ জেরুজালেম অবরোধ করে জেরুজালেমবাসীদের আত্মসমর্পণ করতে বললে ধর্মপ্রাণ খৃস্টানরা প্রথমতঃ মুসলমানদের হাতে পবিত্র নগরী সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরিশেষে তারা জেরুজালেম নগরীর অধিকার করার নির্দেশদাতার চেহারাখানা দেখতে চায়। কারণ খৃস্টানদের মূল ঐশীগ্রন্থ পবিত্র 'ইঞ্জিলে' জেরুজালেম নগরীর বিজেতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া ছিলো। তারা বললো, যদি ঐশী গ্রন্থের বর্ণনার সাথে মিলে যায় তবে তাঁর হাতে এ মহান পবিত্র নগরী সমর্পণ করতে আমাদের কোনোই আপত্তি নেই। আর যদি না মেলে, তবে শক্তিই নির্ধারণ করবে এ মহান নগরীর ওপর আমাদের উভয়ের অধিকার।

সেনাপতি আবু ওবাইদাহ এ সংবাদটি বিশেষ দূতের মাধ্যমে দ্রুত মদীনায় হযরত ওমর রা.-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। এ সংবাদ পাবার সাথে সাথে অর্ধ-পৃথিবীর শাসক আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রা. হযরত আলী মুর্তাজা রা.-কে মদীনার ভারপ্রাপ্ত খলীফা নিযুক্ত করে আড়ম্বরহীনভাবে জেরুজালেমের পথে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে তাঁর একমাত্র সাথী দাস আসলামকে পর্যায়ক্রমে উটের পিঠে চড়িয়ে ইসলামের সাম্যের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করতে করতে চললেন মহান খলীফা হযরত ওমর রা.। বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছানোর সময় উটে আরোহণের পালা ছিলো ভৃত্য আসলামের ; কিন্তু সে বিনীতভাবে আবেদন করলো ঃ হুযুর! আমরা গন্তব্য স্থলে প্রায় পৌঁছে গেছি, হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক লোক আপনার দর্শনলাভের জন্য অপেক্ষমান। অতএব আপনিই আরোহণ করুন। খলীফা জবাব দেন ঃ আমি তোমার ন্যায্য পাওনা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে পারিনে। অতএব তুমিই আরোহণ করো। বলেই উটের রশি ধরে সামনে এগোতে লাগলেন। জেরুজালেমবাসী এ অভিনব দৃশ্য দেখামাত্র বিস্মিত হলো এবং বিনা দ্বিধায় শহরের চাবিগুচ্ছ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিজেদেরকে

ধন্য মনে করলো। এভাবে বিনা রক্তপাতে ঐতিহাসিক জেরুজালেম নগরী মুসলমানদের অধিকারে আসে।

এরপর গোটা প্যালেস্টাইনবাসীই ইসলামের অমিয়ধারায় অবগাহন করে আরব জাহানের সাথে একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে প্যালেস্টাইন-দেশ আরব জাহানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হতে থাকে—মাত্র ১০৯৯-১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের দখলে ছিলো।

২.২ পবিত্র জেরুজালেম নগরী ও ক্রুসেড

১০৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই আদর্শচ্যুত মুসলমান জাতি স্বার্থান্ধে আত্মহননে মেতে ওঠে। ফলে তারা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে তাঁর সম্পদ, রাজ্য আত্মসাত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর জীবনও সংহার করে । আর এটি করতে গিয়ে তারা নীতি-নৈতিকতা জলাঞ্জলী দিয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা শুরু করে। তাই তাদের পতনও খুব তরান্বিত হয়ে পড়ে।

মুসলমান জাতির আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ এবং অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগ নেয় বর্তমান কালের ন্যায় তৎকালীন মুসলিম বিরোধী শক্তিসমূহ ; বিশেষ করে খৃস্টান জগত। খৃস্টান-বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিধর পুরুষ ছিলেন রোমান পোপ। তিনি বিশ্বের খৃস্টানদের মুসলমানদের এ দুর্বল মুহূর্তে নিধন করার জন্যে কালবিলম্ব না করে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্লেসেনশিয়া (Placentia) নামক স্থানে এক সাংগঠনিক সভায় বক্তৃতা দেন। ঐ একই বছরের নবেম্বর মাসে পোপ পুনরায় দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্লারমন্ট (Clermont) নামক স্থানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হয়ে খৃস্টান বিশ্বের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান জানান। এখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, যারা মহান নগরী জেরুজালেম মুক্ত করার যুদ্ধে যোগদান করবে, তারা বিনা বিচারে স্বর্গ লাভ করবে। পারলৌকিক পারিতোষিকের সাথে পোপ চালাকি করে ইহলোকিক পারিতোষিকও যোগ করেন। যুদ্ধে যোগদানকারী সকল খাতকের ঋণ মাফ করে দেবার প্রতিশ্রুতিও তিনি প্রদান করেন। সুতরাং ধর্মীয় পারিতোষিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মভীরুগণ এবং ঋণ মোচনের প্রতিশ্রুতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ঋণগ্রস্ত খৃস্টানগণ একত্রিত হয়ে চারদিক থেকে জেরুজালেমের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

'ডি, লিভু' (Dieule Veut) আওয়াজ তুলে শতধা বিভক্ত খৃস্টান জগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলিম নিধন অভিযানে এক কাতারে এসে দাঁড়ায়।

প্রথম ক্রুসেডের প্রথম দলটি ওয়াল্টারের (Walter the Periless) নেতৃত্বে হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়ে ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর হয়। ৪০ হাজার ক্রুসেডারের দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলের অনুরূপ ধ্বংস নৃত্যে মেতে ওঠে ; কিন্তু নিসের সুলতান এ দ্বিতীয় দলটিকে জেরুজালেম গমনের মাঝ পথেই স্তব্ধ করে দেয়। এ প্রথম ক্রুসেডের তৃতীয় দলটি গডস্কেল (Godeschal) নামক এক জার্মান সন্ন্যাসীর অধীনে হাঙ্গেরীর ভিতর দিয়ে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এর চতুর্থ দলটি ফ্রান্স থেকে যাত্রা করে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সকল খৃস্টান বাহিনী যেদিক দিয়ে গমন করে, সে স্থানগুলো শ্মশানে পরিণত হয়।

প্রথম ক্রুসেডের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস আপতিত হয় ১০৯৭ খৃস্টাব্দে। ৭ লক্ষ সেনার এক বিশাল বাহিনী গডফ্রের (Godfrey) নেতৃত্বে বস্‌ফরস্‌ অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তাদের দাপটে নিসের (Nice) সুলতানের রাজধানী এন্টিয়ক ধূলিসাৎ হয়ে যেতো ; কিন্তু তা সুরক্ষিত থাকায় গডফ্রের বাহিনী দীর্ঘ ৯টি মাস অবরোধ করে নগরী ও এর আশপাশে হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন ও পাশবিক ইন্দ্রিয় চর্চা করতে করতে অগ্রসর হয়। এমতাবস্থায় গডফ্রের বাহিনীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা মুসলমান-নর-নারীকে হত্যা করে করে তাদের নর-মাংস ভক্ষণ করতে থাকে। এভাবে তারা এন্টিয়কে অবস্থান করে তার পতন ঘটায়। পতন ঘটার পরপরই গডফ্রের নরপশুরা নির্বিচারে আত্মসমর্পণকারী ১০ হাজার মুসলিম নর-নারীকে হত্যা করার পর সিরিয়ার তৎকালীন সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী নগরী মারাতুন্নুমান পদানত করে এখানেও অনুরূপ হত্যাযজ্ঞ চালায়।

মারাতুন্নুমান পদানত ও ধ্বংস করে গডফ্রে তার বাহিনী নিয়ে ১০৯৯ খৃস্টাব্দের ১৫ জুলাই পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে প্রবেশ করে। কিন্তু পবিত্র ভূমি দখল করেই তারা মুসলমানদেরকে ক্ষমা করলো না ; বরং সংকল্প করলো যে, মহান জেরুজালেমের প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে মুসলিম মুক্ত করবে। সংকল্পে দৃঢ় থেকে তারা জেরুজালেমের আবালবৃদ্ধবনিতা মুসলিম নর-নারীকে নিষ্ঠুরতার বেদীমূলে বলিদান দিতে আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক কিংক ফোর্ড সাহেব তার Crusades গ্রন্থে লিখেছেন, "মুসলমানদেরকে রাজপথে ও ঘরে ঘরে ঢুকে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিলো। পরাজিতদের জন্য প্রশস্ত জেরুজালেম নগরীতে কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। আত্মসমর্পণকারী নর-নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রাসাদ বা দুর্গের চূড়া হতে মুসলমানদেরকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিহত হতে বাধ্য করা হয় ; তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় এবং ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল থেকে টেনে বের করে

এনে শবরাশির ওপর হত্যা করা হয়। কেবলমাত্র জেরুজালেমেই ৭০ হাজার মুসলিম নর-নারী প্রাণ হারায়। এদের আবাসস্থলে অগ্নি সংযোগ করে নৃশংসভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বিতর্কিত জেরুজালেম নগরীকে রাজধানী করে গডফ্রে অধিকৃত অঞ্চলের রাজা হন। কিন্তু পরের বছরেই গডফ্রে মারা গেলে তার ভাই বলডুইন (Baldwin) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ক্ষমতায় এসেই সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন এবং সিজারীয়া, জাফ্ফা, হাইফা, আক্কা, সিডন, বৈরুত এবং ত্রিপোলী আক্রমণ ও নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেন। এভাবে ১১০৯ খৃস্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের ফলে এডেসা, এন্টিয়ক, জেরুজালেম এবং ত্রিপোলীসহ ৪টি খৃস্টান রাজ্য নিকটপ্রাচ্যে স্থাপিত হয়।

বিতর্কিত জেরুজালেম নগরীর পতনের পর কিছু সংখ্যক পলাতক মুসলমান বাগদাদে পালিয়ে যান এবং মুসলিম বিশ্বের খলীফা মুসতানসির বিল্লাহর নিকট জেরুজালেমের করুণ কাহিনী ব্যক্ত করে। এ সময় ক্ষমতাশালী তুর্কী মুসলমান ও খলীফার আমীর উমরাগণ নিজেদের মধ্যে বর্তমানের আরব বিশ্বের ন্যায় গৃহবিবাদে লিপ্ত ছিলেন। এদিকে মিসরের ফাতেমীয় খলীফা মুসতা'লী সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের সীমান্তবর্তী এলাকা পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ডের শাসন কর্তৃত্বের দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে এতদঞ্চলের তিনি নামমাত্র শাসকই ছিলেন। সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব সত্যিকারভাবেই শিথিল হয়ে পড়েছিলো। তাঁর পারিষদবর্গ বিলাসিতা ও আমোদপ্রমোদে বিভোর থাকায় তাঁদের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়ে যায়। সালজুক সুলতানেরা তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে দক্ষতার সাথে শাসন করলেও মুসলিম জাতির এ চরম সংকটময় মুহূর্তে গৃহবিবাদে নিজেদের শক্তি বহুল পরিমাণে দুর্বল করে ফেলেছিল। অথচ বাগদাদের খলীফাগণ এ সময় সালজুকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। তবুও জাতীয় এ মহাদুর্দিনে বাগদাদের খলীফা মুসতানসির বিল্লাহ কালবিলম্ব না করে তিনজন প্রতিনিধি দ্বারা তুর্কী বারকায়ারুক ও সুলতান মাহমুদের নিকট গৃহবিবাদ ত্যাগ করে জাতির শত্রু বিশ্ব ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে বলেন। কিন্তু বর্তমান কালের (১৯৮২ জুন) লেবানন সংকট, ইরাক-ইরান যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনী ও ইসরাঈলী মহাসংকটে বিবদমান আরব রাষ্ট্রগুলো যে ভূমিকা নিয়ে চলেছে, অনুরূপ ঘটনা ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীতেও। মুসলমানদের এ অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে খৃস্টান জগতের শক্তিধর পুরুষ বলডুইন। তিনি মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য বিশাল এক বাহিনী নিয়ে জেরুজালেম থেকে বের হন এবং ১১১৩ খৃস্টাব্দে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক আক্রমণ করেন। দামেশকের শাসনকর্তা তুগতাগীন

মসুলের শাসনকর্তা মউদুদের সাহায্য প্রার্থনা করলে মউদুদ তাতে সাড়া দেন এবং ক্রুসেডারদের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন। এভাবে ১১১৩ খৃস্টাব্দে দামেশক, মসুলও মারাদিনের সেনাবাহিনী সুলতান সানজারের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে জেরুজালেম আক্রমণ করে এবং তাইবারিয়ামের প্রান্তরে ক্রুসেডারদের ভীষণভাবে পরাজিত করে। এ পরাজয়ের গ্লানি খৃস্টীয় জগত মোটেই মেনে নিতে রাজি ছিলো না। তাই তারা আবার সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একতাবদ্ধ মুসলিম বাহিনী সুলতান মউদুদের নেতৃত্বে বালাতের যুদ্ধে ক্রুসেডাররা আবারো শোচনীয়-ভাবে পরাজয় বরণ করে। এ সময় মিসরের ফাতেমীয় খলীফাগণ ক্রুসেডারদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ফলে ক্রুসেডারগণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। গুপ্তঘাতক কর্তৃক বীর কেশরী মউদুদ শাহাদাতবরণ করলে সেলজুক আমীরদের ঐক্যে ফাটল ধরে। সুলতান মাহমুদ ও খলীফা মুসতাযহীরের ইন্তেকালে মুসলিম বিশ্ব আরো বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে খৃস্টান জগত। তারা আবার সুসংগঠিত হয়ে বিরাট এক ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে মুসলিম বিশ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হস্তচ্যুত অংশগুলো পুনরায় অধিকার করার সময় আবারো নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। খৃস্টানদের অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছলে মুসলিম বিশ্বে আর একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব হয়। ইনি হলেন স্বনামধন্য ইমাদুদ্দীন জঙ্গী।

তুর্কীর সালজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা দলপতি 'সালজুক'। সালজুকের গোত্র তুঘরল বেগ সালজুক বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং বলখ, যুরজান, তাবারিস্তান, খাওয়ারিজম, হামাদান, রাই, ইস্পাহান প্রভৃতি অঞ্চল স্বীয় দখলে আনেন। সালজুক সুলতান মালিক শাহ ছিলেন এ তুঘরল বেগেরই পৌত্র। এ মালিক শাহেরই একজন বিখ্যাত মামলুক (দাস) কর্মচারী ছিলেন 'আক্‌সুঙ্কর'। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে মালিক শাহ আক্‌সুঙ্করকে মসুলের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। ক্রুসেডের বিশ্ববিশ্রুত বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ছিলেন এ আক্‌সুঙ্করেরই পুত্র। ১০ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয় (১০৯৪ খৃঃ), কিন্তু পরবর্তী শাসকরা তাঁকে সযত্নে লালিত-পালিত করেন। কারণ ছোটবেলা থেকেই তাঁর চোখে-মুখে প্রতিভার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সুলতান ও খলীফার পক্ষে ইতিমধ্যেই ৩০টি যুদ্ধে যোগদান করে তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ করেন। ১১২৪ খৃস্টাব্দে তিনি বসরা ও ওয়াসেত নগরীর জায়গীর পান এবং তিন বছর পর মসুল ও জর্জিয়ার (মেসোপটেমিয়া) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মসুল সে সময় খৃস্টান সীমান্তে

অবস্থিত থাকায় এ সময় থেকেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁকে ইসলামের নেতারূপে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

ইতিমধ্যে সালতানাতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি শাসনব্যবস্থা মযবুত করে মুসলিম বিশ্বের সাধারণ শত্রু ক্রুসেডারদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্যে বদ্ধপরিকর হন এবং খুব শীঘ্রই তিনি ক্ষীপ্রতার সাথে বুযা ও মেমবিস দখল করে সমগ্র মেসোপটেমিয়া নিজ অধিকারে আনেন। ক্রুসেডারদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে আলেপ্পোবাসিগণ ইমাদুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি কালবিলম্ব না করে স্বসৈন্যে আলেপ্পো গমন করেন। তার পরের বছরই হামা দখল করে ইমাদুদ্দীন ফরাসী ক্রুসেডারদের 'আসারিবের' প্রাকারগাত্র পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। এতে খৃস্টান জগত দারুণভাবে ক্ষীপ্ত হয় এবং সম্রাট কমনেনাস সমগ্র ইউরোপের খৃস্টানদের সুসংগঠিত করে বিশাল এক ক্রুসেডার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পুনরায় বুযা অধিকার ও ধ্বংস করে সিজারিয়া অবরোধ করে। নিরূপায় হয়ে সিজারিয়ার সুলতান আসাকির, জঙ্গীর নিকট সাহায্য কামনা করেন। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের গোলযোগের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী সিরিয়া হতে মুসলিম বিশ্বের জাতীয় শত্রু ক্রুসেডারদের বিতারণের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাত যাত্রা করেন এবং ফরাসী ও গ্রীক ক্রুসেডারদের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন। এরপরই তিনি আরকা, বা'লাবাক প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করে ত্রিপোলী পর্যন্ত অগ্রসর হন।

বীর কেশরী ইমাদুদ্দীনের জীবনের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হলো এডেসা পুনরুদ্ধার। এ বিজয়কে ঐতিহাসিকগণ বিজয়ের বিজয় (Victory of the vicatory) বলে আখ্যায়িত করেছেন। খৃস্টান জগতের "বীর এবং দানব" বলে পরিচিত দ্বিতীয় যস্‌কালিন এডিসা অধিকার করে শাসন করছিলেন। ইমাদুদ্দীন মৃত্যুপণ যুদ্ধ করে ১১৪৪ খৃস্টাব্দে এডেসা পুনর্দখল করেন। খৃস্টান জগতের দানব যস্‌কালিনকে পরাজিত করতে গিয়ে ক্রুসেডার কর্তৃক জেরুজালেম হত্যাযজ্ঞের মর্মান্তিক ইতিহাস তাঁর কৃতিত্বে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে এডেসা জয় করে জেরুজালেম ও এ্যান্টিয়কের মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু যুদ্ধ নীতি সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত ঃ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَيٰكُمْ মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ধৃত সকল খৃস্টানকে ক্ষমা করে দেন।

এডেসায় শান্তি স্থাপন করেই ইমাদুদ্দীন সিরাজ, বীরা প্রভৃতি অঞ্চল হতে রক্তপিপাসু ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেন। এরপর যখন তিনি "কালাত

জবির"অবরোধ করে ক্রুসেডারদের সাথে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত তখনই একজন গুপ্তঘাতক কর্তৃক মুসলিম যুগশ্রেষ্ঠ বীর এবং জাতীয় রণক্লান্ত সেনানায়ক ইমাদুদ্দীন নিশিতে নিদ্রাবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন। এটা ১১৪৬ খৃস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা। তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার ভার পড়ে তাঁর যোগ্যতম পুত্র নূরুদ্দীনের ওপর।

নূরুদ্দীনও পিতার ন্যায় বীর যোদ্ধা ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। খৃস্টানরা তাঁকে বুঝতে না পেরে বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর শাহাদাতবরণের ক্ষণকাল পরেই মুসলিম বিশ্বের ওপর আঘাত হানার জন্য সুসংগঠিত হয়। এডেসার ক্ষমাপ্রাপ্ত খৃস্টানগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। অসংখ্য মুসলিম নর-নারীকে সেখানে হত্যা করে। যসৃকালিনের পরিচালনায় খৃস্টান জাতির এ বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলিম বিশ্বের অপরিচিত বীর নূরুদ্দীন তৎক্ষণাত এডেসা আক্রমণ ও পুনরুদ্ধার করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেন। এতে ইউরোপে 'দ্বিতীয় ক্রুসেডের' আলোড়ন জাগে।

জার্মান সম্রাট তৃতীয় কনরাড (Conrad) এবং ফ্রান্সের সপ্তম লুই (Lois VII) মিলে নতুন ক্রুসেড আহ্বান করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে, ৯ লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ইউরোপের দুই বীর জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হলে তাঁদের সাথে তুলুস, ব্লোয়িস, ফ্লান্ডারস প্রভৃতি দেশের কাউন্ট পত্নীগণ, বোজী তালাককুরী, বলিয়ান প্রভৃতি দেশের ডিউকপত্নীগণও যোগদান করেন। তাদের দেখাদেখি বহু খৃস্টান মহিলাও এ ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে এবং ক্রুসেডারদের ক্লান্তি দূর করে মনের খোরাক যোগান দিতে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। এভাবে খৃস্টানজগতের নারী-বৃদ্ধ, শিশু ক্রুসেডে অংশ নিয়ে জেরুজালেম থেকে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বাধভাঙা ঢেউ-এর মতোই দুর্বার গতিতে ধেঁয়ে যায়। কিন্তু পথিমধ্যে কনরাড ও লুই-এর দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যারা অবশিষ্ট ছিলো তারা মহিলা ক্রুসেডার ও লুণ্ঠিত এ্যন্টিয়কে পৌছে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে কিছুদিন চিত্তবিনোদনে কাটায়। সাম্রাজ্ঞী এলিনর (লুই-এর স্ত্রী) স্বয়ং ক্রুসেডারদের নানাভাবে ইন্দ্রিয়াসক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তিনি ভগ্নোদ্যম সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করার জন্য বহু ক্রুসেড নায়ককে দৈহদানে চরিতার্থ করেন। তারপর সংঘবদ্ধভাবে তারা দামেশক আক্রমণ করে। কিন্তু নূরুদ্দীন জঙ্গী তাদের শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত করলে তারা পলায়ন করে। নূরুদ্দীন পালায়নরত ক্রুসেডারদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করেন এবং তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করতে থাকেন। ফরাসী ক্রুসেডারগণ একে একে 'আরিয়া,' 'জাগরা'

এবং 'অনেব' প্রভৃতি স্থান হতে বিতাড়িত হয়। অনেব অভিযানকালে গর্বিত রায়মণ্ড নূরুদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রধান সহযোগী বড় ভাই গাজী সাইফুদ্দীন ইন্তিকাল করলে নূরুদ্দীন জঙ্গী ভ্রাতৃশোকে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এ সুযোগে দ্বিতীয় যসকালিন (১১৫১ খৃঃ) নূরুদ্দীনের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করেন। নূরুদ্দীন নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে যস্‌কালিনের ওপর পালটা আঘাত হানেন এবং তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলেন। অতপর তিনি অবলিলাক্রমে তেলবাসি, আইনতাব, নাহর-আল-যাষ, বুরুয-আল-রাশা প্রভৃতি স্থান থেকে ক্রুসেডারদের চরমভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। কনরাড ও লুই প্রাণ নিয়ে স্ব স্ব দেশে ফিরে গেলে দ্বিতীয় ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর নূরুদ্দীন জাতীয় বিশ্বাসঘাতক দামেশকের স্বাধীন সুলতান মুজির উদ্দীনের প্রতি নজর দেন। এ মুজির উদ্দীন বাংলার মীর জাফর আলী আরব বিশ্বের মীর জাফর শরীফ হুসাইন, তৎপুত্র ট্রান্সজর্দান ও ইরাকের বাদশাহ আবদুল্লাহ ও ফয়সল এবং মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত যেমন স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ, ইহুদী ও মার্কিনীদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরান, অনুরূপভাবে তিনিও ক্রুসেড চলাকালীন সময়ে সিরিয়ার জনগণের সাথে তথা বিশ্ব মুসলিম জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ফরাসী ক্রুসেডারদের সাথে যোগদান করেন। ভবিষ্যত নরবলীর বিভীষিকা হতে আত্মরক্ষার জন্য সিরিয়াবাসী জাতীয় পরিত্রাতা বীর যোদ্ধা নূরুদ্দীনের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করতে থাকে। একমাত্র এ মুজির উদ্দীনের জন্যেই নূরুদ্দীন এতদিন সিরিয়া থেকে ফ্রাঙ্ক-ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করতে পারেননি। এবার তিনি সিরীয় জনগণের আহ্বান পেয়ে দামেশকে প্রবেশ করেন (১১৫৪ খৃঃ ২৬ এপ্রিল)। দামেশকবাসী জয়ধ্বনি সহকারে নূরুদ্দীনকে স্বাগত জানায় এবং তাঁকে সিরিয়ার কর্তৃত্বভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। নূরুদ্দীন তাদের আশ্বস্ত করেন এবং মুজির উদ্দীনকে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর নাবালক সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের জন্য বৃত্তিস্বরূপ 'এমেসা' প্রদান করেন। রক্তপাতহীন এ বিজয়ে খুশী হয়ে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খলীফা নূরুদ্দীনকে 'মালিকুল আদিল' উপাধীতে ভূষিত করেন।

এ সময় মিসরের রাজনৈতিক আকাশে ভীষণ দুর্যোগের ঘনঘটা চলছিল। এখানে ফাতেমীয় খলিফা রাজত্ব করলেও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও আমীর-ওমরাহদের আদর্শচ্যুতি ঘটে। ফলে সেখানে বর্তমানের ইসরাঈলী প্রভাবের

ন্যায় তখন ক্রুসেডাররা প্রভাব বিস্তার করার কারণে খুব দ্রুত মিসরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে থাকে। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ক্রুসেডারগণ। তারা মিসরে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করলে নূরুদ্দীন জঙ্গী মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শাওয়ারের সাহায্যের জন্য জেনারেল আসাদুদ্দীন শিরকোহকে বিশাল এক বাহিনী দিয়ে মিসরে প্রেরণ করেন। শিরকোহ মিসর অভিযানে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ উদ্দীনকে সাথে নেন। ফলে অতিসহজেই বিরোধী শক্তি যারগমকে পরাজিত ও নিহত করে শাওয়ারকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর পদে পুনর্বহাল করা সম্ভব হয়। সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েই শাওয়ার বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক প্ররোচিত হন এবং মিসরের মাটিতে শিরকোহের মতো প্রভাবশালী বীরের অবস্থানে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর মতো জেনারেলকে একা মিসর থেকে সরানো সম্ভব নয় ভেবে বিজাতীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। এভাবে বিশ্বাসঘাতক শাওয়ার ফরাসী ও গ্রীক ক্রুসেডারদের সাথে মিলিত হয়ে শিরকোহকে মিসর থেকে বিতাড়িত করেন।

মিসরের রাজনৈতিক মঞ্চে যখন শিরকোহকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র চলছিলো (১১৬৪ খৃঃ) তখন ফরাসী ও গ্রীক ক্রুসেডারগণ সম্মিলিতভাবে নূরুদ্দীনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু বীর নূরুদ্দীনের সেনাবাহিনীর কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়ে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের বোহেমন্দ, রায়মন্দ দখল এবং তৃতীয় মসকালিনের ন্যায় স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ নূরুদ্দীন জঙ্গীর হস্তে বন্দী হন। নূরুদ্দীন হারিম, পানিস, মনিতারা প্রভৃতি অঞ্চল ক্রুসেডারমুক্ত করে স্বীয় আধিপত্য বলবত করেন। ইতিমধ্যে শিরকোহের সাথে শাওয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে নূরুদ্দীন শক্তিশালী এক বাহিনীসহ আবারো শিরকোহকে মিসর অভিযানে প্রেরণ করেন। শিরকোহ এবারও বিজয়ী বেশে মিসরে প্রবেশ করেন। জেরুজালেমের খৃস্টান শাসক আমালরিক বা আমেরী (Amaury) তাঁর ক্রীড়নক শাওয়ারকে সাহায্য করার নাম নিয়ে মিসরে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দূরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে দ্রুত সসৈন্যে মিসরে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু বালাইনের যুদ্ধে শিরকোহের নিকট শোচনীয় পরাজয়বরণ করেন। বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইবনুল আসির মন্তব্য করেছেন। "মাত্র এক হাজার অগ্রবর্তী বাহিনীর বিশাল মিসরীয় ও সমুদ্র তীরবর্তী ফরাসী বাহিনীকে পরাজয়ের ন্যায় আসাধারণ ঘটনা ইতিপূর্বে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি।"

এ গৌরবময় বিজয়ের পরই শিরকোহ মিসরের বন্দর নগরী আলেক জান্দ্রিয়া জয় করেন। মিসরীয় ও ক্রুসেডারগণ বাধ্য হয়ে শিরকোহের সাথে

সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুসারে ক্রুসেডারগণ মিসর ত্যাগ করতে সম্মত হয় এবং শিরকোহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করেন। শিরকোহের আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগের সাথে সাথে ক্রুসেডারগণ মিসরে ফাতেমী খলীফা আযিদের ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে ও ফুস্তাত শহর পুড়িয়ে ভষ্মিভূত করে (১১৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর)। ৫৪ দিন ধরে সুসজ্জিত ফুস্তত আগুনে জ্বলতে থাকে। কায়রোর দক্ষিণের জনহীন বিস্তীর্ণ বালুকণার স্তুপের মধ্যে আজও ফুস্তাতের সেই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। যাহোক, শাওয়ার ১০ লাখ স্বর্ণমুদ্রা দিবার অঙ্গিকারে ক্রুসেডারদের সাথে হীন শর্তে সন্ধি করেন এবং নগদ ৫ লাখ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন এবং অবশিষ্ট অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে মহাবিপদে পড়েন। ফলে প্রধানমন্ত্রী শাওয়ারের সাথে মিসরীয় খলীফা আযিদও ক্রুসেডারদের রোসানলে পতিত হন। খলীফা আযিদ তড়িৎ নুরুদ্দীনের সাহায্য কামনা করেন। নুরুদ্দীন কালবিলম্ব না করে শিরকোহকে মিসরে প্রেরণ করেন। হঠাৎ শিরকোহের আগমনের সংবাদ পাওয়ায় ক্রুসেডারগণ ঘটি-কম্বল নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে জেরুজালেমে ফিরে যায়। এটা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারির ঘটনা। খলীফা পরম তুষ্ট হয়ে শিরকোহকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও 'খেলাত' প্রদান করে সম্মানিত করেন। ক্রুদ্ধ খলীফার নির্দেশে অপদার্থ শাওয়ার নিহত হন এবং শিরকোহ মিসরের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির আসন দুটি অলংকৃত করেন। কিন্তু বেশি দিন এ মর্যাদা তিনি ভোগ করতে পারেননি। শ্রান্তক্লান্ত শিরকোহ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ মার্চ চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁর ইন্তেকালই বিশ্ববরেণ্য বীর গাজী সালাহ উদ্দীনের মিসর তথা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটায়।

২.৩. গাজী সালাহউদ্দীন ও ক্রুসেড

বিশ্ববিশ্রুত বীর, কিংবদন্তীর মহানায়ক গাজী সালাহউদ্দীনের আবির্ভাব বিশ্ব ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি অতীতের সকল বীরের যশ-গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে বীরত্বের যে পবিত্র নজীর স্থাপন করেন তা অদ্যাবধি স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁর মতো এ রকম মহান ও পবিত্র বীর, মহান শত্রু-বন্ধু মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে সকলের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বিশ্ববরেণ্য বীর গাজী সালাহউদ্দীন ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে টাইগ্রীস নদীর তীরবর্তী অবস্থিত তিক্রিত দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আইয়ুব। পূর্ণ নাম নাজমুদ্দীন আইয়ুব। তিনি জাতিতে কুর্দ। আর্মেনিয়ার অন্তর্গত

দবিন নগরীর নিকটবর্তী আজদানাকান গ্রামে তাঁর জন্ম। আইয়ুবের পিতা ছিলেন (তৎকালীন) দবিন নগরীর শাসনকর্তা বাহরোজ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সালাহউদ্দীনের পিতামহ সাদী ইবনে মারওয়ানের দূরবস্থার কথা শুনে বাহরোজ বন্ধুর পুত্র নাজমুদ্দীন আইয়ুবকে তিক্রিত দুর্গের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেন। আইয়ুব তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বলে অচিরেই প্রমাণ করে দিলেন যে, সে সত্যিকারভাবে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আইয়ুবের ছোট ভাই শিরকোহ (মিসরের প্রধানমন্ত্রী) কোনো এক রমণীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের দরুন ক্রুদ্ধ হয়ে এক দুর্বৃত্তের প্রাণ বধ করেন। ইতিমধ্যে আইয়ুবও ব্যক্তিগতভাবে বাহরোজের বিরাগভাজন হন। ১১৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে মুসলিম বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী যখন ক্রুসেডারদের সাথে মরণ পণ লড়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় একদিন সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তিনি টাইগ্রীস নদীর দিকে আত্মরক্ষার জন্য সরে আসেন এবং নদী পার হবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পারাপারের ব্যবস্থা সেখানে ছিলো না। অথচ রক্তলোলুপ ক্রুসেড-বাহিনী অতি দ্রুত ইমাদুদ্দীনের পিছে ধেয়ে আসছিলো। মুসলিম বিশ্বের এহেন বীরকে এ মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আইয়ুব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে পারাপারের ব্যবস্থা করে বিপদমুক্ত করেন। কিন্তু আইয়ুব ইমাদুদ্দীনকে বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেই বিপদে পড়েন। কারণ ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর সাথে বাহরোজের সম্পর্ক খারাপ ছিলো বহুদিন থেকে। তাই বাহরোজ সবসময় ইমাদুদ্দীনের অমঙ্গলই কামনা করতেন। বাহরোজ যখন শুনলেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী আইয়ুব ইমাদুদ্দীন জঙ্গীকে নিশ্চিত মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তখন তিনি আইয়ুবের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত উক্ত অধ্যক্ষের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। (১১৩৭ খৃঃ)

আইয়ুব চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে স্থানান্তর গমনের আয়োজনে ব্যস্ত ; এমন সময় তাঁর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলো। এটা ছিল আইয়ুব পরিবারের জন্য একটি বিষাদময় রজনী। তাই এ সময় এ দুরাবস্থার মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ায় আইয়ুব ওটাকে কুলক্ষণ বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু মানুষ বড়ই নির্বোধ ও ধৈর্যহীন। সামান্যতেই সে ঘাবড়ে যায়। স্রষ্টার মহান বাণী ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন"—এ মহাসত্যটা বিপদের প্রাবল্যে ভুলে যায়। দুঃখময় রাতের পরেই যে পাখীর কাকলিময় সোনালী প্রভাতের আগমন, সে জেনেও যেন জানতে চায় না।—জানতে পারে না। আর এজন্যই চাকুরীচ্যুত আইয়ুব এ মুহূর্তে পুত্র সন্তান লাভ অশুভ বিবেচনা

করেন। যে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি পিতা আইয়ুবের ভ্রমণ-যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল, সেই ইউসুফই পরবর্তীকালে নিজের অসাধারণ কীর্তি ও চরিত্র-মহিমায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে 'সালাহউদ্দীন' (ধর্মের গৌরব) নামে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিল। ইউরোপীয়রা এ সালাহউদ্দীনকেই স্নেহভরে 'সালাদিন' —এ পারিবারিক নামে অদ্যবধি তাঁর স্মৃতিচারণ করে আসছে।

তিক্রিত দুর্গ ত্যাগ করে আইয়ুব নবজাত শিশু ও অন্যান্য পরিজনসহ মুসলে উপস্থিত হলেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গী আইয়ুবকে পেয়ে খুশীতে আলিঙ্গন করেন এবং চাকুরিচ্যুতির কথা শ্রবণমাত্র স্বীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেন। এরপর একে একে আইয়ুব পরিবারের সকল সদস্যদেরই যোগ্যতা অনুসারে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করে আইয়ুবকে সম্মানিত করেন। আইয়ুবের গুণে বিমুগ্ধ ইমাদুদ্দীন তাঁর টাইগ্রীস বন্ধুকে ১১৩৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে বা'লাক নগরীর শাসনকর্তার পদে উন্নীত করেন। এখানেই গাজী সালাহউদ্দীনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

আইয়ুব স্বয়ং ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ পাক্কা মুসলমান। কাজেই পুত্রের জীবন যে পিতার আদর্শে গঠিত হবে, তা বিচিত্র কি ? সুতরাং সালাহ উদ্দীন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কুরআন, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ, ইসলামিক ফিলোসফি, সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

সালাহউদ্দীন পরিণত বয়সে জঙ্গী সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১১৫৪ খৃস্টাব্দ হতে ১১৬৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নূরুদ্দীনের দরবারে অবস্থান করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রভু নূরুদ্দীনের আদেশ পালন করেন। প্রভু নূরুদ্দীনের আদেশে মিসর থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করার জন্য পিতৃব্য শিরকোহের নেতৃত্বে যেভাবে ক্রুসেডারদের সাথে লড়েন এবং রণনৈপুণ্যের পরিচয় দেন তাতে মিসরবাসী তো বটেই গোটা মুসলিম বিশ্ব চমৎকৃত হয়। মিসর হতে ক্রুসেডারদের ও তাদের পদলেহনকারী শাওয়ারকে বিতাড়িত ও নিহত করে মিসরের মাটিকে শত্রুমুক্ত করেন। ফাতেমী খলীফা শিরকোহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীনের বীরত্বে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সাথে সাথেই তিনি প্রথমে শিরকোহকে এবং শিরকোহের মৃত্যুর পর গাজী সালাহউদ্দীনকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন।-(২৬ শে মার্চ, ১১৬৯ খৃঃ)।

প্রধানমন্ত্রী গাজী সালাহউদ্দীন ও তাঁর সমস্যাসমূহ ঃ ১১৬৯ খৃস্টাব্দের ২৩ মার্চ আসাদুদ্দীন শিরকোহ ইন্তেকাল করলে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য

হয়। মিসরের ফাতেমীয় খলীফা শিরকোহের অন্তর্ধানে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ বর্তমানের চেয়েও অধিক পরিমাণে বেশি মধ্যপ্রাচ্যের রাজ নৈতিক আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা বিরাজ করছিলো। এমনি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কোন্ শক্তিধর পুরুষ সত্যিকারভাবে সত্য সৈনিক শিরকোহের অভাব পূরণ করতে পারে—এ নিয়ে মিসরের সুধী মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। শান্ত-শিষ্ট, সদাচারী সাধারণ সিপাহী সালাহউদ্দীনের কথা তখন মিসরের সুধী সমাজের মনে পড়েছিলো কিনা তা আল্লাহই জানেন, তবে বিচক্ষণ খলীফা শিরকোহের উত্তরসূরী নির্বাচনে মোটেই ভুল করেননি সেদিন। মধ্যপ্রাচ্যের সেই সর্বাধিক সংকটময় মুহূর্তেও খলীফা তিন তিনটি দিন ধরে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে মিসরের সমস্ত প্রবীণ জেনারেল ও রাজনৈতিক নেতাকে বাদ দিয়ে ২৬ মার্চ গাজী সালাহউদ্দীনকে 'আল-মালিকিন-নাসির' উপাধী দিয়ে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর শূন্যপদে বসালে মিসরের সর্বত্র বিদ্রোহের ঝড় ওঠে। সেনাবাহিনীতে ভাঙন ধরে এবং বাছাই করা জেনারেলরা মিসর ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যেতে থাকে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে এমন দুটি মহাশক্তির মাঝে থেকে রাষ্ট্রীয় কাজ সমাধা করতে হয়, যাঁর একটি শিয়া মতাবলম্বী (খলীফা) এবং অন্যটি সুন্নী (ক্রুসেড বিজয়ী নূরুদ্দীন জঙ্গী)। তৃতীয়তঃ মিসরের সভাসদ ও সিরিয়ার রাজ কর্মচারীর অধিকাংশই সুন্নী মতাবলম্বী সালাহউদ্দীনকে ঈর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখতে থাকেন। প্রাসাদের সৈন্য ও ভৃত্যেরা প্রকাশ্যেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতো। চতুর্থতঃ গোটা খৃস্টান জগত তাঁর নিধনে সদা তৎপর ছিলো। ক্রুসেড বিজয়ী নূরুদ্দীন জঙ্গী গাজী সালাহউদ্দীনের উজীরী প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেও তাতেও আন্তরিকতা ছিলো কিনা সন্দেহ। 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'—এরূপ উভয় সংকটের মধ্যে পড়েও বিশ্ববিশ্রুত বীর গাজী সালাহউদ্দীন ঘাবড়ালেন না। আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস যাঁদের থাকে তাঁরা মূলত কোনো পরিস্থিতিতেই ঘাবড়ান না ; বরং জীবনের প্রতিটি কাজ সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ পাক মানবজাতিকে কুরআন ও হাদীসরূপ যে পবিত্র নীল-নকশা দিয়েছেন তার নিরিখে পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ীও হন। গাজী সালাহউদ্দীন আবারো তা বিশ্ববাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে গেলেন। তিনি সেদিন প্রধানমন্ত্রীত্ব পদ লাভ করেই মহান স্রষ্টাকে সঙ্গী করে উদ্ভূত সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি মিসরীয় বাহিনীর ভাঙন রোধ করার জন্য সেনাবাহিনীর ভিতর মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করেন এবং তৎকালীন বিশ্ববরেণ্য ইসলামিক চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞ আল-হাক্কানীকে

দিয়ে সেনা ছাউনীতে ইসলামিক বিধিবিধান এবং জিহাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে মিসরীয় বাহিনীকে সুসংগঠিত করেন। তিনি শিয়া খলীফা এবং সুন্নী সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী—দু'জনের নিকটেই নীতিগতভাবে বাঁধা ছিলেন। কারণ নূরুদ্দীনের পিতা তাঁর পরিবারকে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মিসরে তিনি নূরুদ্দীনেরই প্রতিনিধি। অপরদিকে তিনি মিসরের ফাতেমীয় খলীফার (শিয়া) প্রধানমন্ত্রী। কাজেই এ দু'জনকেই তুষ্ট রাখা তাঁর একান্ত প্রয়োজন। গাজী সালাহউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। তাই এ জটিল সমস্যাটি সমাধানের জন্য তিনি খুতবায় উভয়েরই মঙ্গল কামনার আদেশ দিয়ে ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ করে ফেললেন। তৃতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি প্রাচীন মিসরের ফেরাউনের মন্ত্রী হযরত ইউসুফ আ.-এর পথ অনুসরণ করলেন। দামেশক থেকে স্বীয় পরিবারের সকলকে মিসরে নিয়ে এলেন এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদগুলোতে বিশ্বস্ত শক্তিশালী আপনজনদের নিয়োগ দান করলেন। প্রতিদানে তাঁরা সকলেই জানপ্রাণ দিয়ে সালাহউদ্দীনের শাসনকাঠামো আরো শক্তিশালী করার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে দিনে দিনে দৃঢ় করে তোলেন। এভাবে তিনি বৃহত্তর সমস্যার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য শক্তি বৃদ্ধি করে চলেন।

সুন্নী বীর গাজী সালাহউদ্দীনের শক্তি বৃদ্ধিতে শিয়া খলীফা শংকিত হয়ে পড়লেন। খলীফা এতোদিন মনে করেছিলেন, সালাহউদ্দীনের ন্যায় শান্ত-শিষ্ট যুবককে তিনি নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর তসবীহের মধ্যে যে এতো ক্ষমতা লুকায়িত ছিলো তা তখন পর্যন্তও কেউ জানতে পারেনি। যেই মাত্র ফাতেমীয় খলীফা তাঁর নির্বাচনের ভুল বুঝতে পারলেন তখন নতুন উজীরকে ধ্বংস করার জন্য ক্রুসেডারদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। কোষা নেজারের নেতৃত্বে সিরিয় ক্রুসেডারদের (ফ্রাঙ্ক) সাথে সন্ধির কথাবার্তাও আরম্ভ হলো। দৈবক্রমে সালাহউদ্দীন এটা টের পেয়ে যান এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে মিসরের কাজী বিশ্বাসঘাতক নেজারকে বিচারে ফাঁসি দেন। নেজারের ফাঁসি হলে মিসরের সেনাবাহিনীর একাংশ দারুণ ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ নেজার ছিলেন জাতিতে সুদানী এবং মিসরীয় বাহিনীর প্রায় অধিকাংশেরও বেশি তখন সুদানীদের দ্বারাই গঠিত ছিলো। কাজেই তাদের জাতীয় নেতা ও স্বদেশবাসীর এহেন পরিণতিতে তারা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সালাহউদ্দীনের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং নেজার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রায় ৫০ হাজার সুদানী গাজী সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ফলে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। খলীফার পূর্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্তী বায়নুল ফাস্‌রায়নে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে বহু লোক হতাহত হওয়ার

পর সুদানীরা চরমভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের বাসভূমি আল-মুনসুরিয় সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়। পরাজিত বিদ্রোহীরা সালাহউদ্দীনের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সালাহউদ্দীন তাদের আর নিজের কাছে রাখলেন না, উত্তর মিসরে তাদের স্থানান্তরিত করেন। সেখানে গিয়েও তারা সালাহউদ্দীনকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি ; ছয়-ছয়টি বছর ব্যাপী (১১৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) তারা বারংবার বিদ্রোহের পতাকা তুলেছে। শেষ পর্যন্ত সালাহউদ্দীন জেনারেল আল-আদিলকে কপ্টসে তাদের বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালে ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাদের এমন শিক্ষা দেন যে, চিরতরে তাদের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

গাজী সালাহউদ্দীন যখন সুদানীদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন আর একটি ভীষণ বিপদ তাঁর ওপর আপতিত হয়। বিশাল এক ক্রুসেডার বাহিনী রাজা আমালরিকের (Amaury) নেতৃত্বে জেরুজালেম হতে মিসরাভিমুখে যাত্রা করে। উদ্দেশ্য গাজী সালাহউদ্দীনের শক্তির ধ্বংস সাধন এবং ফাতেমীয় খলীফার সাহায্যের নামে মিসরের ওপর খৃষ্টান-প্রভুত্ব বিস্তার। গাজী সালাহউদ্দীন যথাসময়ে সংবাদটি পেলেন এবং এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে জামাতাকে মিসর জয়ে সাহায্য করার জন্য গ্রীক সম্রাট ম্যানুয়েল আমালরিকের সাথে গিয়ে যোগ দেয়। এ সংবাদটি পেয়ে গাজী সালাহউদ্দীন দ্রুততার সাথে সিরিয়াধিপতি নূরুদ্দীনকে জানান। অগ্রসরমান বিরাট এ শত্রু বাহিনীর সাথে বিদ্রোহী সুদানীরা গিয়ে যোগ দিলে সালাহউদ্দীনের বিরোধী শক্তির প্রাবল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সালাহ-উদ্দীনের ওপর এ আক্রমণের ক্ষীপ্রতা কমানোর জন্য নূরুদ্দীন জেরুজালেম দখলের জন্যে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন। তবুও আমালরিক পরিচালিত যৌথ ক্রুসেডার বাহিনী বিদ্রোহী সুদানীদের সাথে মিলে (১১৬৯) খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে দামিয়েতা পোতাশ্রয় অবরোধ করে। কিন্তু এক অজেয় দুর্গ-পোতাশ্রয় রক্ষা করতে এর প্রবেশ পথে এক গাছি লৌহ-শিকল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত গাজী সালাহউদ্দীনই জয়যুক্ত হন। এখানে তাঁর আক্রমণের ক্ষিপ্রতা এতো প্রবল ছিলো যে, বিরাট ক্রুসেডার বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শত্রুরা সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধের পর থেকে ক্রুসেডারদের ভিতর গাজী সালাহউদ্দীন সম্বন্ধে একটি ত্রাসের সঞ্চার হয়। গাজী সালাহউদ্দীনের জয়যাত্রা মূলত এখান থেকেই শুরু।

এ শোচনীয় ব্যর্থতার পর খৃষ্টানরা আর পররাজ্য আক্রমণে সাহসী হলো না। এখন থেকে তাদেরকে গাজী সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায়

ব্যস্ত থাকতে হয়। পূর্বের কৃতকার্যতায় উৎসাহিত হয়ে তিনি শীঘ্রই চির শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। এ যুদ্ধ দীর্ঘ ২২ বছরের মধ্যে আর থামেনি।

গাজী সালাহউদ্দীন দিগ্বিজয়ে বের হবার আগে নিজের হাতকে মজবুত করে নিলেন। ১১৭৯ খৃস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি মিসরের জাতীয় মসজিদের ইমামকে দিয়ে ফাতেমীয় খলীফার পরিবর্তে আব্বাসীয় খলিফা নামে খুতবা পাঠের আদেশ দেন। সকলে বিস্মিত হলেও রুখবার মতো তখন এমন কেউ ছিলো না। কারণ সালাহউদ্দীনের তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা। এভাবে যে ধর্ম বিপ্লবের ফলে মুসলিম বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলো দুই শতাব্দী পরে গাজী সালাহউদ্দীন সম্পূর্ণ বিনা বাধায় তার অবসান ঘটিয়ে অসীম গৌরবের অধিকারী হন। পাশ্চাত্যের একজন ঐতিহাসিক বলেন ঃ ".....Saladin had the glory of ending a schism which had lasted two hundred years........." আব্বাসীয় খলীফা আল মুসতাদী খুশীতে আত্মহারা হয়ে গাজী সালাহউদ্দীনকে খেলাত প্রদানে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। বিজ্ঞ গাজী সালাহউদ্দীন করুণা করেই এ সংবাদ অসুস্থ ফাতেমীয় খলীফাকে জানাতে নিষেধ করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর অসুস্থ খলীফা আল আজিজ মাত্র ২১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

দুটি প্রতিভা একই প্লাটফরমে থাকলে দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক। গাজী সালাহউদ্দীন ও নূরুদ্দীন জঙ্গী দুজনেই ছিলেন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বি জেনারেল এবং রাষ্ট্রনায়ক। তবে এক্ষেত্রে গাজী সালাহউদ্দীন ছিলেন সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা। নূরুদ্দীনের সাময়িক যশ গৌরবকে ম্লান করে দিয়ে গাজী সালাহউদ্দীনের খ্যাতি যখন চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নূরুদ্দীন তাঁর মিসরীয় প্রতিনিধি গাজী সালাহউদ্দীনের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। ফলে মুসলিম বিশ্ব নতুন করে যে মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলো তা গাজী সালাহউদ্দীনের বিজ্ঞ পিতা আইয়ুবের সময়োচিত পদক্ষেপে দূরীভূত হয়। এরপর গাজী সালাহউদ্দীন আবার মূল লক্ষের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ১১৭৩ খৃস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দক্ষিণের 'করক দুর্গ' অবরোধ করেন। সিরিয়া পথে অবস্থিত বিধায় মুসলমানদের নিকট এটি একটি বড় বাধা বিবেচিত হতো। গভীর পরিখাবেষ্টিত একটি খাড়া উচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত থাকায় দুর্গটি প্রায় অজেয় হয়ে উঠেছিলো। তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি কারাকুশ ইতিমধ্যে কাবেশ পর্যন্ত বার্কা ও ত্রিপোলীর সমগ্র অংশ দখল করে নেন। ১১৭৩ খৃস্টাব্দেই তিনি সুদানে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। ১১৭৪ খৃস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারিতে গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর দুর্ধর্ষ

সেনাপতি তুরান শাহকে ইয়েমেন জয়ের জন্য পাঠান। ইয়েমেনবাসীরা তাঁকে প্রাণপণ বাধা দান করলো। কিন্তু তুরান শাহের প্রবল পরাক্রমের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। জেবেদ, জেনেদ, আদন, সানা প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একে একে তুরান শাহের দখলে এলো। ফলে আগস্ট মাসের মধ্যেই ইয়েমেন জয় সম্পূর্ণ হলো।

ইতিমধ্যে সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে এক কঠিন ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার লাভ করে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক—কবি ওমারা ছিলেন এ বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা। বহু মিসরীয় সুদানী—এমনকি তুর্কী সৈন্য ও রাজকর্মচারী পর্যন্ত এ বিদ্রোহে যোগদান করে। গাজী সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে বিদেশী শক্তিগুলোও এগিয়ে আসে। অর্থ ও রাজ্য লোভে সিসিলী ও জেরুজালেমের রাজারা ষড়যন্ত্রকারীগণকে নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ১১৭৪ খৃস্টাব্দের ৬ এপ্রিল গাজী সালাহউদ্দীন কঠোর হস্তে এ ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করেন। জেরুজালেম রাজ এ বিদ্রোহ দমনের ঘটনা জানতে পেরে মিসর গমনে বিরত হলেও সিসিলী রাজ অজান্তে পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী ৬ শ' যুদ্ধজাহাজ ও ৩০ হাজার সৈন্য সহকারে মিসর যাত্রা করেন। ২৮ জুলাই এ বিরাট নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে অবস্থান গ্রহণ করে। দুর্গে তখন রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। তাই গ্রামের যুবকেরা স্রোতের ন্যায় আপতিত হয়ে সালাহউদ্দীনের মূল বাহিনী আসা পর্যন্ত শত্রু বাহিনীর মোকাবিলা করতে থাকে। ইতিমধ্যে গাজী সালাহউদ্দীনের বাহিনী এসে পড়লে গণপিটুনী শুরু হয়। শত্রুরা তাদের এ পিটুনী সহ্য করতে না পেরে কেউ ওখানেই নিহত হলো, কেউ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে গেল এবং যারা পালাতে পারলো তারা কোনো রকমে স্বদেশে ফিরে গেলো।

১১৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ মে ক্রুসেড বিজয়ী নূরুদ্দীন জঙ্গী কণ্ঠ ফুলে ইন্তেকাল করেন। গাজী সালাহউদ্দীন এবার সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক ও আরব বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন।

বাগদাদ ও কার্থেজের মধ্যবর্তী বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি নূরুদ্দীন জঙ্গীর ইন্তেকালের পর তাঁর বালক-সন্তান রাজ্যভার গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১১ বছরের শাহজাদা ইসমাঈল সালেহ দরবারের আমীর ওমরাহদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় বালক-রাজা সালেহের চাচাতো ভাই দ্বিতীয় সাইফুদ্দীন বিদ্রোহী হয়ে এডেসাসহ কয়েকটি করদ-রাজ্য অধিকার করে নেন। অনেক প্রধান জায়গীরদাররাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। ওদিকে মেসোপটেমিয় রাজের বিজয়

অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ফলে গাজী সালাহউদ্দীন বৃহত্তম মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রভুপুত্র সালেহ ইসমাঈলের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। ইতিমধ্যে সালেহ ইসমাঈল স্বার্থান্বেষী গুমশতিগীনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়লে নূরুদ্দীনের রাজ্যে আরো অধিক বিপর্যয় নেমে আসে। গাজী সালাহউদ্দীন আর সময় ক্ষেপণ না করে ৭ শো উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী নিয়ে দামেশক যাত্রা করেন। ২৮ নভেম্বর তিনি দামেশক দখল করে তুগ্তিগীনের হস্তে শাসনভার প্রদান করে একে একে বিদ্রোহীদের দমন করেন এবং হামা, এমেসা ও দামেশক প্রদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তাছাড়া আলেপ্পোর অদূরবর্তী মারা, বারিন, কাফারতাব প্রভৃতি নগরসমূহও তাঁর সম্রাজ্যভুক্ত হয়।

নূরুদ্দীনের ইন্তিকালের পর গাজী সালাহউদ্দীন তৎকালীন বিশ্বে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সালেহ ইসমাঈলের বশ্যতা স্বীকার করে আসছিলেন। কারণ ইসমাঈল ছিলেন তাঁর প্রভু (Master) পরলোকগত নূরুদ্দীনের পুত্র। কিন্তু সালেহ কুচক্রী গুমশতিগীনের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে সালাহউদ্দীন সালোহসহ গুমশতিগীনের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল সালেহ ও তাঁর উপদেষ্টা গুমশতিগীনসহ অন্যান্য সাহায্যকারী নেতা উপনেতা সর্বশক্তি নিয়ে সালাহউদ্দীনকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তারা গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করা মাত্রই কায়রো ও দামেশকের সুশিক্ষিত প্রবীণ সৈন্যরা উভয় দিক হতে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা ভাগ্য বলে জীবিত রইলো তারা ভীরুর ন্যায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করে সন্তর্পণে পালিয়ে গেলো। গাজী সালাহউদ্দীন তাদেরকে আলেপ্পো পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। এবার বালক-রাজার পরামর্শদাতারা তাঁর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তানুসারে বিবদমান পক্ষদ্বয় অধিকৃত জনপদগুলো স্ব স্ব অধিকারে রাখবেন বলে স্থির হলো এবং গাজী সালাহউদ্দীন স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা পেলেন। মূলত এ সন্ধি ছিলো একটি ঐতিহাসিক সন্ধি, যা গাজী সালাহউদ্দীনের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। এরপরে পরেই খুতবা ও মুদ্রা থেকে সালেহ ইসমাঈলের নাম রহিত হয়ে গাজী সালাহউদ্দীনের নাম সেখানে শোভা পায়। এ তারিখের মুদ্রা অদ্যাবধি কায়রোর যাদুঘরে গাজী সালাহউদ্দীনের বিজয় গীত গেয়ে চলেছে।

ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রায়ই রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে যুক্তির পরিমাণ নিতান্ত অপ্রতুল। সিরিয়ার নামমাত্র রাজা সালাহউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিদের ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। তিনি কখনও তাঁকে রাজভক্তি প্রকাশের সুযোগ দেননি। সালাহউদ্দীন সিরিয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকলে তা বালক-রাজার পরিবর্তে অন্যান্য

উচ্চাকাংখী আমিরদেরই হস্তগত হতো।" অথচ ইসলামের খাতিরে তখন নিকট প্রাচ্যের ঐক্য বজায় রাখা একান্ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

মুসলিম বিদ্রোহীরা যখন দেখলো কোনো ষড়যন্ত্র বা সম্মুখ যুদ্ধে গাজী সালাহউদ্দীনের মতো বীরের মুকাবিলা করা সম্ভব নয় তখন তারা সালাহ উদ্দীনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিদায় দেবার জন্য তৎকালীন বিশ্বের বিখ্যাত পেশাদার গুপ্তঘাতক নেতা শায়খুস সিনান-এর সাথে বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে চুক্তি স্বাক্ষর করে। শায়খুস সিনান চুক্তি মাফিক তাঁর সুনিপুণ ঘাতক দল সালাহউদ্দীনকে হত্যার সর্বপ্রকার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তিনি একান্ত অলৌকিকভাবেই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে যান। সিনানের অভিযান ব্যর্থ করে দিয়ে ঘুমন্ত সালাহউদ্দীনের অতন্দ্র দেহরক্ষী ঘাতক দলকে রাতের অন্ধকারেই শিবিরের মধ্যে হত্যা করে। এরপর সালাহউদ্দীনের প্রাণনাশের আশংকা আরো বেড়ে যায়। ফলে গাজী সালাহউদ্দীন সকল বিদ্রোহীকে দমন করেই গুপ্তঘাতকদের মূল ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য আনসারিয়া পর্বতমালায় প্রবেশ করেন (১১৭৫ খৃঃ আগস্ট মাস)। গাজী সালাহউদ্দীন গুপ্তঘাতকদের পার্বত্য অঞ্চলের রাজ্যের বহু স্থান তছনছ করে তিনি তাদের প্রধান দুর্গ 'মাসইয়াফ' অবরোধ করেন। কিন্তু এটি এক দূরারোহ গিরি-শৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় গাজী সালাহউদ্দীনের দুর্গ বিধ্বংসী যন্ত্র তার ক্ষতিসাধন করতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে গাজী সালাহউদ্দীন এখানে অবস্থানের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। রাতের অন্ধকারে কোনো নরঘাতক প্রহরীদের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়েও যদি শিবিরে প্রবেশ করেই ফেলে তা ধরার জন্য তিনি শিবিরের চারদিকে খড়িমাটির গুড়া নিখুঁতভাবে ছড়িয়ে রাখতেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত সাবধানতাই ব্যর্থ করে দিয়ে সিনান প্রেরিত ঘাতকদল রাতের অন্ধকারে সুলতানের শিবিরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে হত্যা না করে তাঁর শিয়রের পাশে বিষাক্ত ছুরিকাসহ একখানা পত্র রেখে প্রস্থান করে। পত্রে লিখা ছিলো ঃ "জয় ও সুলতানের জীবন দুইই ঘাতক রাজের হাতে। তাঁকে বশীভূত করার ক্ষমতা সালাহউদ্দীনের নেই।" প্রভাতে এ পত্র ও ছুরিকা পেয়ে সালাহউদ্দীন বিস্মিত হন। তিনি চিন্তা করেন এরূপ ভয়ঙ্কর রকমের নিপুণ নরঘাতকদের বিরুদ্ধে এ গভীর পার্বত্য অরণ্যে বৃথা না লড়ে বরং তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই শ্রেয়। তাই তিনি ঘাতক রাজ শায়খুস সিনানের কাছে দূত পাঠান। ঘাতক রাজ জবাব পাঠান ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি অবরোধ তুলে না নেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গাজী সালাহউদ্দীনের সাথে সন্ধির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।" সালাহউদ্দীন অবরোধ তুলে নিয়ে 'ইবনে মুন্কিদের' সেতুর নিকট পৌছলে শায়খুস সিনান ভবিষ্যতে

তাঁর কোনো ক্ষতি করবেন না বলে এক 'প্রতিজ্ঞাপত্র' সালাহউদ্দীনের নিকট পাঠান। ফলে সালাহউদ্দীন ত্রিবিধভাবে লাভবান হন ঃ ১. সিনান আর তাঁর প্রাণনাশ করবেন না বলে নিশ্চয়তা দেয়ায় তিনি সর্বশক্তি ও উৎসাহ নিয়ে জেরুজালেমসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো ক্রুসেডারদের কবল মুক্ত করেন। ২. মিসরের শিয়ারা শায়খুস সিনানের সাহায্যে তখনও ফাতেমীয়দের প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্বপ্ন দেখছিল তা চিরতরে বিনাশ হয়ে গেলো এবং ৩। সালাহউদ্দীন বিরোধী বিশ্ব ক্রুসেডাররা নিজেরা না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করতে শায়খুস সিনানের গুপ্তঘাতকদের ব্যবহারের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলো তা অঙ্কুরেই ধূলিসাত হয়ে যায়। বৃদ্ধ সিনান সত্যিই তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন এবং এরপর থেকে আর কোনো গুপ্তঘাতক সালাহউদ্দীনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেনি।

১১৭৫ সালের ২৫ আগস্ট গাজী সালাহউদ্দীন সিরীয় রাজধানী দামেশককে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তুরান শাহকে সিরীয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করে ২২ সেপ্টেম্বর মিসরে ফিরে আসেন। তিনি কায়রো নগরীকে সুরক্ষিত করার জন্য উদ্যোগ নেন এবং 'গাজার বাঁধ'টি নির্মাণ করেন। এটা গাজী সালাহউদ্দীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ৪০টি খিলানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৭ মাইল দীর্ঘ এ বিখ্যাত বাঁধটি তৈরীর কাজ শেষ করতে ১১৮৪ সাল পর্যন্ত সময় ব্যয় হয়।

রাজধানীর দৃঢ়তা সাধন, শাসন-সৌকর্যের পূর্ণতা সাধন ও বিদ্যালয় স্থাপনে নিরন্তর ব্যাপৃত থেকে গাজী সালাহউদ্দীন এক বছরকাল মিসরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থান করেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা বেশি দিন তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সালাহউদ্দীনের অনুপস্থিতে তাঁরা দামেশক প্রদেশ লুণ্ঠন করে বীর সালাহউদ্দীনকে ভীষণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে। বাধ্য হয়ে তিনি ২৬ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে ১১৭৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে আস্কালানের দিকে অগ্রসর হন। রামাল্লা ও লিড্ডায় শত্রুদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তিনি শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করেন। অপরদিকে আরব বাহিনীর কিছু অংশ সালাহউদ্দীনের মূল বাহিনী থেকে ছিন্ন হয়ে ক্রুসেডারদের তাড়া করতে করতে জেরুজালেমের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হয়।

২৫ নভেম্বর। সালাহউদ্দীনের বাহিনীর অধিকাংশই চারদিকে বিক্ষিপ্ত। ফলে ওহুদের প্রান্তরে যে ঘটনা মুসলমানদের জীবনে ঘটেছিলো সে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এখানেও। পেছন দিক হতে বলডুইন তাঁর অধীনস্থ

বাহিনী নিয়ে সালাহউদ্দীন পরিবেষ্টিত অল্প সংখ্যক মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সালাহউদ্দীন দ্রুততার সাথে তাঁর বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন বটে ; কিন্তু ফল হলো না। ইতিমধ্যে তাঁর দেহরক্ষীই যখন ভূলুণ্ঠিত হতে লাগলো তখন তিনি হতাশ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এ পরাজয়ের কলংক ঘুচাবার জন্য গাজী সালাহউদ্দীন মাত্র তিন মাসের মধ্যেই আরো নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে স্বীয় বাহিনীকে বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন এবং ১১৭৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে শত্রুদের ওপর আপতিত হয়ে অতীত পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে সক্ষম হন।

১১৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের ঘটনা। মুসলমানদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অসুবিধায় ফেলবার জন্য ভারত সম্রাজ্ঞী ইন্দিরা গান্ধির 'ফারাক্কা বাঁধের' ন্যায় জেরুজালেম রাজ বলডুইন জর্দান নদীর ওপর শক্তিশালী একটি বাঁধযুক্ত দুর্গ নির্মাণ করেন। নাম তার 'দুঃখ দুর্গ'। এই দুঃখ দুর্গের প্রাচীরের ভেদ ছিলো ১৩.৫ হাত চওড়া। ব্যবসার দিক দিয়ে আরবদের ক্ষতির কথা ভেবে গাজী সালাহউদ্দীন বলডুইনকে এটা না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রথমে ৬০ হাজার এবং পরে ১ লাখ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে রাজী হন। কিন্তু জেরুজালেমের রাজ বলডুইন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় সালাহউদ্দীন ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং 'দুঃখ দুর্গ' ধ্বংস করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। সালাহউদ্দীন প্রতিজ্ঞা পালনে অগ্রসর হন এবং তা সমাধা করতে সক্ষম হন। বলডুইন প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত বেলফোর্ডের নিকটস্থ একটি সরু পার্বত্য পথে সালাহউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখ শাহ কর্তৃক ধৃত হন কিন্তু হাম্ফ্রে নামক একজন তোরণ রক্ষীর প্রচেষ্টায় বলডুইন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। এ ঘটনার পর বলডুইন সদ্যপ্রাপ্ত অপমান ঘুচাবার জন্য বিশাল এক কনফেডারেট বাহিনী গঠন করে মার্জিয়ানের প্রান্তরে সালাহউদ্দীনের শিবির অতর্কিত আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সালাহউদ্দীন খুব দ্রুততার সাথে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করেন এবং শত্রুবাহিনীর ওপর পাল্টা আঘাত হানা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শত্রুবাহিনীর ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ, ত্রিপোলিসের রেমণ্ড, ইবেলিনের বেলিয়ান, জেরুজালেম রাজ বলডুইন, তাইবেরিয়াসের হাগ প্রভৃতি ৭০ জন বিখ্যাত নাইট ও রাজা গাজী সালাহউদ্দীনের হাতে বন্দী হন। দেড় লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ও এক হাজার আরব বন্দীকে মুক্তি দিয়ে বলডুইন নিজেকে কারামুক্ত করেন।

এর পরের ঘটনা। খৃষ্টানদের চিন্তারাজ্যে পরিবর্তন ঘটে। তারা চিন্তা করলো গাজী সালাহউদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করে বৃথা রক্তক্ষয় ও ব্যর্থতার

গ্লানী কুড়িয়ে লাভ কি ? তাই তারা গাজী সালাহউদ্দীনের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এটা ১১৮০ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের ঘটনা। এভাবে গাজী সালাহউদ্দীনের ক্ষমতা এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। ফোরাত থেকে ত্রিপোলী পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলে স্বীকৃত হন। এরূপ উচ্চপদ পেলে লোভ ও গর্বিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু গাজী সালাহউদ্দীন ছিলেন একজন সত্যের সৈনিক। তাই তিনি সর্বদা এক মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্বীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। আল্লাহর আইন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য তাই তাঁকে দেখা গেছে একদিকে যুদ্ধ হচ্ছে আর বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝখানে সামান্য একটি ভৃত্য নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে থেকেই মুসলমানদের চালিকা শক্তি কুরআন ও হাদীস থেকে দিকনির্দেশনা নিচ্ছেন এবং সেই অনুযায়ী স্বীয় ক্ষমতা ও বাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করছেন।

গাজী সালাহউদ্দীন ১১৮০ খৃস্টাব্দের ২রা অক্টোবর সেঞ্জা নদীতটে একটি ঐতিহাসিক জাতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। এখানে মসূল, জাজিরা, ইব্রিল, কায়ফা ও মারাদিনের শাহজাদাগণ এবং কুনিয়ার সুলতান ও আর্মেনিয়ার রাজা রূপেন গাজী সালাহউদ্দীনের সাথে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্তানুসারে তাঁরা দু' বছরকাল শান্তিতে থাকতে প্রতিশ্রুত হন।

এভাবে মহাশান্তি স্থাপিত হলে গাজী সালাহউদ্দীন ফররুখ শাহের হাতে সিরিয়ার শাসনভার অর্পণ করে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। এটা ১১৮১ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগের ঘটনা। মহাশান্তির মেয়াদকাল শেষ হবার আগেই রাজমুকুট বার বার হাত বদল হয়। অবশ্য এটা বিনা যুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই নতুনদের অনেকেই পূর্বসূরীদের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে গাজী সালাহউদ্দীনকে শায়েস্তার প্রচেষ্টা নেন। তবুও গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি অটল থেকে ১১৮২ খৃস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ১১ মে তিনি আবার অভিযানে বের হন। খৃস্টান জগত তাঁকে রুখবার জন্য সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান হলো। ক্রুসেডাররা তাঁকে রুখবার জন্য সীমান্তে সমবেত হয়েছে শুনে গাজী সালাহউদ্দীন মরুপথে সিনাই উপত্যকা দিয়ে আয়লা বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি সির পর্বতের পাদদেশস্থ কংকরময় প্রান্তর অতিক্রম করে উত্তর দিকে মোড় নেন। মন্টি রিয়েলের চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদ বিনা বাধায় জয় করেন। ফরকে অবস্থানরত ক্রুসেডাররা একত্রিত হয়ে সালাহউদ্দীনের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল কিন্তু তাঁর মুখোমুখি হতে সাহস পেল না। ফলে সালাহউদ্দীন তাঁর লক্ষস্থল দামেশকে পৌঁছার জন্য মোয়াবের পথ ধরে চললেন। এটা ১১৮২ খৃস্টাব্দের

জুন মাসের মধ্যভাগের ঘটনা। এদিকে সিপাহ্সালার গাজী সালাহ-উদ্দীনের নির্দেশ পেয়ে ফররুখ শাহ জর্দান নদী অতিক্রম করে গ্যালিলি উৎসন্ন, দেবুরিয়া লুণ্ঠন, এমনকি ক্রুসেডারদের অতি প্রয়োজনীয় গিরিদুর্গ হার্বেশ জেলদেব অধিকার করে ২০ হাজার গো-মহিষাদি ও এক হাজার যুদ্ধ বন্দী নিয়ে দামেশকে ফিরে আসেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখ শাহের কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল সালাহউদ্দীন জুলাই মাসে তাঁকে পুনরায় প্যালেস্টাইন অভিযানে পাঠান এবং তিনি স্বয়ং জর্দান নদী অতিক্রম করে রায়সানের দিকে অগ্রসর হন। এ সংবাদে ক্রুসেডাররা শিবির ত্যাগ করে বেলভেয়র রক্ষার্থে ধাবিত হলো। এ নবনির্মিত দুর্গে তাদের প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষিত ছিলো। গাজী সালাহউদ্দীন ফররুখ শাহকে একদল ধনূর্ধর ও অশ্বারোহী সহ তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। তাঁরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌছাতে না পৌছাতেই যুদ্ধ শুরু হলো। বেলিয়ান, বলডুইন ও অন্যান্য ক্রুসেড নেতা প্রাণপণে শত্রু দমন করলেও অবশেষে মুসলমান বাহিনীই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। কিন্তু বিজয় লাভ করলেও পরাজিত ক্রুসেডারদের তুলনায় মুসলিম বাহিনীই অধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

ইতিমধ্যে ইরানের আমির কুকবারী গাজী সালাহউদ্দীনকে জাজিরা আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণ পেয়েই গাজী সালাহউদ্দীন শিবির তুলে নিয়ে আলেপ্পো যাত্রা করেন।

তিন দিন পর্যন্ত নগর অবরোধের ভান করে তিনি বিবায় ইউফ্রেতিস নদী পার হন। তাঁর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে কুকবারী তাঁর সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসেন। ফলে সালাহউদ্দীনের শক্তি আরো বেড়ে যায়। একে একে এডেসা, সরুজ, রাক্কা, কার্কিসিয়া ও নিসিবন সালাহউদ্দীনের হস্তগত হয়। এরপর তিনি ১০ নভেম্বর মসুল অবরোধ করেন এবং ৩০ ডিসেম্বর সিঞ্জার দুর্গ দখল করেন। এদিকে আর্মেনিয়ার শাহ, মারাদিনের শাহজাদা, মসুলের আতাবেক ও আলেপ্পোর রাজা গাজী সালাহউদ্দীনকে শায়েস্তা করবার জন্য হাজ্জেম প্রান্তরে একত্রিত হন। কিন্তু গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের নিকটবর্তী হলেই ভয়ে তাঁরা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এটা ১১৮৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে গাজী সালাহউদ্দীন একটি দুঃসংবাদ পেলেন যে, আয়েজুদ্দীন ক্রুসেডারদের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করছেন। তাই সময় ক্ষেপণ না করে তিনি আবারো ইউফ্রেতিস নদী পার হলেন এবং ২১ মে আলেপ্পোর সবুজ প্রান্তরে তাবু ফেললেন। আয়েজুদ্দীন বশ্যতা স্বীকার করলে শান্তি স্থাপিত হয়। সালাহউদ্দীন আলেপ্পো লাভ করেন। আর প্রতিদানে তিনি সালাহউদ্দীনের

জায়গিরদার হিসেবে রাক্কা, সেরাজু, নিসিবন প্রভৃতি নগরসহ সিঞ্জার রাজ্যের শাসনভার পেলেন। তদানুসারে ১২ জুন গাজী সালাহউদ্দীনের হস্তে যথারীতি নগর অর্পিত হলো। পাঁচ দিন পর আয়েজুদ্দীন সিঞ্জার চলে গেলেন। জনতার বিপুল উল্লাস ধ্বনির মধ্যে গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর একান্ত কাংখিত নগরে প্রবেশ করলেন।

দু' মাস আলেপ্পোতে অবস্থানের পর গাজী সালাহউদ্দীন ১১৮৩ খৃস্টাব্দের ১৪ আগস্ট দামেশক ফিরে আসেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই অতিবাহিত করবেন বলে স্থির সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে অমিতা বিক্রম ফররুখ শাহ পরলোকগমন করলে ক্রুসেডাররা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বোস্ত্রা, জ্বোরা, এমন কি দামেশকের অদূরবর্তী দারায়্যা পর্যন্ত সমগ্র জনপদ তাদের হাতে লুণ্ঠিত হয়। যেহেতু দুর্গের জন্য আরবরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতো। ক্রুসেডাররা তাও কেড়ে নিলো। চেটিলনের রেজিনাল্ড সকলের ওপর টেক্কা দিলেন। তিনি একেবারে হযরত মুহাম্মাদ স.-এর রওজা মুবারক ও মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র কা'বা শরীফ ধ্বংসের পরিকল্পনা করলেন। তাঁর নৌবহর লোহিত সাগর তীরের আযধব বন্দর লুণ্ঠনে প্রেরিত হলো। আর বেদুঈনদের উৎকোচ দানে বাধ্য করে জাহাজের অংশগুলো বরক থেকে আকাবা উপসাগরে প্রেরণ করে তিনি স্বয়ং আয়লা অবরোধ করেন। এভাবে দিনে দিনে রেজিনাল্ডের যুলুমে চারদিকে হাহাকার রব উঠলো। ১৬খানা আরব জাহাজ তাঁর হস্তে ভস্মীভূত ও একখানা হজ্বযাত্রীর জাহাজ লুণ্ঠিত হলো। পথচারী এক দল নিরীহ পথিককে ধরে নিয়ে তিনি তাদের সকলকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তাঁর যুলুমবাজি, বিশেষ করে হযরত নবী করীম স.-এর দেহাস্থি বের করার চেষ্টার কথা শুনে মুসলমানেরা শিউরে উঠতে লাগলো। সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে এ সকল দুষ্কার্যের জন্য ক্রুসেডারদের শাস্তি প্রদান করা ছিল গাজী সালাহউদ্দীনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

১১৮৩ খৃস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁর বাহিনী নিয়ে জর্দান নদী অতিক্রম করেন এবং বিনা বাঁধায় রায়সান অধিকার করে তিনি জেজরিল উপত্যকার পথে অগ্রসর হয়ে আয়ন-জেলুদের পাশে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। এ স্থানকে কেন্দ্র করে তিনি তেবুর ও নাজারেথের চতুর্দিকস্থ জনপদ ও ফরবেলেত দখল করেন। সাফুরিয়ায় অপেক্ষারত ক্রুসেডারদের মূল বাহিনীর সাথে যোগ দেবার জন্য করক থেকে আগত একটি ক্রুসেড বাহিনী ৩০ সেপ্টেম্বর মুসলমানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয়। এ সংবাদ পেয়ে মূল ক্রুসেডার বাহিনী শিবির তুলে আল-ফুরার দিকে অগ্রসর হলে গাজী

সালাহউদ্দীন তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেছেন ঃ

"Never....had Palestine seen so vast an army of Crusaders."

যা হোক, ভয়াবহ যুদ্ধের পর ক্রুসেডাররা স্থান পরিবর্তন করে সাফুরিয়ায় পালিয়ে যায়। সালাহউদ্দীনের ধনূর্ধরেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেন।

এবার গাজী সালাহউদ্দীন শক্তিধর রেজিনাল্ডের সাথে বুঝা পড়ার জন্য অগ্রসর হন ; কিন্তু কোনোক্রমেই তাঁর দুর্গ অধিকার করতে পারলেন না। অবশেষে রাজকীয় সৈন্যদল রেজিনাল্ডের সাহায্যে এগিয়ে আসছে জানতে পেরে তিনি রণক্লান্ত বাহিনী নিয়ে দামেশকে ফিরে আসেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১১৮৩ খৃঃ)।

১১৮৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে গাজী সালাহউদ্দীন আবারো নব উদ্যমে রেজিনাল্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাঁর প্রধান রক্ষাব্যূহ 'করক' অবরোধ করেন। যুদ্ধাবস্থায় রেজিনাল্ড ভীষণভাবে আক্রান্ত হন এবং কোনোক্রমে পালিয়ে গিয়ে দুর্গে আশ্রয় নেন। শহর ও উপশহর গাজী সালাহউদ্দীনের দখলে আসলেও দুর্গ অবিজিতই রইলো। ইতিমধ্যে আর একটি ক্রুসেডার বাহিনী রেজিনাল্ডকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে সালাহউদ্দীনের বাহিনীর উপর আপতিত হয় এবং চীনের কমুনিস্ট নেতা চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর ন্যায় আক্রমণ কৌশল অবলম্বন করে অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিছুতেই তাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে না পেরে গাজী সালাহউদ্দীন সামারিয়া ও দেবুরিয়া হতে প্রচুর মালে গনীমত লাভ করে ১১৮৪ খৃস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর দামেশক ফিরে আসেন।

বলডুইন দেহত্যাগ করেন। ত্রিপোলিসের রেমণ্ড তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রেমণ্ড ক্ষমতায় এসেই সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দেন এবং একটা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সালাহউদ্দীনের কাছে প্রস্তাব পাঠান। শান্তিকামী বীর গাজী সালাহউদ্দীন সাথে সাথে রেমণ্ডের শুভ উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। ১১৮৫ খৃস্টাব্দে ৪ বছরের জন্য মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। শান্তির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ঠিকই কিন্তু এটা ছিলো মূলত 'শ্রান্ত সৈনিকের নিদ্রার ন্যায়'। সালাহউদ্দীন রেমণ্ড শান্তির প্রত্যাশী হলেও ধর্মাচার্য হিরাক্লিয়াস শান্তি চাননি। এর বড় প্রমাণ, তিনি তখন থেকেই নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য গোটা ইউরোপময় ছুটে ফিরছিলেন। আর সোভিয়েট থেকে পিরেনিজ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভূ-খণ্ডের

ইংরেজ নাইটেরা সালাহউদ্দীন ও মুসলিম আধিপত্য ধ্বংস করার জন্যে ক্রুশ গ্রহণ করছিলেন। অপরদিকে টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায় মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেডে যোগদানের জন্য জ্বলে পুড়ে মরছিলো। আর এ আগুনে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র যে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে সালাহউদ্দীন চুক্তি স্বাক্ষর করেই দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে চললেন। কারণ তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, খৃস্টানরা যতই কাগজে কলমে স্বাক্ষর করুক না কেন তাদের স্বাক্ষর বা কথার কোনো মূল্য নেই, যেমন নেই অভিশপ্ত ইসরাঈল জাতির। তাই তিনি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিজ প্রচেষ্টায় মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কলহগুলো মিটিয়ে ফেললেন। এতে যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রনায়কেরা এতদিন সালাহউদ্দীনের খ্যাতি ও গৌরবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁরা তাঁর শত্রুতা করে আসছিলো এখন তাঁরা মিত্রে পরিণত হওয়ায় গাজী সালাহউদ্দীনের পক্ষে জাতীয় শত্রু ক্রুসেডারদের মুকাবিলা করা সহজতর হলো। কারণ তাঁর বিপদে অন্যান্য মুসলিম দেশের তরফ থেকে সাহায্যের আশা ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত হলো। মূলত এ অতিরিক্ত শক্তি ছাড়া তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপ থেকে আগত নবীন ও সবল ক্রুসেড বাহিনীর সম্মুখিন হওয়া কিছুতেই সালাহউদ্দীনের বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

১১৮৬ খৃস্টাব্দ ও শান্তির সময় রেজিনাল্ড পূর্বের ন্যায় আবারো লুটপাট শুরু করেন। আক্রান্ত বণিকগণ তাঁর এ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলে তিনি জবাব দেন ঃ "তোমরা তো মুহাম্মাদে স. বিশ্বাস কর, তিনি এসে তোমাদেরকে রক্ষা করছেন না কেন ?" রেজিনাল্ডের এ সকল অমার্জিত কথা ও ঔদ্ধত আচরণের ঘটনা গাজী সালাহউদ্দীনের কানে পৌছলে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন এবং শীঘ্রই এর একটি সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হন। ইসলাম ও তার চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি হুমকি ও কুটূক্তি গাজী সালাহউদ্দীনের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত বীর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক নরপশু রেজিনাল্ডকে নিধন করে এর দাঁতভাঙা জবাব দেবেনই।

তাই তিনি এবার আংশিক যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি দ্রুত সৈন্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়া, জাজিরা, মেসোপটেমিয়া, দিয়ারবকর ও মিসরে দূত পাঠালেন। ১১৮৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসেই তিনি সমগ্র খৃস্টান জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

তাঁর জেষ্ঠপুত্র আল আফযাল রেমণ্ডের রাজ্য জয় করে ফিরার পথে বাঁধ সাধলে আবারো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও আল-আফযাল চূড়ান্ত বিজয় লাভ করলেন। ফলে হস্পিটালারদের অধ্যক্ষের মস্তক কর্তিত, অধ্যক্ষ ও অপর দুটি লোক ছাড়া টেম্পলার সমস্ত লোক নিহত এবং ৪০ জন নাইট বন্দী হন। ক্রুসেডাররা এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতি নেয় এবং গাজী সালাহউদ্দীনকে নিধনের জন্যে সাফুরিয়ার উচ্চ শ্রেণীর নিকট সমাবেশের উদ্দেশ্যে চতুর্দিক হতে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে আসতে থাকে। টমাস বেকেটকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইংলাণ্ডের রাজা হেনরীর প্রেরিত অর্থে ইংলাণ্ডের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ শুরু হলো। ১২০০ নাইট, ১৮,০০০ পদাতিক ও এ্যারাবিয়ান রণকৌশলে সজ্জিত কয়েক হাজার অশ্বারোহী ; সব মিলে দেখতে দেখতে ৫০ হাজার লোক ক্রুশ-পতাকার নীচে সমবেত হলো। এদিকে মসুল ও মারাদিন থেকে নতুন সৈন্য এসে উপস্থিত হওয়ায় সালাহউদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ১২ হাজারে উন্নীত হলো। গাজী সালাহউদ্দীন তড়িৎ গতিতে স্বীয় সৈন্যকে অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, দক্ষিণ ও বাম—এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তিনি স্বয়ং কেন্দ্র ভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সেনাপতি তাকিউদ্দীন ও ফুকবারীর ওপর উভয় পার্শ্বের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হলো। ২৬ জুন রোজ শুক্রবার জুমআর নামায শেষে তিনি অভিযানে বের হলেন। জর্দান নদী অতিক্রম করে সাফুরিয়ার ১০ মাইল পূর্বে হিত্তিন নামক গ্রামের নিকট তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং ইসলামিক যুদ্ধনীতি অনুযায়ী আগে আঘাত না হেনে আক্রান্ত হওয়ার আশায় অপেক্ষারত থাকেন। কিন্তু শত্রু শিবিরে খবর রটল যে, গাজী সালাহউদ্দীনের পতাকাতলে অসংখ্য সৈন্য সমবেত হয়েই চলছে। সংবাদটি কাল বৈশাখী ঝড়ের মতোই শত্রু শিবিরে গিয়ে আঘাত হানে। একেতো বিশ্ববরেণ্য বীর গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্ব তার ওপরে দুর্ধর্ষ মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাধিক্য—ক্রুসেডাররা দারুণভাবে ভড়কে গেল। সন্ত্রস্থ ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ তৎক্ষণাত সাফুরিয়া থেকে শিবির তুলে তাইবেরিয়াসের দিকে যাত্রা করে (৩রা জুলাই)। অথচ সাফুরিয়াতেই তারা সব থেকে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। এখানে যেমনি ছিলো প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল তেমনি ছিলো প্রচুর পরিমাণে ফলবান বৃক্ষরাজি। তাছাড়া ছিলো তাদের নিজস্ব ফাবা ও বেলভয়ে দুটি সেনানিবাস। কিন্তু রেমণ্ডের সাবধানবাণী উপেক্ষা করে রাজা গাঈ যখন টেম্পলারের অধ্যক্ষের জেদের বশবর্তী হয়ে পানিহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে সৈন্যগণকে তাইবেরিয়াস যাত্রার আদেশ দিলেন তখনই সমস্ত সুবিধাদি হাতছাড়া হয়ে গেলো।

৩ জুলাই ক্রুসেডার বাহিনী শিবির তুলে তাইবেরিয়াস যাত্রার চেষ্টা করলেই সালাহউদ্দীনের বাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। আর এর সাথে সাথেই শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। এতে ইবেলিনের বেলিয়ানের সম্মুখস্থ সেনারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেলিয়ানের বহু নাইট এখানে নিহত হলো। প্রখর সূর্য-কিরণ তার দাহিকা শক্তি দিয়ে ক্রুসেডারদের ওপর চরম আঘাত হানা শুরু করলো। ফলে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ উত্তপ্ত হয়ে হতভাগ্য ক্রুসেডারদেরকে বিপর্যস্ত করে তুললো। পিপাসায় তারা ছটফট করতে লাগলো। অথচ কোথাও একবিন্দু পানি নেই। সমস্ত বাহিনী বিশৃংখল হয়ে সন্ধ্যাকাল অবধি পথ চলেও তাইবেরিয়ার অর্ধেক পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হলো। নিরুপায় হয়ে রাজা গাঈ সৈন্যগণকে সশস্ত্র অবস্থায় রাত্রি যাপনের আদেশ দিলেন। এ রাত ক্রুসেডারদের জন্য ছিলো 'কারবালা'। চারদিকে শুধু চিৎকার—পানি! পানি! পিপাসায় মানুষ ও অশ্বাদির প্রাণবায়ু বের হবার উপক্রম হলো। শত্রু বাহিনীর এ দৈন্যতার আধিক্য আরো বাড়াবার জন্য আরব বাহিনী শুকনা কাঠ ও লতাপাতা সংগ্রহ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে ধোয়ায় তারা প্রায় অর্ধমৃত হয়ে পড়ল।

৪ জুলাই ভোর বেলা অশ্বারোহী বাহিনী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পদাতিক বাহিনী চলনশক্তি হারিয়ে পাণ্ডব বর্ণ ধারণ করে। পক্ষান্তরে কূপগুলো মুসলিম বাহিনীর অধিকারে থাকায় তাঁরা সবল ও সতেজ ছিল। নিজেদের বিপদজনক অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকলেও ক্রুসেডার বাহিনীর শোচনীয় দুরাবস্থা দেখে তাদের উৎকণ্ঠা হ্রাস পায়। যে সকল মুসলিম সেনাদল কাফার সেবতের পাহাড় দখল করে রেখেছিলো তাঁরা রাজা গাঈকে তাইবেরিয়াসের রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দেয়। হিত্তিনের দু' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লুবিয়া গ্রামের নিকটে উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলো। রাজা গাঈ ওয়াদী হাম্মামের কূপ শ্রেণীর নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করলেন। মুসলিম বাহিনীও করুণা করে সুযোগ দিলো। কিন্তু উদীয়মান সূর্য-কিরণে ক্রুসেডারদের চক্ষু নিষ্প্রভ হয়ে আসলে শরাখাতে তাদের বহু সৈন্যকে অশ্বহীন করে তারা একযোগে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করে। শ্রান্ত হলেও ক্রুসেডাররা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করলো। কিন্তু কতক্ষণ? পিপাসায় কাতর, সূর্য ও বালুস্তূপের উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে দগ্ধ এবং ধোয়া ও অগ্নিশিখায় অন্ধপ্রায় ক্রুসেডারগণ বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। তারা পানির জন্য পাগলের ন্যায় হ্রদের দিকে ছুটে গেলো; কিন্তু যেতে পারলো না। সারেণ্ডার করানোর জন্য মুসলিম বাহিনী পথরোধ করে দাঁড়ালো। অবশেষে সারেণ্ডারে অস্বীকৃত হওয়ায় তাদের ওপর আপতিত হয়ে

কিয়দাংশকে পাহাড়ের নিচে নিক্ষেপ করে। বাদবাকি ক্রুসেডারদের নিহত ও বন্দী করেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলো হাম্ফ্রে, জোসেলিন, রেজিনাল্ড, রাজা গাঈ, রাজ ভ্রাতা এবং টেম্পলার ও হস্পিটালাদের সরদার প্রভৃতি বহু ক্রুসেড নেতৃবন্দ। রেমণ্ড, বেলিয়ান ও সিডনের প্রিন্স পালিয়ে বাঁচে। সর্বমোট ৩০ হাজার ক্রুসেডার হিত্তিনের যুদ্ধে নিহত হয়। দুর্ধর্ষ নরপশু রেজিনাল্ডকে হত্যা করে গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। গাজী সালাহউদ্দীন বন্দী রাজা গাঈকে নিজের পাশে বসিয়ে শরবত পান করান এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বন্দীদের প্রতিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে দামেশকে পাঠিয়ে দেন।

মুসলমানরা তাঁদের এ বিজয় হাসিলের জন্যে করুণাময় আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালো এবং আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে গোটা রজনীটিই বিনিদ্র রজনী কাটালো। অবশ্য তাঁদের এ আনন্দোৎসবের বহুবিধ কারণও ছিলো। প্রথমত, হিত্তিনের যুদ্ধে গোটা প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো—দ্বিতীয়ত, ক্রুসেডারদের পরাজয়ের ফলে জেরুজালেমে বিভ্রান্ত খৃস্টানদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটলো। গোটা খৃস্টান বিশ্বে যে সমস্ত ক্রুসেডার নেতা ছিলো—এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গাজী সালাহউদ্দীনের হাতে বন্দী হয়েছিলো। অবশিষ্ট ক্রুসেডাদের একত্রিত করার মতো কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি তাদের ছিলো না বললেই চলে। হিত্তিনের রণক্ষেত্রে খৃস্টান বিশ্বের যে অমূল্য রত্ন নষ্ট হয় ৭০০ বছরের মধ্যে তারা আর তা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি।

হিত্তিনের যুদ্ধে অধিকাংশ খৃস্টান নেতৃবৃন্দকে নিহত, আহত বা বন্দী করে গাজী সালাহউদ্দীন এবার তাদের রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। তিনি একদিন বিশ্রামের পরই তাঁর এক একজন জেনারেলের পরিচালনায় তাঁর অজেয় বাহিনীর এক একটি অংশকে এক এক দিকে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রতিটি বাহিনীই অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে খৃস্টান রাজ্যগুলো জয় করতে থাকে। খৃস্টানদের হাত থেকে বন্দী মুসলিম যোদ্ধাদের দ্রুত মুক্ত করে ঐ সকল নেতৃত্বহীন রাজ্যগুলো মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত করাই ছিলো সালাহউদ্দীন ও তাঁর জেনারেলদের মূল উদ্দেশ্য। এভাবে গাজী সালাহউদ্দীন একরে প্রবেশ করেন (৮ জুলাই)। একর নগরের প্রধানতম মসজিদ তিন পুরুষব্যাপী গির্জারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। তিনি আবার তা মসজিদে পরিণত করে সেখানে জুমআর নামায আদায় করেন। ক্রুসেডারদের আগমনের পর প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতটে এটাই সর্বপ্রথম মুসলিম জমায়েত। গাজী সালাহউদ্দীন একমাত্র এখানেই ৪ হাজার মুসলিম বন্দী মুক্ত করেন। ক্রুসেডারদের শক্তিশালী ঘাঁটি একর মুসলমানদের হস্তগত হওয়ায় গাজী

সালাহউদ্দীন প্রচুর ধন-সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্রের মালিক হন। এতে তাঁর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে তাঁর প্রেরিত কয়েকটি সেনাদল ফাবা (আল-ফুলা), নাজারেথ ও সাফুরিয়া অধিকার করে। কোনো কোনো দল হায়ফা ও সিজারিয়া (কায়সারিয়া) প্রবেশ করে। আবার কোনোটা বা সেবাস্তা ও নাবলুস জয় করে। ইতিমধ্যে সালাহউদ্দীনের আদেশে মিসর থেকে আগত আল-আদিল জাফফা ও মিরাবেল দখলে আনতে সক্ষম হন। গাজী সালাহউদ্দীন স্বয়ং বৈরুত ও জাবিল অধিকার করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রক্ষী সৈন্য ও অধিবাসীরা তাঁর নিকট সম্মানজনক ব্যবহার পেলো। সর্বত্রই জনগণ বুঝলো যে, এ মুসলিম নরপতির বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। সফেদ, হুনিন, বেলফোর্ট, বেলভেয়ে, টায়ার, আস্কালান, জেরুজালেম প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ ও নগর ছাড়া সমগ্র প্যালেস্টাইন আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই গাজী সালাহউদ্দীনের হস্তগত হলো।

ইতিহাস খ্যাত হিত্তিনের যুদ্ধে বিজয় লাভের ফলে গাজী সালাহউদ্দীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নরপতি রূপে পরিগণিত হলেন বটে, কিন্তু বিশাল ভূখণ্ড ও যশ-খ্যাতির অবিসংবাদিত প্রভু হতে হলে তাঁর যে আসল কাজটা সমাধা করার একান্ত প্রয়োজন ছিলো তা তখনও অসমাপ্তই রয়ে গিয়েছিল। আর তাহলো মুসলমানদের হস্তচ্যুত পবিত্র জেরুজালেম নগরী পুনরাধিকার। কারণ এ জেরুজালেমই ছিলো ক্রুসেড যুদ্ধের মূল কারণ বা উৎস। অপরদিকে শত্রু কবলিত এ ক্ষুদ্র রাজ্যটিই গাজী সালাহউদ্দীনের এশিয়া ও আফ্রিকা সাম্রাজ্যের সংযোগ সাধনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে পর্যন্ত উক্ত ব্যবধান দূরীভূত না হয়, যে পর্যন্ত পুণ্যভূমি আবার মুসলমানদের দখলে না আসে, সে পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানের সুলতানের পক্ষে কিছুতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার উপায় ছিল না। তাই গাজী সালাহউদ্দীন আস্কালনের পর পবিত্র জেরুজালেম নগরী পুনরাধিকারের জন্য মনোনিবেশ করেন।

গাজী সালাহউদ্দীন ছিলেন শান্তির অগ্রদূত এবং যুগশ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক। অন্য দিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী। রক্তপাত তিনি দারুণভাবে ঘৃণা করতেন। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ ক্রুসেড পাঠকেরা পেয়ে থাকেন। তাই পবিত্র জেরুজালেম জয়ের প্রাক্কালে জেরুজালেমের কিছু সম্ভ্রান্ত নেতৃত্বস্থানীয় লোককে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন ঃ

"আপনারা আগামী পেন্টেকস্ট পর্ব পর্যন্ত জেরুজালেমে থেকে গিয়ে চারদিকে ১৫ মাইল পর্যন্ত ভূভাগ চাষ-বাস করতে থাকুন। আর

প্রয়োজন হলে আমি আপনাদেরকে অর্থ সাহায্য করতেও রাজি আছি। অতপর মুক্তির আশা থাকলে নগর আপনাদেরই দখলে থাকবে, নতুবা আমাকে তা ছেড়ে দিতে হবে। আমি আপনাদেরকে ধন-সম্পত্তিসহ নিরাপদে খৃস্টান রাজ্যে পৌছে দিবো।"

দুষ্টবুদ্ধি খৃস্টানদের মিথ্যাবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা স্মরণ করলে গাজী সালাহউদ্দীনের এ প্রস্তাবকে শৌর্যপূর্ণ এমনকি অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করতেই হবে। একথা শুধু প্রাচ্যের ঐতিহাসিকগণই নয়, বহু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরাও অবনত মস্তকে স্বীকার করেছেন। স্টেনলি লেনপুল এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"The offer was chivalrous, even quixotic, when the bad faith of the Crusaders is rememberd and the lack of any security for their Keeping a promise."

বর্তমান বিশ্বে ইসরাঈল যেমন অঙ্গিকার এবং চুক্তিভঙ্গের জন্য বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, মধ্যযুগের খৃস্টান জাতিও অনুরূপভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। তখন এক জেরুজালেম প্রশ্নেই খৃস্টানেরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। গাজী সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না বলে অঙ্গিকার করায় ক্রুসেড নেতা বেলিয়ানের পরিবারবর্গকে জেরুজালেমে আসার অনুমতি দিলেন ; পরে সেই বেলিয়ানের নেতৃত্বেই জেরুজালেমের পুরোহিতরা গাজী সালাহ-উদ্দীনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এভাবে খৃস্টান জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় গাজী সালাহউদ্দীন ক্ষুব্ধ হন এবং বিশ্বাসঘাতকদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য অস্ত্র বলেই জেরুজালেম নগরী পুনরাধিকার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

১১৮৯ খৃস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর গাজী সালাহউদ্দীন জেরুজালেম অবরোধ করেন। মুসলিম শাসনামলে বসতি স্থাপনকারী ৬০ হাজার খৃস্টান তখনও মহান নগরী জেরুজালেমে বসবাস করছিলো। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এ সকল খৃস্টান তাঁদের জাতীয় রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে শান্তির আবাস পবিত্র জেরুজালেমে বসবাস করতে থাকেন। ঐতিহাসিক গিবনের উক্তি থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

"The most mumerous portion of the inhabitants were composed of the Greek and Orintal Christians whom experience hed tought to prefer the Mahometan before the Latin yoke."

গাজী সালাহউদ্দীন প্রথমে পবিত্র নগরীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান নিলেন; কিন্তু সূর্য কিরণে যুদ্ধের অসুবিধা হওয়ায় পাঁচ দিন পর অবস্থান তুলে পূর্ব দিকে সরে গিয়ে অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নেন। তাঁর এরূপ অবস্থান গ্রহণ করায় শত্রু শিবিরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তারা ধারণা করে সালাহউদ্দীন অবস্থান তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কাজেই তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় এবং আনন্দোৎসবে মত্ত হয়। কিন্তু পরদিন সকালে যখন তাদের নিকট সত্যটি প্রকাশিত হলো তখন তাদের মধ্যে আবারো বিষাদের ছায়া নেমে এলো। রণকৌশলী সালাহউদ্দীন ৪০টি দুর্গবিধ্বংসী যন্ত্র রাত্রিকালেই যথাস্থানে স্থাপন করেন। তাঁর কৌশলীগণ সিংহ দ্বারের বহিঃস্থ উপদুর্গ উড়িয়ে দিবার জন্য তার নিম্নভাগে সুড়ঙ্গ খনন আরম্ভ করলো। ১০ হাজার অশ্বারোহী রক্ষী শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলো। প্রাচীরের ওপরে বৃষ্টির ন্যায় অবিশ্রান্ত শর, প্রস্তর ও গ্রীক-অগ্নি (বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধে ব্যবহৃত সূক্ষ্ম দাহ্য পদার্থ, যা জ্বললে পানিতেও নিভে না) নিক্ষিপ্ত হতে থাকায় শত্রুদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো। সুতরাং খননকারীরা নির্বিঘ্নে দু'দিনের মধ্যেই উপদুর্গ প্রাচীরের নিম্নে প্রকাণ্ড এক সুড়ঙ্গ খনন করে তাতে প্রচুর কাঠ বুঝাই করে আগুন লাগিয়ে দিলো। ফলে দেখতে দেখতে প্রাচীরের এক বৃহৎ অংশ ভেঙে পড়লো। রক্ষী সৈন্যরা বাধা দিতে আসলে মুসলিম বাহিনী তাদের নগরীর মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। অবস্থা বেগতিক দেখে খৃস্টান নাগরিকরা নগরীর মধ্যে বিলাপ করতে লাগলো। রমণীরা তাদের কুমারী কন্যাদের কেশ কেটে দিলো। আর পুরোহিতরা ক্রুশ-কাষ্ঠ ধারণ করে মিছিলে বের হলো। কিন্তু তাদের দুর্নীতি ও লাম্পট্যে ঈশ্বরের কানের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই তাদের এ কাতর প্রার্থনা সেখানে সেদিন প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে এক শো স্বর্ণমুদ্রা দিলেও কেউ আর ভগ্নস্থানে পাহারা দিতে সাহস পেলো না। অগত্যা নাগরিকেরা গাজী সালাহউদ্দীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করলো। তারা সন্ধির শর্ত স্থির করার জন্যে দলপতি বেলিয়ানকে মুসলিম শিবিরে পাঠালো। ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনী ভগ্নস্থান থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করে উপদুর্গ প্রাচীরে তাঁদের পতাকা উত্তোলন করে। কাজেই গাজী সালাহউদ্দীন দলপতি বেলিয়ানকে বিদ্রূপ করে বলেন : "কেউ বন্দীর সাথে সন্ধি করে কি ?" কিন্তু তখনো নগর অধিকৃত হয়নি। ক্রুসেডার রক্ষী সৈন্যরা তখনো প্রাণপণে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতিকে প্রতিহত করে চলেছে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর বিজয় যে সুনিশ্চিত তা সিপাহসালার গাজী সালাহউদ্দীন বেশ ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু শক্তি

প্রয়োগ করে নগর দখল করলে তাতে প্রচুর রক্তক্ষয় হতো। পরাজিতেরা নিশ্চিত মৃত্যু জেনে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে হত্যা করতো, পবিত্র আল-আকসা মসজিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থান বিনষ্ট হতো, সমস্ত আসবাবপত্র ধ্বংস করতো এবং মুসলিম বন্দীগণকে হত্যা করে এক যোগে বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করতো। তাই শান্তিকামী বীর গাজী সালাহউদ্দীন শূন্য রক্তাক্ত নগরীতে প্রবেশ করা অপেক্ষা অবরুদ্ধ নাগরিকদেরকে কিছু সুবিধা দান করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, নগরের বাসিন্দারা যুদ্ধে বন্দী বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ ১০টি, প্রত্যেক রমণী ৫টি ও প্রত্যেক বালক বা বালিকা ১টি করে স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ দিবে। নাগরিকেরা আনন্দের সাথে সালাহউদ্দীনের এ প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং শর্ত পূর্ণ করে তারা দলে দলে সপরিবারে নগর ত্যাগ করতে লাগলো। কিন্তু তারা তাদের ভৃত্যদের অসহায় অবস্থায় পিছনে ফেলে চলে যাওয়ায় ভৃত্যদেরকে গাজী সালাহউদ্দীন বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দেন। মুসলিম সেনাপতি কুকবারী এক হাজার আর্মেনিয়ানকে সিপাহ সালার গাজী সালাহউদ্দীনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে মুক্তি দান করেন। অন্যান্য আমিররাও কমবদান্যতা দেখালেন না। কিন্তু প্রধান পুরোহিত হেরাক্লিয়াস অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানহীন ছিলেন। নিজের বিপুল ধন-সম্পত্তি ছাড়া তিনি মন্দিরের ধন-সম্পদ, সুবর্ণ পানপাত্র ও অন্যান্য বাসনপত্র পর্যন্ত অপহরণ করে নিয়ে যান। অথচ এগুলোর বিনিময়ে তিনি প্রচুর অসহায় স্বজাতিকে মুক্তিদান করে সাথে নিয়ে যেতে পারতেন।

দীর্ঘ ৪০ দিন পর্যন্ত নদীর স্রোতের ন্যায় বিষাদ-ক্লিষ্ট খৃস্টান জনতা দায়ূদ দ্বার দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গমন করলো। তথাপিও হাজার হাজার অসহায় গরীব লোক জেরুজালেম নগরীতে রয়ে গেলো। আল আদিল গাজী সালাহউদ্দীনের কাছ থেকে চেয়ে এক হাজার নিঃস্ব গরীবকে মুক্তিদান করলেন। এতে লজ্জিত হয়ে পুরোহিত হিরাক্লিয়াস ও দলপতি বেলিয়ানও অনুরূপ ভিক্ষা চাইলেন। সদাশয় সালাহউদ্দীন তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতপর তাঁর নিজের পালা আসলো। গাজী সালাহউদ্দীন মুক্তিপণ দানে অসমর্থ সমস্ত গরীব ও বৃদ্ধ লোককে মুক্তিদানের আদেশ দিয়ে অবিলম্বে এক ফরমান জারি করলেন। ফলে দরিদ্র মহলে আনন্দের সাড়া পড়ে গেলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক সেন্ট লাজারসের দ্বার দিয়ে নগর ত্যাগ করলো। এরূপে সালাহউদ্দীনের দয়ায় অসংখ্য খৃস্টান দরিদ্র লোক মুক্তিলাভ করলো। এমতাবস্থায় গাজী সালাহউদ্দীন লক্ষ করলেন একটি যুবক একটি বৃদ্ধ লোককে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখামাত্র

যুবকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "বৃদ্ধ লোকটি তোমার কি হয় ?" তিনি প্রশ্নের জবাবে যখন জানতে পারলেন বৃদ্ধটি যুবকের পিতা, তখন তিনি এরূপ পিতৃভক্তি দেখে ভীষণ খুশী হন। অবশেষে গাজী সালাহউদ্দীন যুবকটিকে প্রচুর সম্মান ও উপহার দিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতে অনুমতি প্রদান করেন। তৎকালীন যুগে শত্রু বন্দীদের প্রতি এরূপ আচরণ আশা করা ছিলো সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ব্যাপার।

হস্পিটালারেরা তাঁর ভীষণতর শত্রু হলেও এক বছরকাল পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে অবস্থানের প্রার্থনা জানালে সালাহউদ্দীন তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। গির্জার ক্রুশ ও পবিত্র ক্রুশ চিহ্নসমূহ তিনি বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ মুসলিম বিশ্বের খলীফার নিকট পাঠাতে মনস্থ করলেও খৃষ্টানদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ করে তিনি উক্ত ইচ্ছা থেকে বিরত হন।

এরপর বিজিত জেরুজালেমে এ সময় আর একটি দৃশ্যের অবতারণা হলো। বন্দী ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের আত্মীয়-স্বজন ক্রন্দনরত অবস্থায় সালাহ উদ্দীনের দরবারে এসে দলে দলে হাজির হলো। কোমল প্রাণ সালাহউদ্দীনের হৃদয় এ করুণ দৃশ্যে প্রকম্পিত হলো। ব্যথিত হৃদয়ে তাঁদের প্রার্থনা জানতে চান তিনি। তারা সবাই গাজী সালাহউদ্দীনের কাছে তাদের একান্ত আপনজন —স্বামী-পিতা-পুত্রদের মুক্তির আবেদন জানালে তিনি সাথে সাথে বন্দী শত্রুদের মুক্ত করে দেন। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে জীবনের একান্ত আপনজনদের কাছে পেয়ে সকলেই হাত ধরাধরি করে সালাহ উদ্দীনের জয়গান করতে করতে তারা বিদায় হলো। গাজী সালাহউদ্দীন তাদের আনন্দে একাকার হয়ে গেলেন। বিদায়ী বন্দীদের দিকে চেয়ে থেকে তিনি স্বর্গীয় সুখ ভোগ করতে লাগলেন। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে গেলে আরো একটি করুণ দৃশ্যের সূত্রপাত হয়। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ বাড়ীতে ফিরতে পারলো না অর্থাৎ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ক্রন্দন রবে সালাহউদ্দীনের দরবারে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। গাজী সালাহউদ্দীন ভীষণভাবে বিব্রত হয়ে এদেরকে সান্ত্বনা দানের জন্য বিবিধ পন্থা অবলম্বন করেন। পরে তারা আশ্বস্ত হলে গাজী সালাহউদ্দীন রাজ কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ তাদের দেন। সালাহউদ্দীনের কাছ থেকে আশাতীত সমবেদনা ও অর্থ পেয়ে তারা হৃষ্টচিত্তে গাজী সালাহউদ্দীনের দীর্ঘায়ু কামনা করে স্ব স্ব গৃহে ফিরে যায়। বিশ্ব ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই। তাই তিনি বিশ্ব ইতিহাসে এতো স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। পাশ্চাত্য দেশীয় ঐতিহাসিক গিবন বলেন ঃ

"In these acts of mercy the virtue of Saladin deserves our admiration and love."

গাজী সালাহউদ্দীন ও মুসলমানদের এ করুণা ও মহতি আচরণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে পর্যবেক্ষক মহলের আরো দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। এক, স্বার্থপর খৃস্টান পাদ্রী ও ধনবানেরা যখন অসহায় স্বজাতীয়দের বন্দীদশায় ফেলে চলে যায়, শত্রু মুসলমানেরা তখন নিজেদের অর্থ ব্যয় করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। এভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত খৃস্টানেরা আশ্রয় লাভের জন্য ত্রিপোলিতে উপস্থিত হলে তথাকার খৃস্টান শাসক তাদের আশ্রয় তো সেদিন দেয়ইনি; বরং বিজিত মুসলমানেরা করুণা করে তাদের সে সকল দ্রব্য গ্রহণ করেনি। সেগুলো লুণ্ঠন করার জন্য সৈন্যও প্রেরণ করেছিলেন। দুই, ১০৯৯ খৃস্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডে ক্রুসেডারদের হাতে জেরুজালেমের পাশব বিজয়ের (Savage Conquest) কথাও স্মরণীয়। তখন আত্মসমর্পণকারী অসহায় মুসলমান নাগরিকের মৃতদেহে রাজ পথগুলো পূর্ণ করছিল। খৃস্টান সেনাপতি গডফ্রে ও টেঙ্ক্রেড শত-সহস্র দগ্ধ, অমানুষিকভাবে উপদ্রুত ও নিহত মুসলমানদের মৃতদেহ পদদলিত করে অশ্বারোহণে সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করেন। সেদিন নর-শোনিতে খৃস্ট ভক্তেরা মন্দিরের ছাদ, চূড়া, এমনকি মিম্বর পর্যন্ত রঞ্জিত করে। ৯০ বছর পূর্বে ও পরে দুটি ভিন্ন জাতি কর্তৃক জেরুজালেম জয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধানের সমালোচনা করে ঐতিহাসিক লেনপুল বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে লিখেছেন ঃ

"If the taken of Jerusalem were the only fact Known about Saladin, it were enough to prove him the most chivalrous and great-hearted conqueror of his own and perhaps of any age."

অর্থাৎ যদি সালাহউদ্দীন সম্বন্ধে আর কিছুই না জেনে শুধু তাঁর জেরুজালেম অধিকারের কথাই আমাদের জানা থাকতো, তবে একমাত্র তা-ই তাঁকে সে যুগের এবং সম্ভবত যে কোনো যুগের সর্বাপেক্ষা মহাপ্রাণ শূর ও দিগ্বিজয়ী বলে প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট হতো।

এদিকে বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী গাজী সালাহউদ্দীন জয় করাতে গোটা মুসলিম বিশ্বে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। সারা বিশ্ব থেকে সুফী-সাধক, ফকীহ ও তীর্থযাত্রীরা দলে দলে পবিত্র নগরী জেরুজালেমের দিকে ছুটে আসেন। নগরীতে অহরহ কুরআন তেলাওয়াত, কবিতা আবৃত্তি ও মহান নগরী জেরুজালেমের তাৎপর্য নিয়ে বক্তৃতা চললো। আল আকসা ও ওমর

মসজিদকে খৃস্টানেরা এতোদিন গির্জায় পরিণত করে রেখেছিলো ; এখন এগুলো আবার পূর্বরূপ ফিরে পেলো। ৯ অক্টোবর শুক্রবার বিশাল জনতা জুমআর নামায সমাপণ করার জন্য আল আকসা মসজিদে সমবেত হলো। আলেপ্পোর প্রধান কাযী মর্মস্পর্শী ভাষায় খুতবা দিলেন। পঁচিশ বছর পূর্বে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী একখানা কারুকার্য খচিত মনোরম মিম্বর নির্মাণ করেন। গাজী সালাহউদ্দীন তা আল আকসা মসজিদে স্থাপন করেন, যা অদ্যবধি সেখানে রক্ষিত আছে। মসজিদের বৃহৎ কুলঙ্গীতে আজো. গাজী সালাহ-উদ্দীনের খোদিত প্রস্তরলিপি দেখতে পাওয়া যাবে।

এদিকে জেরুজালেমের পতন সংবাদ ইউরোপে পৌছলে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল ওঠে। 'সোনার প্রাচ্যে' খৃস্টান সভ্যতার একমাত্র কেন্দ্র ও বাইবেল ভক্ত পবিত্র নগররাজি বিধর্মী মুসলমানদের হস্তগত হওয়ায় তা পুনরুদ্ধারের জন্য খৃস্টান বিশ্বে সাঝ সাঝ রব উঠলো। পোপ নতুন করে ক্রুসেডের ভেরী বাদন করলেন। ধর্মযুদ্ধে যাদের মৃত্যু হবে, তিনি তাদের সর্বপ্রকার পাপ-মোচনের ভার নিলেন। থ্যাচার এবং শিউইল বলেন ঃ.

"The Pope had promised remission of sins to all who should lose their lives while on the Crusades."

কাজেই ধর্মানুরাগীরা তো বটেই পাপীমহলেও যুদ্ধোদ্যোমের সাড়া পড়ে গেলো। নৃপতিবৃন্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড সর্বপ্রথম ক্রুশ চিহ্ন ধারণ করলেন। ফরাসী রাজ ফিলিপ অগাস্টাস ইংল্যাণ্ডের সাথে তার চিরন্তন বিবাদ ভুলে গিয়ে ক্রুসেডে গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। ক্যান্টরবারীর বলডুইন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে খৃস্টান জগতে জনমত সৃষ্টির জন্য পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোকের সম্পত্তির দশমাংশ 'সালাদিন কর' রূপে গৃহীত হলো। হতভাগ্য ইহুদীরাও বাধ্য হয়ে যুদ্ধ ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থদান করলো। ইংল্যাণ্ডে সংগৃহীত অর্থের সাত ভাগের ছয় ভাগই স্বল্প সংখ্যক ইহুদীর নিকট হতে বলপূর্বক আদায় করা হলো। তারপর শুরু হলো হত্যা ও লুণ্ঠনের পালা। ইহুদীদের প্রায় প্রত্যেকটি গৃহই লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হলো। লণ্ডনের রাজ পথে খৃস্টানেরা যে সকল ইহুদীর সাক্ষাত পেলো, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করলো। ইয়র্কের ইহুদীরা প্রাণভয়ে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিলে খৃস্টানরা তা অবরোধ করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অবরুদ্ধ ইহুদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আত্মহত্যা করে খৃস্টান কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যুর হাত এড়ালো। কক্স, বার্ট ক্রুসেডারদের এ নৃশংসতার একটি সুন্দর চিত্র তাঁর গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"Every Jew in the street was cut down ; every house belonging to a Jew was plundered and burnt... In a few hours the work of death was done, ... the Christians rushing in slaughtered every living the thing within the walls."

এবার খৃস্টান বিশ্বে সর্বত্র থেকে স্ব স্ব দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধান, ডিউক, উগ্রমস্তিষ্ক নাইট, বিশপ, পাদ্রী এবং অভিজাত শ্রেণী নেতৃত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি খৃস্টান দেশ থেকে পৃথক পৃথকভাবে বিশাল ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয়। সিসিলীর উইলিয়াম, ফরাসী সম্রাট ফিলিপ, জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবাবোসা, সুয়েরিয়ার ডিউক, রাজা গাঈ, মন্টিফের্রাতের মার্কোস, কনরার্ড বিউভায়েসের বিশপ, এভেসনেসের বিখ্যাত নাইট জেমস, সিডনেই রেজিনান্ড ক্যাম্পেনের হেনরী, কেন্টে রবারীর আর্চ বিশপ, বলডুইন, সেলেসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াল্টার ও প্রধান বিচারপতি রেনুলাফ-ডি-গ্লান ভাইল, ফ্লাণ্ডার্সের কাউন্ট রাণী সিবিলা, বার্গেণ্ডীর ডিউক প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষরা ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে বাঁধভাঙা ঢেউ-এর মতোই দুর্বার গতিতে জেরুজালেমের দিকে ছুটে আসে এবং চলার পথে যে নৃশংস হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞের আশ্রয় নেয় তাতে খৃস্টান ইতিহাসের পাতা রক্ত রঞ্জিত ও কলুষিত করে। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড রাজ-রিচার্ড ও বার্গেণ্ডীর ডিউকই এদিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি কুখ্যাত হয়ে আছেন। টায়ারে ও একরে ক্রুসেডাররা গাজী সালাহউদ্দীনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম নিধনে যে নিপুণতা ও হিংস্রতা প্রদর্শন করেছিলো তা ক্রুসেড পাঠকেরা কখনো ভুলতে পারবে না। রিচার্ডের প্রশংসাকারী ঐতিহাসিক আর্নুলের বর্ণনা মতে, এ নরপিশাচ রিচার্ড ১৬ আগস্ট (মতান্তরে ২০ আগস্ট) শুক্রবার ২৭০০ জন তুর্কী জামিনদারকে একর নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ধীর মস্তিষ্কে মুণ্ডুপাত করে। রিচার্ডের কার্যে উৎসাহিত হয়ে রিচার্ডের রাজকর্মচারী ও বার্গেণ্ডীর ডিউক আরো ২৩০০ জন বন্দী মুসলমানকে অনুরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করে। বিশ্ব ইতিহাসে এরূপভাবে অহেতুক হত্যাকাণ্ডের তুলনা বিরল। স্টেনলি লেনপুল বলেন ঃ

".... There is no imaginable exeuse or palhation for the cruel and cowardly massaere. After Saladin's almost quixotic acts of clemency and generousity the King of England's cruelty will appear emaging. But the studerits of the Crusales of not need be told that in this struggle the virtues of civilization, magnanimity, toleration, real chivalry, and gentle calture were all on the side of the Saracens."

অর্থাৎ এ নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের সমর্থন বা দোষস্খলনের জন্য কোনো যৌক্তিক কারণই কল্পনা করা যায় না। সালাহউদ্দীনের প্রায় অসঙ্গত শৌর্যপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কার্যাবলীর পর ইংল্যাণ্ডের অধিপতির নিষ্ঠুরতা বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কিন্তু এ দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধে মুসলমানেরাই যে সুসভ্যতা, সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, মার্জিত আচার প্রভৃতি যাবতীয় সদয় গুণের অধিকারী ছিলো ক্রুসেড পাঠকগণকে তা নতুন করে বলাই বাহুল্য।

ঐতিহাসিক গিবন রিচার্ডকে ".. Sanguinary Richard" বলে ঘৃণার সাথে উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক কক্স, বার্টও রিচার্ডকে কমে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন ঃ

"... Richard I .... may fairly compete with him (Nepoleon) as a criminal. Alaric the Goth and Attila the Hun never prafessed to be sovereigns of a civil sed people, but in no sense have they a better title to be regard as scourges of mankind."

অর্থাৎ অপরাধী হিসেবে তাঁকে নেপোলিয়নের সাথে তুলনা করা যায়। গথ এ্যালারিক বা হুন এটিলা কখনো নিজেদেরকে সভ্যজাতির রাজা বলে প্রকাশ করতেন না। কিন্তু কোনো মতেই 'মানবজাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচার্ড অপেক্ষা তাঁদের অধিক দাবী নেই।

একর হত্যাকাণ্ডের পর রিচার্ড জেরুজালেম অধিকারের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি যাদের সাহায্যে নগরী দখল করবেন সেই ক্রুসেডার বাহিনী তখন ভোগবিলাস ও মদ নারী নিয়ে রিপুসাধনে ব্যতিব্যস্ত। উৎকৃষ্ট মদ ও সুন্দরী ললনাসহ এমন আরামপ্রদ নগর ত্যাগে তাদের আদৌ ইচ্ছা ছিলো না। নারী না পেলে তারা স্থানান্তরে গমন করবে না বুঝতে পেরে রিচার্ড সমস্ত রমণীদের ক্রুসেড বাহিনীর অনুসরণ করার আদেশ দিলেন। রজকীদের সাথে ব্যভিচার করা নিষিদ্ধ বলে কেবল তাঁরাই এ আদেশ থেকে রেহাই পেলো। এবার ক্রুসেডাররা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। এক লাখ ক্রুসেডার সৈন্য ক্রুসেড সর্বাধিনায়ক রিচার্ডের অনুসরণ করলো। জেরুজালেম গমনের পথে তারা প্রথমে আসাফের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় (১১৯১ খৃঃ ৭ সেপ্টেম্বর)। উভয় বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিক আর্নূলের মতে, এখানে মুসলিম বাহিনীই প্রারম্ভে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরে গাজী সালাহউদ্দীনের উপস্থিতিতে ক্রুসেডার বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে ত্রাসে জাফফার প্রাচীরের ভিতর

গিয়ে আশ্রয় নেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্রুসেড নেতা রিচার্ড শান্তির প্রস্তাব দেয়। শান্তিকামী সালাহউদ্দীন রিচার্ডের প্রস্তাবে প্রায় রাজি, এমতাবস্থায় পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য মুসলিম জেনারেলরা খৃস্টানদের সাথে সন্ধি করতে অস্বীকার করেন। কারণ যাদের সাথে সন্ধি হবে তারা ইতিপূর্বে কোনো দিন সন্ধিপত্রের সম্মান দেননি ; বরং বারবার মুসলিম বাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রচুর জান ও মালের ক্ষতি করেছে। সন্ধির ব্যাপারে সালাহউদ্দীন যখন কোনোভাবেই অধীনস্থ জেনারেলদের রাজি করাতে পারলেন না তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিলম্ব ঘটছিলো। এতে ক্রুসেডাররা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ৩রা অক্টোবর কনরাড পৃথকভাবে আবার গাজী সালাহউদ্দীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠান। শেষ পর্যন্ত রিচার্ড তাঁর বোন সিসিলীর রাণী যোয়ানকে সালাহ-উদ্দীনের জেনারল আল আদিলের সাথে বিয়ে দিয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে সখ্যতা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করলে শান্তি স্থাপিত হয়। শর্তানুসারে স্থির হয়, বিয়ের যৌতুক হিসেবে আল আদিল জাফ্ফা, আস্কালান ও সমুদ্রতীরস্থ নগরাবলী রিচার্ডের কাছ থেকে পাবেন। দ্বিতীয়ত, অধিকৃত প্যালেস্টাইনের অংশ রিচার্ড নবদম্পতিকে উপহার দিবেন। তৃতীয়তঃ আল-আদিল ও রাণী যোয়ান একত্রে পবিত্র জেরুজালেমকে রাজধানী করে এ অঞ্চলগুলো শাসন করবেন।

এরপর আল আদিলের ভাবী শ্যালক রিচার্ড তাঁকে নিমন্ত্রণ করে রাজকীয় ভোজে আপ্যায়ণও করলেন। এমতাবস্থায় গাজী সালাহউদ্দীন বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়ায় স্বীয় সেনাদলকে রামাল্লা ও লিড্ডা থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে নিয়ে যান। এ সুযোগে বিশ্বাসঘাতক রিচার্ড তাঁর বাহিনী নিয়ে জেরুজালেম দখলের জন্য অভিযান করলে মুসলিম বাহিনীর সাথে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। অবশ্য খুব স্বল্প সময়েই এ যুদ্ধ থেমে যায়। নৈসর্গিক শক্তি ও মুসলিম বাহিনী কর্তৃক প্রতিহত হয়ে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এদের কোনো অংশ জাফ্ফায়, একর বা টায়ারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রিচার্ড অনুতপ্ত হয় এবং আল আদিলকে দিয়ে গাজী সালাহউদ্দীনকে আবারো সন্ধি স্থাপনে রাজী হবার জন্যে অনুরোধ জানায়। গাজী সালাহউদ্দীন সর্বক্ষণ শান্তির প্রত্যাশী ছিলেন এবং ইতিমধ্যে তিনি যুদ্ধের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই তিনি আবারে শান্তির পক্ষে রায় দিলেন। রিচার্ডের সাথে সন্ধি করতে রাজি হলেন। পাঁচ মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরকালে মুসলমানদের পক্ষে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। গাজী সালাহউদ্দীনের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গাজী সালাহউদ্দীন

বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হলে এ সুযোগে রিচার্ড আবারো বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে এবং দারুম দুর্গ দখল করে। এখানে রিচার্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা আবারো তাদের চিরাচরিত বর্বতার ঘৃণ্য নজির পুনঃ স্থাপন করলো। "Chronicles of the Crusades"-এর ২৮৭ পৃষ্ঠায় রিচার্ডের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক আর্নল ক্রুসেডের এ নৃশংসতা সম্বন্ধে সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। 'জেরুজালেম দখলের জন্য রিচার্ড তাঁর বাহিনীকে পরিচালনার উদ্যোগ নিলে গাজী সালাহ্উদ্দীন জরুরী ভিত্তিতে ১লা জুলাই এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন এবং পরের দিন শুক্রবার জুমআর নামাযের পর তিনি দরদবিগলিত কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলেন। আল্লাহ্ তাঁর মুনাজাত কবুল করেছিলেন।' তাই সমস্ত খৃস্টান জগত সম্মিলিতভাবে একদিকে, আর গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর বিশ্বস্ত বাহিনী নিয়ে একদিকে—তবুও তাঁর সাথে পারেনি। বিজয় বার বার তাঁরই পদচুম্বন করেছে। বেদুঈন আরব বাহিনীর বিশৃংখলতা, তুর্কী ও কুর্দীদের মনোমালিন্য, মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের ঈর্ষাকাতরতা এবং ক্রুসেডারদের বারবার বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও গাজী সালাহউদ্দীনের নিকট থেকে পবিত্র জেরুজালেম নগরী তারা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। বরং ক্রুসেডারদের এরূপ নৃশংসতার প্রতিদানে গাজী সালাহউদ্দীন যুদ্ধের ময়দানে যে মহত্ত্ব দেখিয়েছিলেন তা তাঁকে চিরদিন শত্রু-মিত্র প্রত্যেকের নিকটই চিরভাস্বর ও অমর করে রাখবে। জাফফার যুদ্ধে (৫ আগস্ট) বিশ্ব ক্রুসেডার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড তুমুলভাবে যুদ্ধ করতে করতে গাজী সালাহউদ্দীনের তরবারীর আঘাতে তাঁর অশ্বটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে ধরাশায়ী হলে মহান সালাহউদ্দীন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে সাথে সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে নিজের শ্রেষ্ঠ দুটি এ্যারাবিয়ান ঘোড়া রিচার্ডকে উপহার দেন এবং আবারো যুদ্ধে আহ্বান জানান। বিশ্ব হতবাক হলো। ক্রুসেডার বাহিনীর বুদ্ধিদীপ্ত সৈনিকদের মনে ভাবান্তরের সৃষ্টি হলো। তবুও "Lion-hearted" রিচার্ড থামলেন না ; অশ্ব পেয়ে তিনি আবারো গাজী সালাহ উদ্দীনকে নিধনের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কারণ জেরুজালেম তাঁর চাই-ই। তাই বিজয় অবধি যুদ্ধ করতে করতে রিচার্ড ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর জন্যে সেব, নাশপতির ন্যায় প্রচুর ফল-ফলারী দূত মারফত পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে একজন বিজ্ঞ হেকিমও পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারেন। কথিত আছে, গাজী সালাহ্উদ্দীন ছদ্মবেশে শত্রু রিচার্ডের শিবিরে যান এবং সেবা শুশ্রূষা করে অসহায় শত্রু রিচার্ডকে সুস্থ করে

তোলেন। এটা যখন জানাজানি হয়ে গেলো, তখন রিচার্ড নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। এটা ১১৯২ খৃস্টাব্দের ৯ অক্টোবরের ঘটনা। ফেরার পূর্বে রিচার্ড একটি সন্ধি করে যান (১১৯২ খৃঃ ২ সেপ্টেম্বর)।

এভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছরের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর ক্রুসেড শেষ হলো। এবার গাজী সালাহউদ্দীনের শৌর্য-বীর্যের মূল্যায়নের জন্য ক্রুসেডের ফলাফল খতিয়ে দেখা দরকার। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের পূর্বে, জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে এক ইঞ্চি ভূমিও মুসলমানদের হাতে ছিলো না। অথচ ১১৯২ খৃস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত রামাল্লার সন্ধির পরে টায়ার হতে জাফ্ফা পর্যন্ত সমুদ্র তটস্থ এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়া সমগ্র দেশে তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত হলো। ঐতিহাসিক গিবন বলেন ঃ

"...his empire was spread from the African Tripoli to the Tigris and from the Indian Ocean to the mountains of Armenia."

কাজেই সন্ধি সম্বন্ধে সালাহউদ্দীনের লজ্জিত হবার কোনোই কারণ ছিল না।

পোপের আবেদনে নিখিল খৃস্টানজগত সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলো। আর সমগ্র ইউরোপের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের প্রত্যেকটি লোকের সম্পত্তির এক-দশমাংশ 'সালাদীন কর' রূপে গ্রহণ করেছিলেন। রিচার্ড 'দি-লায়ন-হার্ট' তাঁর যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি, তালুকাদি, মণি-মাণিক্যরাজি, এমন কি দুর্গ ও বিচারকের পদ প্রভৃতি পর্যন্ত বিক্রয় করেছিলেন। অধিকন্তু উপযুক্ত ক্রেতা পেলে তিনি গাজী সালাহউদ্দীন ও বিশ্ব মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য যে অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করার জন্যে ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন বিক্রি করতেও প্রস্তুত ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। জার্মানীর সম্রাট, অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড, বার্গেণ্ডীর ডিউক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও সিসিলীর রাজন্যবর্গ ফ্লান্ডার্স ও ক্যাম্পের্নের কাউন্ট এবং সমগ্র খৃস্টান জাতির শত-সহস্র বিখ্যাত ব্যারন ও নাইট ক্রুসেড বিজেতা ও কিংবদন্তির মহান নায়ক গাজী সালাহউদ্দীনের হাত থেকে পবিত্র জেরুজালেম নগরীকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য প্যালেস্টাইনের রাজা ও প্রিন্সগণ এবং টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের অদম্য বীরদের সাথে যোগ দেন। কিন্তু এতো রক্তপাত, এতো সম্পদ ও শক্তিক্ষয় এবং সাজগোজ—সবই সালাহউদ্দীনের রণনৈপুণ্য ও প্রত্যয়ের নিকট ব্যর্থ হয়ে গেলো। সম্রাট সপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, লিওপোল্ড ও অন্যান্য নরপতি পরাক্রমের পর লজ্জিত হয়ে

দেশে ফিরে গেলেন। তাঁদের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষের দেহাস্থি এশিয়ার বালুকণার সাথে মিশে গেলো কিন্তু মহান নগরী জেরুজালেম সালাহ-উদ্দীনের দখলেই রয়ে গেলো। ঐতিহাসিক লেনপোল বলেন ঃ

"All the strength of Christendom Concentrated in the third Cruesade had not shaken Saladin's Power."

স্টৈভেনশান বলেন ঃ "তৃতীয় ক্রুসেডকে (খৃষ্টানদের জন্য) প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।"

গাজী সালাহউদ্দীন এভাবে রক্তাক্ত ক্রুসেডকে স্তব্ধ করে দিয়ে সমস্ত ক্রুসেডারদের তাঁদের স্ব স্ব দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তিনি ঐ সাথে নিজের বাহিনীকেও তাঁদের স্ব স্ব গৃহে পাঠিয়ে দিলেন এবং সকল ধর্মের লোকদের জন্যে বিতর্কিত জেরুজালেমে আসা-যাওয়ার ছাড়পত্র, অবস্থান-কালে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং সুখ-সুবিধা দেখার জন্যে মনোযোগী হলেন। একরের যুদ্ধ ময়দানে গাজী সালাহউদ্দীনের অসুস্থতার সুযোগে ক্রুসেডাররা মুসলমানদের ওপরে যে নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিলো তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে নিহতদের নিকট আত্মীয়রা উদ্ধত হলে গাজী সালাহউদ্দীন তার প্রতিরোধ করেন। গাজী সালাহউদ্দীনের সদয় শাসন ও প্রহরীবৃন্দের সতর্কতার ফলে কেউ তীর্থযাত্রীদের কোনো ক্ষতি করতে সাহস পায়নি। বরং মুসলমানদের কাছ থেকে খৃষ্টান ও ইহুদী তীর্থ যাত্রীরা অত্যন্ত সদয় ও মনোরম ব্যবহারই পেয়েছিলো। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ একথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন। তাঁদের ভাষায় ঃ

"The pilgrims were treated generously."

সেপ্টেম্বরে সেলেসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াল্টা জেরুজালেমে আগমন করলে গাজী সালাহউদ্দীন তাঁর অতীত দুর্ব্যবহারের সবকিছু ভুলে গিয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং বিদায়কালে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। খৃষ্টের সমাধি—সেবায় ত্রুটি হচ্ছে দেখে তিনি জেরুজালেম, বেথেলহাম ও নাজারাথের দু'জন ল্যাটিন পুরোহিত ও যাজক নিয়োগের সুবন্দোবস্ত করে দেন। খৃষ্টানদের প্রতিটি প্রার্থনা গাজী সালাহউদ্দীন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করতেন। অথচ এর মাত্র ৪ মাস পূর্বেও গ্রীক সম্রাট গোড়া খৃষ্টান (Orthdox Greek) সমাজের পক্ষ হতে পুরোহিত নিয়োগের জন্যে অনুরূপ প্রার্থনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। গাজী সালাহউদ্দীনের উদারতা, মহানুভবতা, রণনৈপুণ্য, সমরকুশলতা,

আত্মপ্রত্যয়, ন্যায়পরায়ণতা, রক্তপাতে পরাঙ্মুখতা, দরদী হৃদয় এবং বীরত্বের কোনো তুলনা হয় না। আর হয় না বলেই তাঁর জীবনের শত্রুরাও তাঁকে আজ অবধিও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে আসছে। এর বড় প্রমাণ তাদের এ মহান শত্রুর জীবনালেখ্য নিয়ে তাঁরা যত লেখালেখি করেছে আমার মনে হয়, এতো লেখালেখি অন্য কোনো রাষ্ট্রনায়ক, জাতীয় নেতা, জেনারেল এবং বীরদের সম্বন্ধে হয়নি। স্টেনলি লেনপোল, গিবন, আর্চার ও কিংসফোর্ড, প্রত্যক্ষদর্শী লেখক টায়ারের আর্চ বিশপ উইলিয়াম ইবেলিনের বেলিয়ানের পার্শ্বচর আর্নল, মেরিন টি, এ. আর্চার, গেলি স্রেঞ্জ, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সি. আর স্যাণ্ডার, স্যার জি. ডব্লিউ, কক্স. বার্ট, স্টেভেনশন ও স্কর্টের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে স্কটের 'টেলিসম্যান বা কবচ গ্রন্থখানা যে একবার পড়ে দেখেনি আমি বলবো তাঁর জ্ঞান একেবারে অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। কেনেথ ও শেরকোহ বা ছদ্মবেশধারী সালাহউদ্দীনের তর্ক-বিতর্ক, কেনেথের ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ও মুসলিম-বিদ্বেষ, শেরকোহের জ্ঞান, যুক্তি, ধৈর্য ও পরমত সহিষ্ণুতা, রিচার্ডের পীড়ার কথা শুনে হেকিমের ছদ্মবেশে গাজী সালাহউদ্দীনের শিবিরে গমন, শত্রু প্রেরিত চিকিৎসকের ঔষধ সেবন না করার জন্যে সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ, রিচার্ডের দৃঢ় ঘোষণাবলী—'সালাহউদ্দীনকে অবিশ্বাস করা পাপ, ("... It wer sin to doubt his good faith)-Tolisman, 107.

· হেকিমের চিকিৎসা রিচার্ড, কেনেথ (স্কটল্যাণ্ডের ছদ্মবেশধারী যুবরাজ —ডেভিড) ও তাঁর আহত কুকুরের রোগমুক্তি, পুরস্কার দানের প্রস্তাবে হেকিমের সদম্ভ উক্তি—'আমি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বিক্রি করি না, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কেনেথের জন্য রিচার্ডের নিকট তাঁর প্রাণভিক্ষা, মরুর হীরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় রাণী ও সভাসদেরা মুসলিম আক্রমণের আশংকা প্রকাশ করলে রিচার্ডের দৃঢ় প্রতিবাদ—"সদাশয় সুলতানের সৎ বিশ্বাসে সন্দেহ করা অকৃতজ্ঞতার চেয়েও গুরুতর অপরাধ" ("It were worse than ingratitude, he said, "To doubt the good faith of the generous Soldan.-"—Talisman, 351) দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাবে সালাহউদ্দীনের উক্ত—'প্রভু মেষপালের প্রতিপালনের ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই প্রহরী নিযুক্ত করেন, মেষপালকের নিজের জন্যে নয়,'—ইত্যাদি এক একটি দৃশ্য বিশ্ববরেণ্য বীর গাজী সালাহউদ্দীনের আদর্শ চরিত্রের এক একটি দিক পাঠকের মনে উজ্জ্বল করে জাগিয়ে তোলে। যারা মুসলমানদের নাম শুনলে হাজার শতেকবার নাক ছিটকায় তাদেরই কলমে এরূপ প্রশংসাগুণগান একটি অকল্পনীয় ব্যাপারই বটে। গাজী সালাহউদ্দীনের অসাধারণ গুণাবলীই এর

কৃতিত্বের দাবী রাখে। তাই তাঁর এ অসাধারণ গুণাবলী শত্রু-মিত্র দেশী-বিদেশী সকলেরই হৃদয় জয় করেছে এবং তাঁর গুণকীর্তনে এরূপ ব্যাপকভাবে লেখনি ধারণ করেন—কি ইতিহাসে, কি জীবন চরিতে, কি উপন্যাসে কি সাহিত্যে—সর্ব উপায়ে তাঁরা সালাহউদ্দীনের জয়গান করেছেন। তাঁর প্রধান শত্রু ইংরেজ, জার্মান ও ফরাসীরাই এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের কেউ কেউ এমন কি সালাহউদ্দীনকে নিজেদের একজন বীরজন রূপে গর্ববোধ করার জন্যে তাঁকে খৃষ্টান প্রমাণ করতেও কম কালি-কলম খরচ করেননি। বস্তুত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আর কোনো নৃপতিই শত্রু মহলে এতো জনপ্রিয় ও প্রশংসা লাভ করতে পারেনি। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "সম্ভবত জগতের আর কোনো রাজার সম্বন্ধেই এতো অধিক ইতিহাস লিখিত হয়নি।"

বিশ্ববরেণ্য বীর গাজী সালাহউদ্দীন শুধু মুসলিম প্রাচ্য বা নিকট প্রাচ্যেরই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশেরও রক্ষাকর্তা ছিলেন। পবিত্র জেরুজালেম শুধু মুসলিম অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়েই বিশ্ব ক্রুসেডার চক্রের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত হতো, পূর্বাপর কোনো ঘটনা থেকেই তা মনে করা যায় না। মহান বীর গাজী সালাহউদ্দীন তিলে তিলে নিজের দেহক্ষয় করে করে তাদের অগ্রাভিযান রোধ না করলে এ অভিযান তরঙ্গ কোথায় গিয়ে পৌঁছত তা কে জানে? বস্তুত রোমান আক্রমণ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ও প্রথম ক্রুসেডের পর কালা আদমী ও তাদের সভ্যতার জন্য এমন গুরুতর বিপদ আর উপস্থিত হয়নি। দুঃখ লাগে যাঁর অনুপম আত্মত্যাগের ফলে এ মহাসংকট থেকে মুসলিম জাতি ও সভ্যতা রক্ষা ও উদ্ধার পায়, আরব ঐতিহাসিকগণ ছাড়া প্রাচ্যের আর কোনো জাতিই তাঁর মহিমা বর্ণনায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেননি। অথচ আজ আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইহুদী চক্রান্তে নিপতিত হয়ে মাকাল ফল সদৃশ পাশ্চাত্যের ঝলমলে সভ্যতায় ডুবে গিয়ে জাতীয় পবিত্র ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন শত্রুকে নিয়েই আজ অধিক নাচানাচি করে চলেছেন। তাদের মস্তিষ্ক আজ বিকৃত। তাই বিকৃত, কলুষিত ও বিকলাঙ্গ ইউরোপীয় চরিত্রই আজ তাঁদের প্রধান প্রতিপাদ্য ও আকর্ষণীয় বিষয়। আমাদের মতো যেসব দেশে ইউরোপীয় বীর পুরুষের জীবন-ইতিহাস লিখার ও পাশ্চাত্য অশালীন ও অরুচিকর উপন্যাসের ভূরি ভূরি অনুবাদ করার মতো লোকের অভাব হয় না, সেই দেশেই আদর্শ মানব ও মহান বীর গাজী সালাহউদ্দীন তেমনিভাবে কারোর মনোপ্রাণ আকর্ষণ করতে পারেননি এটা থেকে গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে?

থাক সে কথা। বিতর্কিত জেরুজালেমকে বাদ দিয়ে যেমন ক্রুসেড কল্পনা করা যায় না, তেমনি এ মহান বীর গাজী সালাহউদ্দীনকে বাদ দিয়েও

ক্রুসেড অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাই বিতর্কিত জেরুজালেম নগরীকে জানতে ও বুঝতে হলে যেমন ক্রুসেডকে জানা প্রয়োজন, তেমনি ক্রুসেড সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে ক্রুসেডের মহান বীর গাজী সালাহউদ্দীন সম্বন্ধে জানতে হবে। মূলত জেরুজালেম ও ক্রুসেড এবং ক্রুসেড ও সালাহউদ্দীনের নাম একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী তথা বিশ্ব ক্রুসেড বিজয়ী গাজী সালাহ উদ্দীন বিশ্ববরেণ্য বীর হলেও মূলত তিনি একজন আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন। আর মানুষ মাত্রই মরণশীল। তাই গাজী সালাহউদ্দীনও মৃত্যুবরণ করলেন (৪ মার্চ ১১৯৩ খৃঃ)। কিন্তু সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যুতেই কি সেই ইউরোপ-ত্রাস মহাবীরের সবশেষ হয়ে গেলো ? তাজমহল যেমন শাহজাহানকে পিরামিড যেমন মিসরের ফেরাউনকে পৃথিবীর বুকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, তেমনিভাবে গাজী সালাহউদ্দীনের যুদ্ধ ময়দানে শত্রুদের প্রতি উদারতা, মহত্ব ও বীরত্বপূর্ণ রণনৈপুণ্য—এ মরজগতে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ দেশ-বিদেশের আপামর জনসাধারণ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ মার্চ তাঁকে হারিয়ে যেরূপ শোক-বিহ্বল ও দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো—বিশ্ব ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই। মূলত প্রজা-প্রীতিতেই সালাহউদ্দীনের ক্ষমতার রহস্য নিহিত। অন্যেরা যা ভয় ও কঠোরতার মাধ্যমে লাভ করার চেষ্টা করতেন, তিনি স্নেহ ও দয়া দেখিয়েই তা সম্পন্ন করতেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে শাহজাদা আজ-জহীরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগকালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন বিধৃত হয়েছে। তিনি পুত্র আজ-জহীরকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

> "রক্তপাতে বিরত থেকো, তাতে বিশ্বাস করো না, ভূ-পতিত রক্ত কখনো নিদ্রা যায় না। তোমার প্রজা, উজীর, আমির ও সম্ভ্রান্ত লোকদের চিত্তজয়ের চেষ্টা করো ; প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধনের প্রতি লক্ষ রেখো। দয়া ও বিনয় দ্বারা লোকের চিত্ত জয় করেই আমি এরূপ শক্তিশালী হয়েছি।"

বস্তুত দয়া, করুণা, ক্ষমা ও যোগ্যতাই ছিলো তাঁর নেতৃত্বের মূল ভিত্তি। তাই শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি দেশে গাজী সালাহউদ্দীন নামটি এতো প্রিয় ও বিখ্যাত।

গাজী সালাহউদ্দীন ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁর দরবারে সাধারণ মানুষের অবাধ গমনাগমন ছিলো। যে কেউ গিয়ে সরাসরি ফরিয়াদ জানাতে পারতো। লেনপুল বলেন ঃ

"No sovereign was ever more genial or easy of approach."

তাঁর ইতিহাস পাঠে জানা যায়, একদিন তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ফিরে কেবলই এলেন এমন সময় একজন বৃদ্ধ মামলুক (দাস) একখানা দরখাস্ত নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলো। এতে সালাহউদ্দীন বিন্দুমাত্রও বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং তৎক্ষণাত কালি-কলম এনে সই করে দিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি কোনো বাচালতা পসন্দ করতেন না এবং স্বীয় আচার-আচরণে অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। অত্যধিক উত্তেজনার মুহূর্তেও তিনি নিজের জিহ্বা ও কলম সংযত রাখতেন। তিনি কখনও কারো প্রসঙ্গে একটু কটু কথা লিখেছেন বলে জানা যায়নি।

গাজী সালাহউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত সরল, শ্রমশীল ও ঘোর আত্মসংযমী। তিনি কখনো স্বীয় রাজপ্রাসাদে শয়ন করেননি ; বরং অতি সাধারণভাবে উজীরের বাসায় থাকতেন। তিনি বিজয়ী হয়ে অনেক রাজার প্রচুর ধনভাণ্ডার হস্তগত করেছেন, কিন্তু এর একটি কপর্দকও নিজে গ্রহণ করেননি। বরং সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। মরণকালেও তাই তাঁর ঘরে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই তাঁকে রাজর্ষী বলা হয়।

গাজী সালাহউদ্দীন অত্যন্ত জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। শিক্ষাই যে জাতির মেরুদণ্ড এটা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকাকালেও শিক্ষা বিস্তারের দিকে বিশেষ নজর দেন। সিরিয়া, মিসর, জেরুজালেম ও অন্যান্য আয়ত্তাধীন আরবের মাটিতে তিনি অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র, মসজিদ পাঠাগার ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে কায়রোতে তরবারি নির্মাতাদের দোকানের ন্যায় প্রচুর কওমী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা স্থাপিত হয়েছিল। একমাত্র দামেশকেই এরূপ ২০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া তিনি প্রজা সাধারণের সুচিকিৎসারও ব্যবস্থা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অসংখ্য হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রচুর আউলিয়া-দরবেশদের সমাবেশ ঘটান। এদের থাকা-খাওয়ার জন্যে উত্তম ব্যবস্থাও নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজামুল মুলকের পর তাঁর নামই সর্বাপেক্ষা খ্যাত।

গাজী সালাহউদ্দীন এক কথায়, ব্যক্তিগত, আন্তর্জাতিক জীবনেও ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও আদর্শ বাস্তবায়নে আজীবন নিরলস পরিশ্রম করে গিয়েছেন এবং ইসলামী সমাজ ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শুধু জেরুজালেমেই নয়, গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যেই সফলতা ফিরে আসে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জেরুজালেম শক্তি প্রয়োগে জয় করার সময় এর প্রাচীরের স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হয়। সালাহউদ্দীন শ্রমিকদের সাথে নিজে এর সংস্কার করেন। ভবিষ্যতে শত্রুরা যাতে এর ক্ষতিসাধন সহজেই করতে না পারে তার জন্য চারদিক ঘুরিয়ে গভীর পরিখা খনন করেন। পশ্চিম পাহাড় ছিলো প্রাচীরের বাইরে। তিনি প্রাচীর বর্ধিত করে তার একাংশ নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন ; তাছাড়া পশ্চিম দিকের স্তম্ভদ্বার ও মিহরাব দ্বারের মধ্যবর্তী বুরুজগুলোও তিনি পুনঃ নির্মাণ করেন।

খৃস্টানেরা আল আকসা মসজিদকে গির্জায় পরিণত করে রেখেছিলো। তজ্জন্য এর অনেক পরিবর্তন সাধন করতে হয়। গাজী সালাহউদ্দীন কঠোর পরিশ্রমে এগুলো সংস্কার করেন ; মসজিদের দক্ষিণাংশকে টেম্পলার নাইটেরা অস্ত্রাগারে পরিণত করেছিলো। সালাহউদ্দীন এটাকে 'জাভিয়া খাতানিয়ায়' পরিবর্তিত করেন। সুলতান নূরুদ্দীন আল আকসার জন্য একখানা অতি সুন্দর ও সুসম্পন্ন মিম্বর নির্মাণ করিয়ে দেন। সালাহউদ্দীন তা আলেপ্পো থেকে আনিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করেন। সেন্ট জনের নাইটদের পরিত্যক্ত বিরাট বাসভবনকে তিনি উমর মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন এবং এর ভিতরের গির্জাটিকে 'রেমরিস্তানে' পরিণত করেন। সেন্ট জনের গির্জাস্থ সন্যাসিনীদের মঠ মাদরাসা 'খানাইহিয়্যায়' পরিণত হয়। এর জন্য তিনি বহু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেন। ক্রুসেডারদের দ্বারা জেরুজালেম জয়ের পূর্বেই গির্জাটি বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পেটিয়ার্কের বাড়ীকে তিনি খানকায় পরিণত করেন। এভাবে ক্রুসেড বিজয়ী গাজী সালাহউদ্দীনের দ্বারা পবিত্র নগরী জেরুজালেম বিজিত হলে এবং দীর্ঘকাল আরব শাসনাধীনে থাকার ফলে এখানে আরবীয় ইসলামী মূল্যবোধ পরিচালিত একটি সমাজের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে এখানে আরবীয় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিভিন্ন স্থানের আরব (মুসলমান ও খৃস্টান) এখানে বসতি স্থাপন করে। ঐতিহাসিকদের মতে, বাস্তবে সংখ্যাধিক্য হেতু আরবগণ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার আলোকে দেশটির ওপর তাদের অধিকার দাবী করতে পারে।

২.৪ প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের প্রকৃত দাবিদার কানানীয়রা—ইহুদীরা নয়

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণযোগ্যভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্যালেস্টাইনী আরবরা সুদীর্ঘ তেরো শতাব্দী ধরে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে এবং ১৯৬৭ সালের ৭ জুন পর্যন্ত তা তাদেরই দখলে ছিল। বৃটিশ আইনজীবীদের একটি কমিশন বিলাপের প্রাচীরকে মুসলমানদেরই সম্পত্তি বলে মনে করেন। কারণ উক্ত দেয়াল ছিল হারাম শরীফের অংশ।

১৯৩০ সালে এ মতকে লীগ অব নেশন্স-এর বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে বাহ্যিক ন্যায়নীতির দিক থেকে যতই বলা হোক না কেন জেরুজালেম নগরী আরব মুসলমানদেরই সম্পত্তি, তবুও আমরা বলবো, এটা আরব-মুসলমানদের পৈত্রিক সম্পত্তি নয় ; যেমন এটা থাকতে পারে না ইসরাঈলদেরও। কারণ কার্লমার্ক্সের ভাষায়, "প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা নয় ; বরং বিভিন্ন দূর দেশের বাসিন্দা।" তাই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায়, প্যালেস্টাইনের ওপর আজকের ইহুদীদের কোনোই অধিকার বা দাবী নেই, এমন কি ঐতিহাসিক দাবীও না। এর প্রকৃত দাবীদার কানানীয়রা (প্যালেস্টাইনীরা), যারা আদিকাল থেকে বংশ পরম্পরায় এখানে বসবাস করে আসছে।

২.৫ প্যালেস্টাইনের ওপর জায়নবাদীদের দাবীর অসারতা

যদিও Old Testament-এ বর্ণিত বিশ্ব-প্রভু আল্লাহর সাথে ইসরাঈলদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম আ.-এর চুক্তি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনের কলিজা স্বরূপ এ জেরুজালেমকে দেয়া হয়েছিলো, তবুও জায়নবাদী ইসরাঈলরা এ মহান নগরীর ওপর কোনোক্রমেই দাবী করতে পারে না, যেমন পারে না ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী আরব মুসলমানরাও। কেননা হযরত ইবরাহীম আ. ও তাঁর উত্তরসূরী হযরত দাউদ (ডেভিড) ও সুলাইমান (সলোমন)সহ অন্যান্য ইসরাঈল বংশীয় নবী ও রাষ্ট্র প্রধানদের এ মহান নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এজন্যই যে, এটাকে কেন্দ্র করে তাঁরা বিশ্বের কোনো কোনো শান্তি-বিধি ইসলামের মহান বাণী—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—পৌছে দিবে এবং অজ্ঞানতাবশতঃ স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত করবে। আর মহান স্রষ্টা প্রদত্ত সংবিধান অনুযায়ী ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক এবং আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনা করবে। আর তা করলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে পরিবারের, পরিবারের সাথে পরিবারের, পরিবারের সাথে সমাজের, সমাজের সাথে সমাজের, সমাজের সাথে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের, সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির এবং সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার কোনোই সংঘাত বাধবে না যেমন বাধছে না সূর্যের সাথে পৃথিবীর, পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের, মঙ্গলের সাথে শুক্রের এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের। ফলে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ ও জ্বীন ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টি রাজ্যে এক অনাবিল শান্তি বিরাজ করে আসছে। আঠারো হাজার সৃষ্টির মধ্যে মানুষও একটি সৃষ্টি—সবচেয়ে বড় একটি সৃষ্টি। এ মানুষ যতদিন তাঁর স্রষ্টার দেয় ঐশী সংবিধান অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিচালিত করলো ততদিন সেখানে এক প্রশান্তিময় অবস্থা বিরাজ করলো—সুখ-শান্তি-ঐশ্বর্য

ও প্রতিপত্তির চরম শিখরে আরোহণ করলো তারা। আর যখনই আল্লাহর বিধানকে পায়ে মাড়িয়ে সেখানে ব্যক্তি শাসনের প্রাধান্য দিলো, তখনই নরক-দুঃখ তাদের ওপর বর্ষিত হলো। সুখ গেলো, শান্তি গেল, গেল সম্মান-প্রতিপত্তি ও রাজ্য। তারপর তাদের ওপর অন্য আর এক অধিকতর অত্যাচারী জাতি চড়াও হলো। রাজ্য আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদেরকে দারুণভাবে নির্যাতন করলো—দাসত্বের শৃংখলে বেঁধে স্ব স্ব দেশে নিয়ে গেল তাদের। বনী ইসরাঈল ও মুসলমানদের উত্থান-পতনের ইতিহাস এরই বাস্তব প্রমাণ।

বক্তব্যটাকে বিশ্বের সুধী সমাজের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য একটি উদাহরণের আশ্রয় নিচ্ছি। যখন কোনো জাতির জনক পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তখন ঐ মহান নেতার যে বা যে সকল সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে রেখে যান ; তার বা তাদের প্রতি জাতির একটা সাধারণ করুণা বা দয়া সর্বক্ষণই থাকে। অনুরূপভাবে যে ঐশী মহান নেতা বিশ্বনিয়ন্ত্রার পক্ষ থেকে তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য এলেন এবং শত বাধা-বিপদের উত্তাল তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করে অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করে গেলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি মহান স্রষ্টার একটা স্বাভাবিক করুণা স্বভাবতই ছিলো। উপরন্তু স্রষ্টার নিকট থেকে প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম আ. আল্লাহর রহমত তাঁর সন্তানদের জন্য বিশেষভাবে চেয়ে নিয়েছিলেন। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মহান স্রষ্টার বিশেষ করুণা তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য বর্ষিত হতে থাকে। ফলে বনী ইসরাঈলদের মস্তিষ্কের প্রখরতা যেমন বেড়ে যায় দৈহিক গঠনের দিক দিয়েও বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করে। আর এজন্যই বার বার তারা আল্লাহদ্রোহীর চূড়ান্ত সীমায় পৌছলেও করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে সহসা পরিত্যাগ করেননি ; বরং পাপ-পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বারংবার তাদের ভিতর ঐশী পরিচালক নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। বনী ইসরাঈলদের প্রতি স্রষ্টার এ বিধান চলতে থাকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত।

২.৬ ইহুদী কর্তৃক নবী হত্যা

কিন্তু সত্য প্রচারের জন্য যখন তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো তখন বিশ্বপ্রভু আল্লাহর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। কারণ এরূপ জঘন্য পাপ তাদের এই তো প্রথম নয়—এর পূর্বেও বহুবারই তারা করেছে। এর প্রমাণ তাদেরই গ্রন্থ বাইবেল থেকে কয়েকটি তুলে ধরা হলো ঃ

১. হযরত সুলাইমান আ.-এর পর বনী ইসরাঈলদের রাজত্ব যখন জেরুজালেমের 'ইয়াহুদী রাজ্য' এবং 'সামেরীয় ইসরাঈলী রাজ্যে' বিভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো। পরিণতি এতদূর গড়ায় যে, ইয়াহুদী রাজ্য সামেরীয় ইসরাঈলী রাজ্যকে শায়েস্তা করার
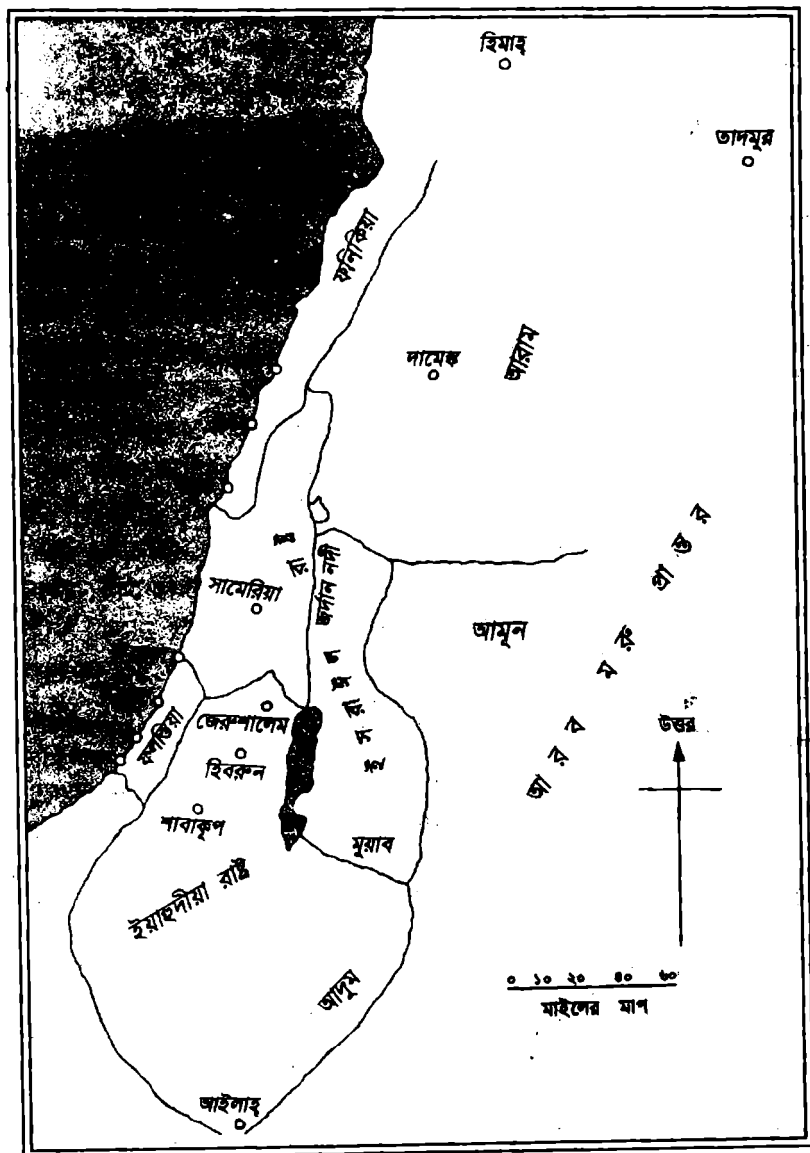
মানচিত্র ২ ঃ বনী ইসরাঈলদের দুটি খণ্ডিত রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাঈল (খৃস্টপূর্ব ৮৬০)

জন্য দামেস্কের 'আরামী' রাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। এজন্য আল্লাহর নির্দেশে হানানী নবী ইয়াহুদী রাজ্যের শাসনকর্তা 'আসা'কে এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। কিন্তু 'আসা' তাঁর ঐ সতর্কবাণী শুনানোর জন্য আল্লাহর পয়গম্বর হানানী আ.-কে কারাগারে নিক্ষেপ করে। (২, বংশাবলী ; ১৭শ অধ্যায় ; ৭-১০ আয়াত)

২. হযরত ইলিয়াস (Elliah) যখন 'বায়াল'-এর পূজা করার জন্যে ইহুদীদেরকে একটু বকা দিলেন এবং আবার তাওহীদের বাণী প্রচারে মনোযোগ দিলেন, তখন সামেরীয়া ইসরাঈলী বাদশাহ—'আখিয়াব' নিজের মুশরেক স্ত্রীর খাতিরে হযরত ইলিয়াসকে হত্যা করার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগে যায়। ফলে তিনি সিনাই উপদ্বীপের পর্বতের মধ্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ঐ সময় হযরত ইলিয়াস আ. আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করেন তাতে তিনি বলেন, "ইস্রায়েল সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিয়াছে, আর আমি কেবল একা আমি অবশিষ্ট রইলাম আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। (১ রাজাবলী ; ১৯শ অধ্যায় ১০ আয়াত)

৩. 'মিকা-ইয়াহ' আ. নামক আর একজন নবীকে এ 'আখিয়াবই' সত্য কথা বলার অপরাধে বন্দী করে এবং তাঁকে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার নির্দেশ দেয়। (১ রাজাবলী ; অধ্যায় ২২ ; আয়াত ২৬-২৭)

৪. ইয়াহুদী রাজ্যে যখন প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা ও ব্যভিচার শুরু হয়েছিলো এবং হযরত জাকারিয়া আ.-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তখন 'ইউওয়াস' নামক ইহুদী বাদশাহর নির্দেশে মূল "হায়কালে সুলাইমানীতে" 'মাকদাস' ও কোরবানগাহ-এর মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করে। (২ বংশাবলী ; অধ্যায় ২৪ ; আয়াত ২১)

৫. এরপর সামেরীয়ার ইসরাঈলী রাজ্য যখন আসুরীয়দের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং জেরুজালেমের ইহুদী রাজ্যের ওপর কঠিন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে তখন "ইয়ারমিয়াহ" নবী স্বীয় জাতির এ পতনোন্মুখ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং প্রতিটি অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ জাগো সাবধান হও! তা না হলে তোমাদের অবস্থা সামেরীয়দের থেকেও অত্যন্ত শোচনীয় হবে। কিন্তু জাতীর নিকট থেকে এ সাবধান বাণীর কি উত্তর পাওয়া গিয়েছিলো ? তাঁর ওপর চারদিক থেকে অত্যাচার ও যুলুমের শিলাবর্ষণ হয়েছিল। তাঁকে কঠিনভাবে মারধোর করা হয়েছিল, দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে কাঁদা ভর্তি কুয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে করে তিনি ক্ষুধা-পিপাসার

যন্ত্রণায় ছটফট করে শুকিয়ে মারা যান। এরপরও তাঁকে দেশদ্রোহী ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে ষড়যন্ত্রকারী বলে অভিযুক্ত করা হয়। (যিরমিয় ; অধ্যায় ১৫, আয়াত ১০ ; অধ্যায় ১০, আয়াত ২০-২৩ ; অধ্যায় ২০ , আয়াত ১-১৮ ; অধ্যায় ৩৬ - ৪০)

৬. হযরত 'আমুস' আ. নামক অপর এক নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন তিনি সামেরীয়ার ইসরাঈলী রাজ্যের ভ্রান্ত কার্যাবলী ও ব্যভিচারের প্রতিবাদ করেন এবং এ সকল কাজের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ওদের সতর্ক করেন, তখন তাঁকে দেশ থেকে বের হয়ে যেতে বলা হয়। (আমোঘ, অধ্যায় ৭ ; আয়াত ১০-১৩)

৭. হযরত ইয়াহইয়া ইউহাসা আ. যখন ইয়াহুদীদের বাদশাহ "হীরোদেস" -এর দরবারে প্রকাশ্যে যেসব অসচ্চরিতা এবং ব্যভিচার হতো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন, তখন তাঁকে সর্বপ্রথম বন্দী করে, তারপর বাদশাহ তাঁ প্রেমিকার নির্দেশে জাতির এ আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তির মাথা কেটে একখানা থালায় করে প্রেমিকাকে উপহার দেয়। (মার্ক, অধ্যায় ৬ ; আয়াত ১৭-১৯)

৮. সবশেষে হযরত ঈসা আ. যিনি পাশ্চাত্য জগতে যিশুখৃষ্ট বলেই অধিক পরিচিত, তাঁর প্রতি ইহুদীদের আলেম সমাজ ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। কেননা তিনি তাদের অন্যায়, অবিচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। এবং ঈমান এনে সঠিক পথ অনুসরণ করে উত্তম নীতি অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দেন। তাই তাকে কৌশলে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এবং রোমীয়া আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। এমন কি রোমীয় শাসক 'পীলাতীস' যখন ইয়াহুদীদের নিকট জিজ্ঞেস করে আজ ঈদের দিনে তোমাদের খাতিরে ঈসা ও বরবা ডাকাত—এ দু'জনের মধ্যে কাকে মুক্তিদান করবো ? তখন সমস্ত সভাস্থল এ কথায় মুখরিত হয়ে উঠেছিলো যে, ডাকাতকে ছেড়ে দেন এবং ঈসাকে ফাঁসী দেন। (মথী, অধ্যায় ২৭, আয়াত ২০-২৫)। তারপর ইহুদীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করে।

২.৭ ইসরাঈলদের ওপর খোদায়ী আযাব

যদিও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর ঐশী ক্ষমতা বলে হযরত ঈসা আ.-কে সশরীরে উঠিয়ে নেন ; তবুও ইসরাঈলরা যিশুখৃষ্টের আকৃতির ন্যায় অপর একটি লোককে ক্রুশে চড়িয়ে হত্যা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। শুধু

তা-ই নয়, ঈসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত ঐশীগ্রন্থ পবিত্র 'ইঞ্জিল'কেও তারা স্বীয় স্বার্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও কর্তন করে পবিত্র গ্রন্থকে দারুণভাবে অমর্যাদা করে। ফলে করুণাময় আল্লাহর ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। তিনি এরপর থেকে বনী ইসরাঈলদের সাথে সকল সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করেন। সাথে সাথে তাদের মাঝে নবী আসার পথও চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু এখন থেকে বনী ইসরাঈলদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হতে থাকে। তাদের এ অপরাধ প্রবণতার জন্য শ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ্ এদেরকে এমন শাস্তি দেন যে, বিভিন্ন জাতি এদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে তছনছ করে দেয়। আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃস্টপূর্ব ৭১৪ সালে ইসরাঈল রাজ্য আক্রমণ করে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করে এবং আরো কয়েক হাজার ইহুদীকে বেঁধে দাস হিসেবে নিজের দেশে নিয়ে যায়। আবার খৃস্টপূর্ব ৫৬১ অব্দে ব্যাবিলনের শাসক বখ্‌তনছর জেরুজালেম আক্রমণ করে শহরটিকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় এবং সত্তর হাজার ইহুদীকে বন্দী করে নিজ দেশে নিয়ে যায়। ৭০ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট তিতাস ইহুদীয়া রাজ্য আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার ইহুদীকে তরবারীর আঘাতে পরলোকে চালান দেয়।* ১১৩২ খৃস্টাব্দে রোমকরা আবার জেরুজালেম আক্রমণ করে এবং সেখান থেকে ইহুদীদেরকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়।

এরপর অভিশপ্ত এ ইহুদী জাতির অবস্থা এমন হয় যেমন হয়ে থাকে চৈত্র মাসে শিমূল গাছের ফুটন্ত তুলার অবস্থা। এভাবে পরপর বিদেশীদের আক্রমণ ও রোমক শাসকদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে ইহুদী জাতি একান্ত বাঁচার তাগিদেই জান-প্রাণ নিয়ে যে যেদিক পারে পালিয়ে যায়। এভাবে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহর দুনিয়ায় নিজেদের আবাসভূমি বলতে এদের কোনো জাগাই থাকলো না। অন্যদিকে তারা যেখানেই গেলো সেখানেই দারুণভাবে ঘৃণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করলো কারণ এরা সবখানেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের স্বার্থ লিপ্সায় স্থানীয় জনগণের বিপুল ক্ষতি সাধন করে।

ইহুদীদের অর্থলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। অর্থোপার্জনে এদের ন্যায়-অন্যায় বোধের বালাই নেই। সুদী কারবারে তো এরা দুনিয়া জোড়া দুর্নামের ভাগী হয়েছে। রকমারী ছলাকলায় অপরের সম্পদ নিজ হস্তগত করার ব্যাপারে এরা সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এদের রক্তের সাথে মিশে থাকার দরুন পৃথিবীর কোনো দেশেই এরা সমাদৃত হয়নি। বরং বিভিন্ন সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবেই বিতাড়িত হতে হয়েছে।

এমনিভাবে ইহুদীরা ১২৯০ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে, ১৩০৬ ও ১৩৯৪ সালে ফ্রান্স থেকে, ১৩৭০ সালে বেলজিয়াম থেকে, ১৩৮০ সালে চেকোশ্লাভেকিয়া থেকে, ১৪৪৪ সালে হল্যাণ্ড থেকে, ১৫৪০ সালে ইতালী থেকে, ১৫১০ সালে রাশিয়া থেকে এবং পরিশেষে তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক নিধন ও জার্মান থেকে বিতাড়িত হয়। ফলে অভিশপ্ত এ সমস্ত দিশেহারা ইহুদীর দল দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারা কোথাও গিয়ে সেখানকার জনসাধারণের সাথে মিলেমিশে বাস করতে পারেনি বা তাদের সাথে মিশে যায়নি। এ না যাবার কারণ তাদের পণ্ডিতগণের দাম্ভিকতা, শয়তানি ও মানসিক বিকৃতি। অভিশপ্ত এ ইহুদী জাতির মানসিক অবনতির সাথে তাদের ধর্মগ্রন্থকে সামঞ্জস্যশীল করার জন্য নিজেদের আদর্শ মাফিক ধর্ম-বিধান রচনা করে "তালমুদে" লিখে নেয়।

২.৮ গইমদের (অইহুদী) সম্পর্কে 'তালমুদের' উপদেশাবলী

১. অন-ইহুদী, মানুষের ধন-সম্পদের কোনোই মালিকানা নেই। ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ইহুদী জাতি। অন-ইহুদীদের অর্জিত ধন-সম্পদ ন্যায়তই ইহুদীগণ দখল করে নিতে পারে।

২. অন-ইহুদী মানুষ ও তাদের ধন-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্যই বিশ্ব প্রভু ইহুদী জাতিকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছেন।

৩. মানুষ যেমন সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি ইহুদী জাতিও মাটির পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহুদী ছাড়া সকল মানুষের মধ্যেই প্রশুত্ব ও পাপ-প্রবৃত্তি রয়েছে।

৪. বিশ্ব প্রভু অন-ইহুদীদের নিকট থেকে সুদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিনা সুদে অন-ইহুদীদের ধার দিতে নিষেধ করেছেন।

ধর্ম গ্রন্থই যখন মানুষকে ঘৃণা করতে, শোষণ করতে এবং অপরের সম্পদ জবর-দখল করতে উৎসাহ দিয়েছে—তখন এদের স্বভাব চরিত্র কোন্ ধরনের হবে তা সহজেই অনুমেয়।

২.৯ তালমুদের শিক্ষার প্রতিক্রিয়া

অতএব তারা যে দেশেই গেলো সেখানেই তাদের এ ধর্মীয় নীতিমালা প্রয়োগ করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন বিষিয়ে তোলে। ফলে জনসধারণের মনে ইহুদীদের অতীত-বর্তমানের যাবতীয় কু-কীর্তি তাদের

হৃদয় পটে ভেসে ওঠে। এতে বিশেষ করে খৃস্টানরা দারুণভাবে ক্ষেপে ওঠে এবং অতীতের সেই যিশু হত্যার নির্মম ইতিহাস তাদের মনে পড়ে যায়। ফলে সবকিছু মিলিয়ে তাদের মনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে এমন আক্রোশের সৃষ্টি হয় যে, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ইহুদীদের মহল্লার পর মহল্লা আক্রমণ করে যিশু হত্যার প্রতিশোধ নিতে থাকে এবং এ প্রতিশোধের নেশা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, বিশ্ব ইহুদী মহলের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। ফলে তারা খৃস্টানদের হাত থেকে ভাগ্যহত ইহুদী জাতিকে রক্ষার জন্য একটা পথ অনুসন্ধান করতে থাকে। তবে তাদের এ পথ আবিষ্কার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।

২.১০ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং সুযোগ সন্ধানী ইহুদী নেতৃবৃন্দ

মধ্যযুগের রাজারা "Divine Right of the King"-এর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান—এ মতবাদ প্রচলিত থাকায় রাজা-বাদশাহদের কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার থেকে জনগণ বঞ্চিত ছিলো। রাজারা ধর্মের দোহাই দিয়ে এ মতবাদ জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। সরলপ্রাণ আল্লাহভীরু জনতা তা বিনা প্রতিবাদে মেনে চলতো। আর রাজারা এ সুযোগে খোদার বিশ্বে খোদা প্রদত্ত ঐশী আইন প্রয়োগ না করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিধ্বংসী খেলায় মেতে ওঠে। ফলে সাধারণ জনগণের জীবনও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। রাজাদের স্বৈরাচারী শাসনের যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে সমাজের আবালবৃদ্ধ বণিতার নাভিশ্বাস ওঠে। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ও ব্যভিচারে সমাজে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এভাবে সমাজের কর্ণধাররা ধর্মের নামে অধর্মের চরম সীমায় পৌঁছলেও কারোর 'টু' শব্দটি করার অধিকার বা সাহস ছিলো না। সমাজের একটা শ্রেণীই রাজাদের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অধিকার রাখতো ; কিন্তু রাজারা পূর্বাহ্নেই তাদেরকে বগলদাবা করে রাখে। এরা হলো সমাজের 'যাজক' শ্রেণী। রাজারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সরলপ্রাণ জনগণের ওপর যেভাবে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছিলো তাতে ঐ সমস্ত যাজক শ্রেণী যাতে প্রতিবাদ মুখর না হয় বা Divine Right of the King-এর মূল তত্ত্বটি সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ না করে—এজন্য আগেই রাজারা তাদের জনগণের নিকট থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের ওপর ভাগ ও অন্যান্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। আবার রাজার ছেলে রাজা হবার

* এ যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন বৃটিশ ভারতের কংগ্রেস নেতা মৌলনা আবুল কালাম আজাদ। দেখুন "যে সত্যের মৃত্যু নাই" গ্রন্থের ৩২৩-'৩২ পৃঃ)

আইনটা রাজারা নিজেরাই পাশ করে নেয়ায় রাজবংশের অনেক অপদার্থ রাজপুত্রও সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে যখন তারা বুঝলো রাজ কার্যের জটিলতম সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করা তাদের একার পক্ষে সম্ভব নয় তখন তারা সমাজ থেকে এক শ্রেণীর লোককে হাত করে। ইতিহাসে এরা 'অভিজাত' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এভাবে সমাজের তিন-পাণ্ডা মিলিত হয়ে শোষণ করতে করতে এমন পর্যায়ে এসে পৌছায় যখন স্বাভাবিকভাবে দেশের জনগণের ভিতর বিদ্রোহের বীজ বপন হয়, এবং সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু কিছু লোক জনগণের এ বিদ্রোহী মনোভাব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এরা হলেন সমাজের অধঃপতিত, অবহেলিত দার্শনিক শ্রেণী। তাঁদেরই সুতীক্ষ্ণ লেখনীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবসমাজ তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে। ইতিমধ্যে ঐ ত্রিপাণ্ডবের দল ধর্মকে আশ্রয় করে অধর্মের শীর্ষে উঠে গিয়ে এমনভাবে অনৈতিকতা, ব্যভিচার, যুলুমবাজী এবং শোষণের চরম সীমায় গিয়ে পৌছায় যে, ঐ সমস্ত সচেতন যুব সমাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না—প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন তারা। জীবনকে বাজী রেখে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এসব মুক্তিপাগল যুবসমাজ। কিন্তু এ সমস্ত সত্য সৈনিককে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরবিদায় দিবার জন্য ঐ ত্রিপাণ্ডবের দল গোপন পরামর্শে মিলিত হলো এবং সিদ্ধান্ত নেয়া সরলপ্রাণ আল্লাহভীরু জনগণকেই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। দেশের এ সমস্ত সরল প্রাণ জনগোষ্ঠীকে ধোঁকায় ফেলবার জন্য রাজার হাতের মারণাস্ত্র ঐ যাজক শ্রেণী ফতওয়া জারী করলো যে ঃ রাজার বিরুদ্ধে যারা অস্ত্রধারণ করেছে এরা আল্লাহদ্রোহী ও অধার্মিক। অতএব এ সমস্ত বিদ্রোহী অধার্মিককে হত্যা করা ধর্মেরই নির্দেশ ও পুণ্যের কাজ। এভাবে ত্রিপাণ্ডবের দল দেশের জনগণকে একটা ধাঁধার ভিতর ফেলে দিয়ে ঐ সমস্ত মুক্তিপাগল হাজার হাজার সত্য সৈনিককে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে জনগণের মুক্তি প্রচেষ্টা এখানেই প্রথমবারের মত থেমে যায়।

ঐ অত্যাচারীর দল এরপর নিরিবিলি স্থানে সুরার পেয়ালার আসর জমিয়ে সংঘটিত বিদ্রোহটির একটা পরিসংখ্যান নিলো। তাতে তাঁরা দেখলো, সমাজের শিক্ষিত লোকেরাই তাদের সাধের গড়া সুখের রাজপ্রসাদে আঘাত হেনেছে। অতএব শিক্ষিতরাই তাদের শত্রু। তাই শিক্ষার বিস্তার রোধে ত্রিপাণ্ডব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। আর এতে যালেম সরকারের পক্ষে যারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করলো তারা হলো ঐ যাজক সমাজ। সে যুগে এ যাজকদের অত্যাচারে সমস্ত ইউরোপ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারা জ্ঞানকে কোনোক্রমেই এগিয়ে যেতে দেয়নি—তাদের গির্জায়

প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো মত কেউ প্রকাশ করলেই রাজার সাহায্যে তাঁকে বন্দী করে অকথ্য অত্যাচার করে হত্যা করা হতো। লণ্ডনের 'ম্যাডামটাস্‌উডের' নিচের এলাকায় একটি ভয়াবহ ঘর আছে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের যেতে দেয়া হয় না। কারণ ধর্মের নামে রেনেসাঁস—পূর্বের ইউরোপে কিভাবে অধার্মিকদের শাস্তি হতো, তার অনেকগুলো বাস্তব দৃশ্য দেখানো হয়েছে সেই ঘরে। সে দৃশ্যগুলো দেখে ছোট ছোট শিশুরা ভুলতে পারতো না—অনেক সময় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠতো। কোনো কোনো সময় নাকি এটা স্থায়ী রোগে পরিণত হতো। তাই শিশুদের সে ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিলো।

এমনি অত্যাচারের দিনে কেউ যাজকদের ফতোয়া ও প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথা বললেই তাকে শাস্তি পেতে হতো। কিন্তু প্রশ্ন করার অধিকার না থাকলে সত্য উদঘাটিত হবে কি করে ? জ্ঞানের অগ্রাভিযান যে থেমে যাবে! আর যাজক সম্প্রদায়ের এ অত্যাচারের জন্যই রেনেসাঁস—পূর্ব ইউরোপে অন্ধকার যুগ চলেছে—মুখ থুবড়ে পড়েছে জ্ঞানের অগ্রগতি।

২.১১ ইসরাঈলীদের উত্থানে মুসলিম জ্ঞানের অবদান

যে আফ্রিকাকে আজকাল বলা হয়ে থাকে "Dark Continent"-সেই আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল থেকেই প্রথম আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে যায়, খৃস্টের জন্ম যে আরব উপদ্বীপে, সেই উপদ্বীপ সংলগ্ন মুসলমানরা। ইউরোপে যখন একটিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিউনিসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো "জামে জৈতুম"। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেনের মুসলিম যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ঐ সময় রোমের একজন পোপও এসেছিলেন মুসলিম স্পেনে বিদ্যা শিক্ষা করতে। ইতালীরই সেই অগাস্টাইন, এবেলার্ড, টমাস একুইনাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসে জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরে তারা মুসলিম পণ্ডিতদের লিখিত গ্রন্থাদি আরবী ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় তরজমা করে ইতালী তথা ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভে সহায়তা করেন। বলোগনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন পড়ানো হতো—ইবনে রুশদ বা এভেরোস্‌ আল-হাসান (হাজেন), আবু আলী সিনা (এভেসিন্না), ইবনে জোহ্‌র (এভেন জোয়ার), জায়ী, আল রাজি, তাবারী, হুসায়েন বিন ইসহাক, ইবনে খালদুন প্রভৃতি। প্যারিসে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রচলিত ছিলো ইবনে সীনার 'শায়েদা'।

হেলেনিক ও হিদেনিক যা কিছু পিষে মারবার জন্য ইউরোপে বারশো খৃস্টাব্দের আগে এরিস্টটলের কোনো গ্রন্থই ছিলো না। এরিস্টটলের গ্রন্থ ইউরোপে প্রথম আবিষ্কার করে মুসলিম-কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর কনস্ট্যান্টাইনের সংগ্রহ থেকে। এ এরিষ্টটলেরই সমালোচনা লিখেছিলেন ইবনে রুশদ বা এভেরোসা। আফলাতুন বা প্লেটো এবং সোকরাও বা সক্রেটিসেরও দর্শন মধ্যযুগের ইউরোপে থাকতে পারেনি—সেগুলো সযত্নে রক্ষিত হচ্ছিলো মুসলিম জগতে। শুধু যে রক্ষিত হচ্ছিলো তা-ই নয়—অনেক নতুন সংগ্রহও এর সাথে সংযুক্ত হয়েছিলো। আল কিন্দি, আল বেরুনী, আল জাবের, আল ইদরিসি, জারি, আল হাজেন, জোহর, ইবনে সীনা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গবেষণা করে রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা ও গণিতে যে নতুন জ্ঞান দান করেন, তা-ই রেনেসাঁসকাল থেকে আধুনিক ইউরোপকে যাত্রা পথে তুলে দেয়।

এরপর ইউরোপে "The Age of Reason"-এর যুগ শুরু হয়। কারণ মুসলিম পণ্ডিতদের উদার নৈতিক চিন্তাভাবনা ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে দ্রুত সংক্রমিত হয়। তারা এরপর থেকে প্রত্যেকটি বিষয়ই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাঁচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতে থাকে। ফলে শাসক ও যাজকদের ধর্মের নামে ভাওতাবাজী এদের চোখে ধরা পড়ে যায় এবং তা থেকে দেশের জনগণও সচেতন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই বিশ্ব ধর্মরাজ্যের শাহানশাহ রোমান পোপ "ইনডালজেন্স" নামক তথাকথিত বেহেশত প্রবেশের ছাড়পত্ররূপ প্রত্যারণা পত্র বিক্রি করে সরলপ্রাণ জনগণের অর্থ লুণ্ঠন করতে থাকে। তিনি এ 'ইনডালজেন্স' বিক্রির জন্য অসংখ্য এজেন্ট বিশ্বের দিকে দিকে পাঠিয়ে দেন। এদের একদল জার্মানীতে পৌছলে পোপের কপালে আগুন লাগে। কারণ এ দল জার্মানীতে পৌছে ফলাও করে যখন উক্ত ইনডালজেন্সের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলো তখন তা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের প্রফেসর মার্টিন লুথারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে পোপ নিযুক্ত এজেন্টদের নিকট থেকে বিস্তারিত জেনে এত ক্ষুব্ধ হন যে, পোপের প্রতি তার এতদিনকার সমস্ত বিশ্বাস ও আস্থা সাথে সাথেই ধ্বসে পড়ে। এরপর তিনি পোপ নিযুক্ত ঐ সমস্ত এজেন্টদেরকে জার্মান থেকে বের করে দেন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পঁচানব্বইটি ধারা প্রকাশ করে বিশ্বের জনগণকে সতর্ক করে দেন। তারপর একে কেন্দ্র করে ইউরোপের সর্বত্র এক দুর্বার পোপ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খৃস্টানদের ধর্মরাজ্যে এক প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। ফলে রোমান পোপের ধর্মতরীর ভরাডুবি ঘটে। এ সময় থেকেই খৃস্টান ধর্মের প্রতি সর্বসাধারণের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। কেননা খৃস্টধর্মের

আওতায় থেকে তারা প্রতি পদে পদে শিক্ষা পেয়েছিলো যে ধর্মই নির্যাতনের হাতিয়ার—ধর্মই উন্নতির প্রতিবন্ধক। কাজেই 'ধর্ম' নামক এ ভয়ঙ্কর বস্তুটিকে অবশ্যই জন-জীবন থেকে নির্বাসন দিতে হবে। ফলে সৃষ্টি হয় 'ধর্ম নিরপেক্ষতার' মতবাদ। বিজ্ঞ ইহুদী গোষ্ঠী এ মতবাদের প্রধান উদ্ভাবক। কারণ ঐ খৃস্টান ধর্মই তাদের দুঃখের অন্যতম কারণ ছিলো। তাই ধর্ম কাঁটাটিকে তারা তাদের চলার পথ থেকে এমনিভাবেই সরিয়ে দেয়।

তাদের এ প্রচেষ্টার প্রথম সফল প্রয়োগ ঘটায় ফ্রান্সে। ১৭৮৯ সালে সর্বপ্রথম রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের কবর রচনা করতে তারা পূর্ণ সক্ষম হয়। এখানে বিজ্ঞ ইহুদী মহল ফরাসী বিপ্লব ঘটার সূচনালগ্ন থেকে গইমদের (অন-ইহুদীদের) সাথে সাময়িকভাবে মিশে গিয়ে লক্ষবস্তুর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করে। আর তাই তারা তাদের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে শ্লোগান তোলে-"Liberty, Equality and Fraternity"—'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।' উক্ত শ্লোগান, যখন বাস্তবে রূপ নিলো তখন ইহুদীরা গইম-বিপ্লবীদের সাথে মিশে গিয়ে নতুন করে রাষ্ট্রের নয়া রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে থাকে এবং বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটিকে ইহুদী স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত করতে থাকে।

ইতিমধ্যে যখন স্বয়ং ফ্রান্সেই 'ড্রাইফুস' বিচারের ন্যায় একটা ঘটনা ঘটে গেলো এবং ফলশ্রুতিতে আবার ইহুদী বিদ্বেষের দাবাগ্নি দাউ দাউ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন নেতৃস্থানীয় ইহুদী গোষ্ঠি স্বজাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে আবার নতুন করে আতঙ্কের মধ্যে পড়লো। নেতৃস্থানীয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মোজেজ হেস, হিরশ কালিশার এবং থিওডোর হারৎজেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.১২ জায়নবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত

বর্ণ-এ জন্মগ্রহণকারী হেস ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ধ্বংসকারী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দরুন প্রুশিয়ান সরকার কর্তৃক বিতাড়িত হয় এবং প্যারিসে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

১৮৬২ সালে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি "ইহুদী সমস্যা" সমাধানের ইঙ্গিত দেন। তাঁর মতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায় ফরাসী বিপ্লব প্রদত্ত 'মুক্তির নির্দেশ' সত্ত্বেও স্বতন্ত্র সমাজ হিসেবে বাস করছে। চেষ্টা করেও তারা ঐ সমস্ত জাতির সাথে মিশে যেতে

পারছে না। তাই সে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে নতুন সমাজ গঠনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ইহুদী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও ইহুদী সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। পর্যায়ক্রমে প্যালেস্টাইনে ইহুদী বসতি স্থাপনের তিনি জোর সুপারিশ করেন।[১]

পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণকারী হিরশ কালিশার ছিলেন একজন ইহুদী ধর্মযাজক। তিনি প্রচার করেন যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ইহুদীদের মুক্তি প্রচেষ্টা ছাড়া তাদের মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। নিজের প্রচেষ্টায় জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গোটা প্যালেস্টাইনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে অন্য একজন ধর্মযাজকের সাথে মিলে তিনি একটি আবেদন প্রকাশ করেন। উক্ত আবেদনে বিশ্ব ব্যাপী ইহুদীদের বিশেষ করে বৃটিশ ইহুদীদের প্রতি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 'শূন্য, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত' ও পবিত্র ভূমিতে ইহুদী বসতি স্থাপন করতে বলা হয়।

১৮৬০ সালে বুদাপেস্টে জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক থিওডর হারুতজেল বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে ইহুদী বিরোধী মনোভাব লক্ষ করে তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। 'ড্রাইফুস বিচারের'[২] সময় তিনি সাংবাদিক হিসেবে প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের মহান বাণী–Liberty, Equality and Fraternity-এর মুক্তি প্লাবনে বিধৌত স্বয়ং ফ্রান্সেই যখন ড্রাইফুস বিচারের ন্যায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো তখন ইহুদী চিন্তাবিদ হারুতজেল আর স্থির থাকতে পারলেন না। ইহুদী সমস্যার একটি চূড়ান্ত সমাধানকল্পে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের মত প্রকাশ করেন। দ্রুত জনমত গড়ে তুলবার জন্য তিনি একটি মূল্যবান পুস্তকও প্রকাশ করেন। "Der Judenstaat" নামে এ পুস্তকটি ১৮৯৬ সালে ভিয়েনায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এতে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, জাতি হিসেবে ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য সর্ববাদী সম্মত। মানবজাতির ইতিহাসে এদের অবদানও অবিস্মরণীয়। এ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে ও তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইহুদীদের একটি স্বাধীন আবাসভূমি একান্ত প্রয়োজন। ইহুদী বুদ্ধিজীবী লিও পিনসকারও এ একই মতামত প্রচার করেন। তিনি তাঁর পুস্তক "Auto Emancipation"-এ উক্ত মতামত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেন।

---

১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন জার্মান ভাষায় লিখিত ইসর পুস্তক Lome and Jereusalem নামে M. Waxman কর্তৃক অনূদিত বইটি (Newyork 1918)

২. জেনারেল ড্রাইফুস নাপালিয়ান বাহিনীর গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পাচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

২.১৩ প্যালেস্টাইন ইসরাঈল করণের প্রস্তুতি

কিন্তু মত প্রকাশ এক জিনিস আর তার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু কিছু ইহুদী জেরুজালেমে গিয়ে ভিড় জমালেও কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা কেউ কখনও চিন্তা করেনি। ১৮৭০ সালে ফরাসী ইহুদীদের সংস্থা "Alliance Israelite Universelle" জাফায় একটি আধুনিক কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করে। জার্মান ইহুদীগণ জেরুজালেমে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহুদী যাজকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এটা সাফল্য লাভ করে। ১৮৭৮ সালে 'পেতা তিকভায়' প্রথম ইহুদী কৃষিবসতি স্থাপন করা হয়। কিন্তু প্যালেস্টাইনে জমি কিনে বসতি স্থাপন করার প্রচেষ্টা ছিলো অত্যন্ত সীমিত। ১৮৮১ সালে প্রতিক্রিয়াশীল তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসার পর রাশিয়ায় যে ইহুদী বিরোধী অভিযান শুরু হয় তা পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার ইহুদী পাশ্চাত্যদেশসমূহে—বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভীড় জমাতে থাকে। যারা ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে প্যালেস্টাইনে এলো তারা 'আশকেনাজী' এবং যারা প্রাচ্য থেকে এলো তারা 'সেফারদিম' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৮২ সালে একদল রুশীয় ইহুদী-ছাত্র সংগঠন জাফার নিকটে একটি কৃষি-বসতি গড়ে তোলে। এ দল 'বিলু' নামে পরিচিত। রাশিয়া ও রুমানিয়া হতে আগত ইহুদীগণ সামারিয়ার 'সিক্রন জ্যাকবে' ও গ্যালিলির 'রস পিনায়' কৃষিবসতি গড়ে তোলে কিন্তু স্থানীয় পারিবেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় এ বসতিগুলো শীঘ্রই অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। এ সময় রুশীয় ইহুদীগণ এদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বৃটিশ ইহুদী স্যার মোজেজ মন্টিফিওরীর ন্যায় স্বজাতিপ্রাণ ধনকুবের ব্যক্তি এদের সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্সের ব্যারন এডমাণ্ড দ্য রথচাইল্ডের নাম আধুনিক ইসরাঈল রাষ্ট্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বহু কৃষিবসতিকে সাহায্য করা ছাড়াও তিনি 'একরন' ও 'মেতুল্লায়' সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে দুটি বসতিস্থাপন করেন। রাশিয়ায় ইহুদী বিরোধী আন্দোলনের ফলে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে আগমনকে প্রথম 'আলিয়া' (আগমন) বলে অবিহিত করা হয়। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত মোট পাঁচটি আলিয়ায় ৪,৮৭,০০০ জন ইহুদী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে এসে বসতিস্থাপন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় আলিয়া প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে সংঘটিত

হলেও বাকী তিনটি আলিয়া বৃটিশ শাসনামলেই ঘটে। চতুর্থ ও শেষ আলিয়াতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইহুদী প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। নিচের পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ঃ

সাল	আলিয়া	আগত ইহুদী
১৮৮২-১৯০৩ খৃঃ	প্রথম	৩০,০০০ জন
১৯০৪-১৯১৪ "	দ্বিতীয়	৪০,০০০ "
১৯১৯-১৯২৩ "	তৃতীয়	৩৫,০০০ "
১৯২৪-১৯৩১ "	চতুর্থ	৮২,০০০ "
১৯৩২-১৯৪৮ "	পঞ্চম	৩,০০,০০০ "

২.১৪ থিওডোর হারৎজেল ও জায়নবাদী আন্দোলন

অধুনিক ইসরাঈল রাষ্ট্রের জনক থিওডোর হারৎজেল ছিলেন বনী ইসরাঈলদের মুক্তির অগ্রদূত। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পবিত্র ভূমিতে কিছুসংখ্যক ইহুদী কৃষিবসতি স্থাপনই ইহুদী সমস্যার সমাধানের শেষ কথা নয় ; বরং এর জন্য ইহুদী সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী। আর এজন্যই তিনি পবিত্র জেরুজালেমের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত পাহাড় 'জায়ন'কে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে উক্ত আন্দোলনের নামকরণ হয় "জায়নবাদী আন্দোলন"।

এ আন্দোলনের লক্ষ ছিলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদেরকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা এবং সে সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা বা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এ আন্দোলনের প্রধানতম ঘাঁটি হয় 'বৃটেন'। বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বাস্‌ল-এ সর্বপ্রথম বিশ্ব জায়নবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে প্যালেস্টাইনে অধিক সংখ্যক কৃষিবসতি ও ইহুদী মালিকানাধীনে কল-কারখানা স্থাপন এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইহুদীদের জাতীয় ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করার জন্য সর্বরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের সরকারকে জায়নবাদীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করে তুলবার চেষ্টাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
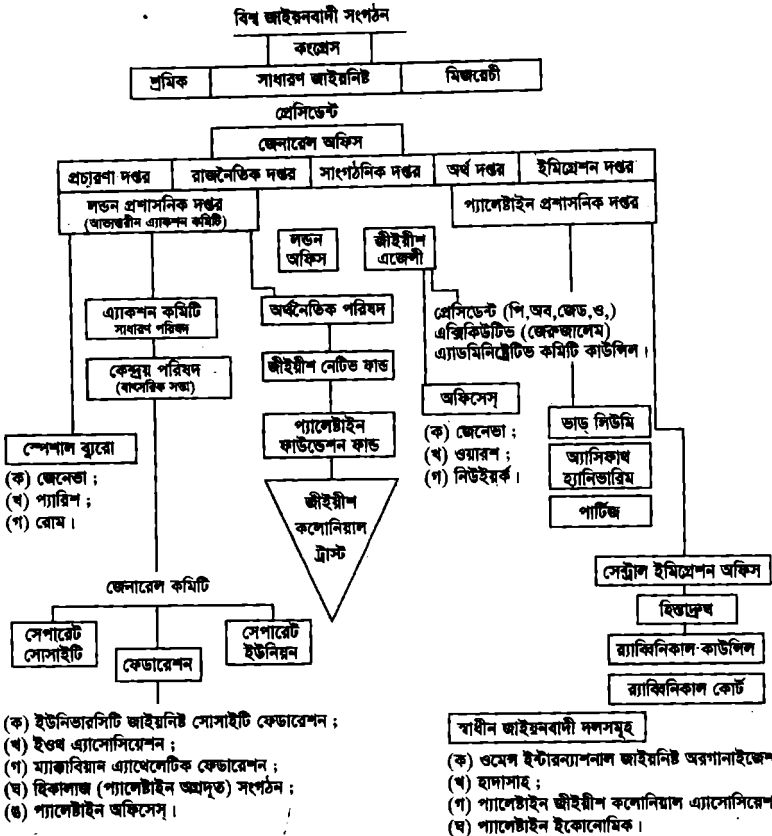
জায়নবাদী আন্দোলনের প্রথম বছরেই এর সদস্য সংখ্যা ছিল আটাত্তর হাজার জন। ১৯০৫ সালের মধ্যেই এ সংখ্যা বেড়ে দু' লক্ষে পৌছায়। কারণ ইহুদীদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক পবিত্র পাহাড় 'জায়ন'-কে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বলে এটা খুব তাড়াতাড়িই সাধারণ ইহুদী সম্প্রদায়ের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ফলে ইহুদী জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এ মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালী জাতি যেমন ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যাদুকরী নেতৃত্বে যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে লাফিয়ে পড়তে এতটুকুও ইতস্তত করেনি ; তেমনি ইসরাঈল রাষ্ট্রের জনক থিওডোর হারতজেলেরও যাদুকরী ইঙ্গিতে সর্বস্বত্যাগ করে ইহুদী সম্প্রদায় জায়নবাদী আন্দোলনে আত্মবিসর্জন করে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের বাসিন্দা এ সমস্ত ইহুদীরা জায়নবাদী আন্দোলনকে তার লক্ষে আরো দ্রুততার সাথে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্যালেস্টাইনে কৃষি বসতিস্থাপনে আরো

বেশি পরিমাণে অগ্রগামী হয়। এখন থেকে কেবলমাত্র ধনিক ইহুদী শ্রেণীর সাহায্যের ওপরই উক্ত প্রকল্প নির্ভরশীল রইলো না ; আন্তর্জাতিক জায়নবাদী সংস্থার অধীনে ইহুদী জাতীয় তহবিল "কেরেন-কায়েমাত" থেকে পরিকল্পিত ভাবে গরীব প্যালেস্টাইনীদের নিকট থেকে জমি কিনে বসতিস্থাপন করতে থাকে। জায়নবাদ সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ইহুদী অর্থনীতিবিদ ডঃ আর্থার রুপিন প্যালেস্টাইনে অবস্থান করে এ কাজ এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক অনেক গুণে বেশি। মার্কিন বিচারপতি লুই ব্রাইগুাইস ও ডঃ চেইম ওয়াইজম্যান এ বিষয়ে অন্যতম কৃতিত্বের দাবীদার। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন ত্বরান্বিত করার জন্য এ সমস্ত জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ পতনোন্মুখ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর অনবরত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু এ চাপে কোনো কাজ না হওয়ায় ইহুদীরা অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত সুলতান আবদুল হামিদকে দশ কোটি ডলারের প্রলোভন দেখিয়ে বসে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

২.১৫ মুসলমানদের ইসলাম বিচ্যুতি ও তুর্কী খিলাফতের অবসান

যে ঐশী বাণীকে বুকে ধারণ করে একদা ইসরাঈল জাতি বিশ্বজয়ী হয়েছিলো ; সেই একই জিনিসের বদৌলতে আরব বেদুঈনরা পৃথিবীর এক বৃহত্তম অংশ অল্প সময়ের মধ্যেই জয় করে ফেলে। আবার যে ঐশী বিধান ও ঐশী পুরুষকে অসম্মান ও নির্যাতন করে ইসরাঈলরা ধ্বংসে নিপতিত হয়েছিল, সেই একই জিনিস ও এর ব্যাখ্যাকারী পুণ্যাত্মা চার ইমামের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য আরব মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যায়। বনী ইসরাঈলদের আল্লাহ্ পাক যেমন পরিত্যাগ করেছিলেন ; বিশ্ব বিজেতা আরবদেরকেও আল্লাহ্ পাক তেমনিভাবে পরিত্যাগ করেন। ফলে পরে তারাও বনী ইসরাঈলদের ন্যায় বিভিন্ন জাতি কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে এ আরব জাতি একে অপরের ধ্বংস সাধনের জন্য অপর এক অত্যাচারী জাতির সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরিণামে তারা প্রত্যেকেই ঐ সকল অত্যাচারী পথভ্রষ্ট শক্তিসমূহের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ফলে আরবরা যালেম শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

বনী ইসরাঈলদের ন্যায় আরব মুসলমানরা যখন ঐ মহামূল্যবান ঐশী গ্রন্থকে জীবন থেকে বহিষ্কার করে ঘরের অন্ধকূপে বন্দী করে রাখে তখন তুর্কী জাতিই তা উদ্ধার করে এবং তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বক্ষে ধারণ করে।

আর অমনি আরববাসীদের দারোয়ান নওমুসলিম এ তুর্কী জাতি দেখতে দেখতে বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে গেলো। কৃতদাসীরা হয়ে গেলো সম্রাজ্ঞী। এ অভিনব দৃশ্য দেখে বিশ্ব চমৎকৃত হলো। এর সাথে সাথে অত্যাচারীর রাজসিংহাসন আবার থরথর করে কেঁপে উঠলো—সত্য সৈনিকের পদভারে খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো অত্যাচারীর সাধের গড়া কাঁচের রাজপ্রসাদ।

ওসমানীয় সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নও-মুসলিম তুঘরিলের ছেলে ওসমান দেখতে দেখতেই এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে গেলেন। ইসলামের অমিয় ধারায় সিক্ত ওসমান এক রকম অলৌকিকভাবেই পার্শ্ববর্তী বিশাল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য স্বীয় রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। এ সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাট মহামতি সুলাইমানের (১৫০-১৫৬৬ খৃঃ) সময়ে তুর্কীরা শৌর্য-বীর্যের চরম শিখরে গিয়ে পৌছলো। যে জেরুজালেম আরব মুসলমানদের আল্লাহদ্রোহিতার কারণে আল্লাহর ইচ্ছায়ই তা তাদের হস্তচ্যুত হলো, সেই পবিত্র জেরুজালেমকে আবার সেই আল্লাহ পাকই তুর্কীর মুসলমানদের হাতে তুলে দিলো। তুর্কী মুসলমানরা রব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সমৃদ্ধ হয়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে পৌছলো এবং বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আরব, মিশর এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূল অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। এ এশিয়াবাসী তুর্কীরাই ভূমধ্যসাগরীয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী। সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, হাঙ্গেরী, বেসারাবিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া, মন্টেনিগ্রো, হারজেগোভিনা প্রভৃতি বলকান উপদ্বীপের অঞ্চলসমূহ দখল করে তাঁরা বিশাল ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃষ্ণসাগর, এজিয়ান সাগর, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ক্রীট, সাইপ্রাস, রোডস্, মিসর, ত্রিপলি, তিউনিস এবং আলজেরিয়া বিজিত হলে ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করলো। এ তিন মহাদেশে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাসক হবার পর ওসমানীয় সুলতানেরা নিজেদেরকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতি বলে গর্ববোধ করতে লাগলো। অথচ প্রথম যেসব তুর্কী খলীফাগণ শান্তিবিধি ইসলামকে মানুষের কাছে পৌছে দেবার জন্য প্রতিরোধকারী জালেমদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করেছিলেন তাঁরা দেশের পর দেশ জয় করলেও নিজেদের জীবনযাত্রার ধরনকে এতটুকুও বদলাননি—স্রষ্টার দেয়া ঐশী বিধানই পুরোপুরি মেনে চলেন ; কিন্তু সে আদর্শ থেকে পরবর্তী

সেনারা শিগগিরই পথভ্রষ্ট হলেন। এলো আরাম, এলো ঐশ্বর্য ; বড় বড় প্রাসাদ তৈরি হলো, দেশ-দেশান্তর থেকে নানাবিধ বিলাস সামগ্রি আমদানী হলো, হেরেম তৈরি হলো। তারপর দেখা গেলো নানা রকম মতভেদ, বিভিন্ন দল, উপদল, ভোগ-বিলাসের আঁচল ধরে পরিশেষে শুরু হলো স্বার্থের হানাহানি।

আগের খলীফারা ছিলেন একান্তভাবেই সত্য-সৈনিক, ধর্মগুরু—ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ; তারপর দেখা গেলো, এ খলীফারাও মধ্যযুগের পোপদের ন্যায় আধা-ধর্মগুরু ও আধা-সম্রাট হয়ে উঠেছেন ; আরো কিছুদিন পরে তারা সোজাসুজি সম্রাটই হয়ে গেলেন। প্রকৃত যাঁরা সত্য সৈনিক ধরার পৃষ্ঠে আল্লাহর খলীফা ছিলেন তাঁরা নিজেদের মনে করতেন সাধারণ মানুষের খাদেম মাত্র ; পরবর্তিতে তাঁরা নিজেদের সাধারণ মানুষের খাদেম মনে না করে তাদের শাসক মনে করতে লাগলেন। ফলে তারা ক্রমেক্রমে শুধু শাসকই নয় বরং রীতিমত শোষকও বনে গেলেন—দারুন অহংকারী হয়ে উঠলেন তারা। মহামতি সুলাইমান তাঁর নামের আগে যে বিপুল সংখ্যক গুরু-গম্ভীর বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন তাহলো ঃ

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুলতানদের সুলতান, রোমান, পারসিক ও আরব রাজ্যের অধীশ্বর, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের অধীশ্বর, পবিত্র কা'বা, মদীনা ও জেরুজালেমের শাসক" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর পূর্ণ উপাধি নীচে দেয়া হলো ঃ

"I who am sultan of the Sultans of East and West, fortuxate lord of the domains, of the Romans, Persians, and Arabs, Hero of creation, Champion of the earth and time, Padishah and Sultan of the Mediterranean and the Black Sea of the extolled Kaba and Medina the illustrious and Jerusalem the noble, of the throue of Egypt and the province of Yemen, Aden, and San'a of Baghdad and Basra and Lasha and Cteseiphon, of the lands of Algeriers and Azerbaijan, of the region of Kipchaks and the lands of the Tartars, of Kurdistan and Luriastan and all Rumelia, Anatolia and Karaman, of Wallachia and Moldavia and Hungary and many Kingdoms and lands besides ; the Sultans Suleyman, Son of the Sultan Selim Khan."

অহংকারীর পতন অনিবার্য। যাকে কেন্দ্র করে তার এ উদ্ধত অহংকার —তারও ধ্বংস সুনিশ্চিত। কারণ সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনোক্রমেই

অহংকারীকে বরদাশত করেন না। ফলে বিশাল সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কীর সুলতানদের প্রভুত্ব কর্পুরের মতই উবে যেতে থাকে। সাথে সাথে সাম্রাজ্যও ধসে পড়তে শুরু করে।

২.১৬ 'হিউম্যানিজম'-এর উদ্ভব

এরপর পৃথিবীর মানুষ হলো দিশেহারা। যাজক ও পোপের নাগপাশ ছিন্ন করে বড় আশা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে ; কিন্তু সেই ইসলামের ধারক ও বাহক মুসলমানরাও তাদেরকে নিরাশ করলো। ফলে এখন থেকে তারা যে কোনো ধর্মের প্রতিই বিতৃষ্ণবোধ করতে লাগলো। ঘৃণা করে তারা ধর্মকেই ত্যাগ করলো। অন্যত্র শান্তি খোঁজ করতে লাগলো। ফলশ্রুতিতে তারা 'হিউম্যানিজম'-এ বিশ্বাসী হয়ে উঠলো, সর্বত্র শ্লোগান ধ্বনিত হলো—"সবার ওপরে মানুষ সত্য তার ওপরে নেই।" এর পর থেকে কে ইহুদী কে খৃস্টান বা কে মুসলমান—তা জানার বা মানার কোনো দরকারই থাকলো না—সে মানুষ কিনা সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। এ অবস্থা ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য এক মহাবিজয়। এখন থেকে তারা গইমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেলো। ছাড়পত্র পেলো তারা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের। এভাবে অতীতের যাবতীয় অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা ইহুদীরূপ কালনাগিনীকে কোলে তুলে নিয়ে নিয়োগ করলো তাদের রাষ্ট্রের বড় বড় পদে। ফলে ইহুদীদের অভিষ্ট লক্ষ অর্জনের পথ সুগম হলো এবং তারা গইম-মুসলমান ও গইম-খৃস্টানদেরকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলো।

২.১৭ ইহুদী সংগঠন ও তার উদ্দেশ্য

বড় কিছু করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন। অন্যেরা না জানলেও বিজ্ঞ ইহুদী সম্প্রদায় এটা ভালো করেই জানেন। আর জানেন বলেই বিশ্বের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ১,১৪,৭৩,৮২০জন ইহুদীকে সুসংগঠিত করার জন্য তার 'ফ্রিম্যাসন্' (১৭১৭ খৃঃ লণ্ডনে সৃষ্ট), 'জীইয়ীশ এজেন্সী, (১৯০৬ খৃঃ), 'কাহাল' (১৯০৬ খৃঃ), 'লায়ন্স ক্লাব', 'রোটারী ক্লাব' প্রভৃতির ন্যায় সংগঠন গড়ে তোলেন। এ গোপন সংগঠনগুলোর লক্ষ হচ্ছে ঃ

১. যেসব দেশে ইহুদী বাসিন্দা রয়েছে সেসব দেশে উপসংগঠন সৃষ্টি করে শক্তিশালী পদক্ষেপের মাধ্যমে ইহুদীদের সুসংগঠিত করা।

২. অন-ইহুদীরা যাতে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য ভুলে যায় সেজন্য সংস্কৃতিক বিপ্লবের নাম দিয়ে এক শয়তানী বিপ্লব ঘটানো।

৩. যে সমস্ত গইম-সরকার ইহুদী স্বার্থের পরিপন্থী রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করবে সে সমস্ত সরকারের পতন ঘটানোর জন্য সে দেশের সরকার বিরোধী জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে তাদের পতন ঘটানো।

৪. এবং অন-ইহুদীদের ওপর ইহুদীদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য কায়েম করা।

গইম বিধ্বংসী কার্যকলাপ চালানোতে উপরোক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে ফ্রিম্যাসন সংস্থাই লক্ষকে সামনে রেখে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ সংস্থার মূল ঘাটি লণ্ডনে অবস্থিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্রিম্যাসন সংগঠনগুলো লণ্ডনের "United Grand Lodge"-এর সাথে সংযুক্ত। যার সুষ্ঠু পরিচালনায় বিশ্বের ইহুদী গোষ্ঠী নিজেদের লক্ষ অর্জনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

যে কোনো বিপ্লব ঘটাতে হলে সর্বপ্রথম চিন্তা-রাজ্যে বিপ্লব ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। আর চিন্তাধারার বিপ্লব যে কোনো সামাজিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত। আবার চিন্তাধারায় বিপ্লব বহুলাংশে ভাষা ও সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল। এটা গইমরা ততটা না বুঝলেও ঝানু ইহুদী গোষ্ঠী বেশ ভালো করেই জানতো। আর জানতো বলেই তারা তাদের লক্ষ অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গইম মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে "সাহিত্য-বোমা" ব্যবহার করে। এ মারণাস্ত্রের আঘাতে তারা বিশেষ করে মুসলমান সন্তানদেরই বেশি ধ্বংস সাধন করে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিকে যেমন তারা পবিত্রতার অভাব হেতু ঐশী শক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত হলো ; অন্যদিকে তেমনি তারা অপসংস্কৃতির সমঝদার হয়ে পবিত্র জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিস্বাদ ও ঘৃণাবোধ করতে লাগলো। ফলে গইম মুসলমানরা তাদের জাতীয় ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে গেলো। মূলত এটাই ইহুদীরা চাচ্ছিলো।

২.১৮. তুর্কীর খিলাফতের পতনের কারণ

দীর্ঘদিন ধরে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য ঐ গোপন সংস্থাগুলো এ কর্মকাণ্ডেই অর্থাৎ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের সর্বত্রই অসন্তোষ ও বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ওসমানীয় খলীফাগণ সম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত 'পাশা' নামে প্রশাসক নিয়োগ করেছিলো তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যে 'ইহুদী-গ্যাংগ্রিন' রোগ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিলো তা সাম্রাজ্যকে অচিরেই ধ্বংস করে ফেলে।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একমাত্র গর্বের বস্তু ছিলো 'জেনেসারী' নামক এক দুধর্ষ সামরিক বাহিনী। এটা ছিলো তখনকার দিনে শত্রুদের জন্য এক আতঙ্ক। জেনারেল জোহান হারডেগ ১৫৯৪ সালে 'পাকোজদ যুদ্ধ' সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসংখ্য জেনেসারী সৈন্য শুয়ে আছে যেমন নাকি মাঠে ফসলের আটি পড়ে থাকে। চমৎকার লোকগুলো, তাদের অনেকেরই দাড়ি নেই, অন্যদের চুল সাদা হয়ে গেছে তাদের পাশে পড়ে আছে রাইফেল ও অন্যান্য রসদ ঃ পিস্তল, কার্তুজ, খাবার ইত্যাদি। দৃষ্টি বিষন্নময়। কিন্তু পাশপাশি ওসমানীয় মুসলমানদের পুরো নতুন ইতিহাসটাই বিষন্নময়। জেনেসারী বাহিনী সারা ইউরোপকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তারা ছিল দুর্ধর্ষ ও শৃংখলাবদ্ধ সৈন্য। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সাথে তাদের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথমে তারা ছিলো সাফল্যের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু পরে তারা বিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কবর রচনা করেছে। জেনেসারীদের জনসাধারণ ভয় ও শ্রদ্ধা করতো। সুলতানরা তাদের প্রিয় সৈন্যদের 'সাম্রাজ্যের প্রধান খুঁটি' বলে অভিহিত করতো। কিন্তু পরে এ জেনেসারীরাই ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে জেনেসারীরা নিজেদেরকে সৈনিকের পরিবর্তে রাজ্যের নেতা বলে মনে করতে থাকে। পরে তারা হয়ে যায় "King Maker" —একশো বছরের মধ্যে তারা ৭ জন সুলতানকে সিংহাসন চ্যুত করে এবং প্রত্যেক নতুন বাদশাহর কাছ থেকে তারা প্রচুর পুরস্কার আদায় করে। পরিণামে নবনিযুক্ত সুলতানরা জেনেসারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্য, বিশেষ করে, সুলতান পরিবারের মারাত্মক অবস্থা, চরম নৈতিক অধঃপতন ও নীতিভ্রষ্টতার কথা বলতে গেলে ১৬৪০ সাল থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সুলতান ইবরাহীমের শাসনামলই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করার ব্যাপারে সুলতানের জন্য তার ভাইদের এবং ভায়ের বংশধরদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাই ছিলো নিয়ম। ৩য় মুহাম্মদের রাজকীয় শোভাযাত্রায় নিহত যুবরাজদের লাশ বোঝাই ১৯টি কফিন ছিলো। পরে অবশ্যই ব্যবস্থা আরো হালকা হয়ে যায়। সিংহাসনের সম্ভাব্য দাবিদার হিসেবে সন্দেহ করা হলে তাঁকে ভদ্রভাবে বন্দী করে রাখা হতো। অনেকবার বিদ্রোহী জেনেসারীরা ভীত-সন্ত্রস্ত প্রার্থীকে বন্দী অবস্থা থেকে ধরে এনে তাদের শত আপত্তি সত্ত্বেও সুলতানের সিংহাসনে বসাতো। যৌবনে ইবরাহীম এ রকম বন্দী অবস্থায় ছিলেন। সিংহাসনে বসে তিনি নিজেকে প্রতিভাহীন নিষ্ঠুর সুলতান হিসেবে প্রমাণ করেন। একবার মুহূর্তের খামখেয়ালীর জন্য তিনি তাঁর তিনশ' ক্রীতদাসীকে বসফরাসে ডুবিয়ে

মারেন। এটা কঠোর মনোভাবাপন্ন মন্ত্রীদের কাছেও বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি মনে হয়—যারা কোনো কিছুতেই অবাক হতেন না। তারা জেনেসারীদের সমর্থন পেলেন। জেনেসারীরা সোজা অন্তঃপুরে ঢুকে ইবরাহীমকে অবগত করলো যে, তিনি আর সুলতান নন। শাসক আবার তাঁর বন্দীশালায় ফিরে যান। এর কিছু দিন পর তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধি দল যায়। তিনি ভাবেন, এরা আবার তাঁকে সিংহাসনে বসাবে, কিন্তু তারা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলালো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরো অবনতি ঘটলো। বাইরের ও ভিতরের গোলযোগ ছাড়াও নতুন আর একটি মহাবিপদ দেখা দিলো ; তাহলো আধুনিক রাশিয়ার উত্থান। বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও পিটার দি গ্রেটের বাহিনী আজভ থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হলো। পরে তারা রুমানিয়ার রাজ্যগুলোতে ওসমানীয় শাসককে চ্যালে করলো। ইতিমধ্যেই পিটার দি গ্রেট ওসানীয়দের পূর্বশত্রু পার্সিয়ার (ইরানের) সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়ে হাত শক্ত করে নেয়। ফলে দেশের দু'দিকেই ভয়ের কারণ দেখা দিলো। এ সময় থেকেই ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি" বলে অভিহিত করা হতে থাকে।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যখন এ করুণ দশা তখন তার পাশাপাশি রাশিয়ার উত্থান ও তার সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং ইউরোপের শিল্প বিপ্লব—ইত্যাদির পরিণাম স্বরূপ সৃষ্টি হয় এক জটিলতম সমস্যা, নাম তার "প্রাচ্য সমস্যা" বা "Eastern Question".

প্রখর উত্তাপে যখন কোথাও বায়ুমণ্ডলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তখন সেখানে এক থমথমে অশান্তিময় অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরই এ শূন্যতা পূরণের জন্য চারদিক থেকে 'বায়ুশক্তি' দ্রুত গতিতে ছুটে আসে। ফলে সেখানে যে তাণ্ডবলীলা শুরু হয় তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানিও ঘটে। অনুরূপভাবে ওসমানীয় খলীফারা যখনই আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্বকে শাসন করার জন্য আল্লাহ্ প্রণীত আইনের পরিবর্তে ব্যক্তি আইন প্রয়োগ করা শুরু করলো, তখনই মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। রিপুর তাড়নায় দিশেহারা হয়ে চরম অহংকারী, ব্যভিচারী ও অত্যাচারী হয়ে উঠলো তারা। ফলে সেই সুলতান ও সালতানাত থেকে আল্লাহর শক্তি ও রহমত চিরবিদায় নিলো। ফলে সেখানে এক চরম রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করতে লাগলো। আর এ শূন্যতার ফলে সেখানে এক আতঙ্কময় অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো। রব্বুল আলামীনের দেয় যে বিশেষ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে সুলতানরা এতদিন কোটি কোটি জনতা ও বিশাল ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব করে যাচ্ছিলো,

সেই ক্ষমতা যখন আল্লাহ্ পাক অপকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন তখন সেখানে মারাত্মক এক শূন্যতার সৃষ্টি হলো। আর এ শূন্যতা পূরণের জন্য সৃষ্টির নিয়ম অনুসারেই পার্শ্ববর্তী শক্তিসমূহ সেখানে ছুটে এলো এবং তাদের এ শূন্যতা পুরোনের প্রতিযোগিতায় সৃষ্টি হলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষ। আর এ সংঘর্ষেরই চূড়ান্ত রূপ নিলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধ এরই অভিশপ্ত ফসল। আর এ যুদ্ধের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হয়েছিলো তা বলাই বাহুল্য।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে যখন দুর্যোগের এ ঘনঘটা তখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রসারতায় পতনোন্মুখ বিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে লু-হাওয়া বইছিলো। ধ্বংসনুখ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার জন্য গোপনে প্রত্যেকে প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো। এ গোপন প্রতিযোগিতা পরে এত তীব্র হয়ে উঠলো যে, একে অপরকে পর্যদুস্ত করে অধিক স্থান দখল করার জন্য সংগোপনে রকমারী মানব-বিধ্বংসী অস্ত্র বানাতে থাকে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রই এ দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলো না ; যারা নিজেরা তৈরি করতে পারলো না, তারা টাকার বিনিময়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলো। ফলে গোটা ইউরোপ দেখতে দেখতে বিরাট এক বারুদাগারে পরিণত হলো। ফলশ্রুতিতে ইউরোপীয় দেশ-সমূহের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় ও আতঙ্কপূর্ণ এক অশান্তিময় অবস্থা বিরাজ করতে লাগলো। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের রকমারী অস্ত্রের প্রতিও নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ আস্থাস্থাপন করতে পারলো না—তাই তারা বন্ধু খুঁজতে লাগলো। এমনিভাবে সৃষ্টি হলো "ত্রি-পক্ষীয় মৈত্রী চুক্তি" (Triple Alliance) ও "ত্রি-পক্ষীয় ঐক্যসূত্র" (Triple Entente)।

Triple Alliance-এ ছিলো জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক। অপরদিকে Triple Entente-এ ছিলো বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এভাবে গোটা বিশ্ব দুটি শত্রুশিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছলো যে, যে কোনো সামান্য একটা ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই ইউরোপের বারুদাগারে আগুন লেগে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিলো। ঠিক এমনি সময়ে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস যখন সার্বিয়ার রাজধানী সারাজেভোর রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক আততায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তেই তা এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে ফ্রান্সিসের বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। আর এর সাথে সাথেই অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিসের রক্তাক্ত দেহটি রাজপথে লুটিয়ে পড়লো। আর এ বুলেটটি যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি

করলো তা-ই ইউরোপের বারুদাগারে বিস্ফোরণ ঘটালো—বিশ্বব্যাপী দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।

এ ঘটনার সাথে সাথে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আততায়ীর জাতি বলে গালি-গালাজ শুরু করে এবং বেশ কতকগুলো শর্ত আরোপ করে সার্বিয়ার নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করে। এ পত্রের জবাব ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চেয়ে পাঠালো এবং বলা হলো, উক্ত সময়সীমা অতিক্রম করলেই সার্বিয়াকে এর জন্য অবশ্যই কঠিন মূল্য দিতে হবে। সার্বিয়া তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্নকারী কয়েকটি শর্ত আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলোচনার জন্য প্রস্তাব জানিয়ে বাকী সবগুলোই মেনে নিলো ; কিন্তু ক্রুদ্ধ অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই সার্বিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়া সার্বিয়ার পাশে এসে দাড়ায়। অন্যদিকে জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষাবলম্বন করলো। এদিকে ফ্রান্স জার্মানীকে জব্দ করার জন্য দ্রুত রাশিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। ইউরোপের তৎকালীন বৃহত্তম শক্তি জার্মান ফ্রান্সের এ চ্যালেঞ্জের উচিত জবাব দেয়ার জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সৈন্য 'মার্চ' করায় আর এর সাথে সাথেই ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে যে বৃহত্তম যুদ্ধ বেঁধে যায়, তা-ই বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মহাযুদ্ধ নামে পরিচিত। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান এ যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষ নেয়। তাঁর এ জার্মানপ্রীতির কারণও ছিলো। ওসমানীয় সাম্রাজ্য যখন একান্ত বাঁচার তাগিদে আসন্ন ধ্বংসের সাথে পাঞ্জা লড়ছিল তখন একমাত্র জার্মান বাদে প্রায় সবাই ওসমানীয় সাম্রাজ্যের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। দ্বিতীয়তঃ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যের ভিতর তারা অনেক গোপন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও গড়ে তোলে এবং তাদেরকে অস্ত্র, অর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ ওসমানীয় সুলতানদের নৈতিক অধপতন ও আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের সুযোগ নিয়ে বলকান উপদ্বীপের বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতিদের উস্কানি দিয়ে সেখানে এক দুর্বার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তাদের এ সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্য বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। ফলে বিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্য দিনের পর দিন ক্ষয়ে যেতে থাকলো। আভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুর করাল গ্রাস থেকে সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশকে রক্ষার জন্য তুরস্কের সুলতান প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করেছিল।

জার্মান জাতি ছিলো ঐ সময় সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু তাহলে হবে কি ; স্বয়ং বিশ্বপ্রভু যখন কোনো জাতির প্রতি রুষ্ট হন, তখন পার্থিব কোনো

শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না ; বরং তার স্বজাতিই ঐ জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ; ফলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এর বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পেয়েছি বহুবার। এমন কি পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির সময়ও এ নিয়মের বাস্তব প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

প্রথম মহাযুদ্ধে বিশ্বের ভীতিকর ওসমানীয় সামরিক বাহিনীও অনুরূপ পরণিতিরই সম্মুখীন হয়েছিল। ইরাক ছিল ঐ সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ। এ ইরাক রণাঙ্গনে ওসমানীয় সৈন্যরা যখন বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়ে পালায়নের চেষ্টা করে তখন ইরাকী মুসলমানরাই ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কবর দেয়ার জন্য রক্তাক্ত ওসমানীয় সৈনিকদের দা-কুড়াল দিয়ে খতম করছিল।

২.১৯ ইপারের প্রান্তরে জার্মান বাহিনীর নিকট বৃটিশ শক্তির পরাজয় ও ইঙ্গ-ইহুদী নেতৃবৃন্দের সুযোগ গ্রহণ

১৯১৭ সালের এপ্রিলের ৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। জার্মানী অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে যুদ্ধ করতে থাকে এবং ইংল্যাণ্ডের পতন ঘটানোর জন্য ১৯১৭ সালের ৩১ জুলাই ইপারের যুদ্ধে মরণ আঘাত হানে। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। বৃটেন এখানে জার্মানীর হাতে এমন মার খায় যে, তার সামরিক শিরদাড়া একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। এ যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের ৪ লাখ সুদক্ষ সেনানীর কবর রচনা হয়। এভাবে একমাত্র ইপারের রণাঙ্গণেই ৪ লাখ সৈন্য হারিয়ে চার্চিল দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ বিপুল সামরিক ক্ষতি পূরণের জন্য বৃটেন সৈন্য সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু উপযুক্ত যুবক বৃটেনের মায়েরা আর কত জোগাবে ? যুদ্ধে পাঠানো যায় এমন যুবকের অভাবে তাই বৃটিশ সরকার তখন দিগ্বিদিক দিশেহারা।

জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ ভাবলো লক্ষে পৌছার এটাই সুর্বণ সুযোগ। তারা 'আশ্বাস' ও 'শর্তের' থলি নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করতে লাগলো বৃটিশ সরকারের সাথে। তারা বললো, যুদ্ধে জিতলে বৃটেন যদি ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে একটি রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করে দিতে রাজি হয় তবে শুধু বৃটেনে অবস্থানরত ইহুদীই নয় বরং বিশ্বব্যাপী সুসংগঠিত যে ইহুদী সম্প্রদায় রয়েছে তারা জান-প্রাণ দিয়ে বৃটেনের স্বপক্ষে যুদ্ধ করে যাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে পূর্ণরূপে যুদ্ধে অংশ নেয় সে দায়িত্ব জায়নবাদী আন্দোলনের সদস্যরা নিজ হাতে তুলে নিবে। আর যদি ইংল্যাণ্ড তাদের এ শর্ত না

মানে তবে বিশ্বজোড়া ইহুদী সংগঠনসমূহ তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যে কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

২.২০ বৃটেনের ইহুদীদের শর্তে রাজী হওয়ার কারণ

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বৃটেন কয়েকটি দিক বিবেচনা করলো। প্রথমতঃ বৃটেন চিন্তা করলো যদি তারা ইহুদীদের শর্তে রাজী হয়, তবে শুধু বৃটেনেই নয় বরং বিশ্বজোড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ সংরক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহুদীদের শক্তিশালী সংগঠনসমূহের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের শর্তে যদি রাজী না হয়, তবে বিশ্বজোড়া উপনিবেশ রক্ষা তো দূরের কথা পরিস্থিতি মোতাবেক বৃটেনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। কারণ বাইরের থেকে ঘরের শত্রুই অধিক মারাত্মক। তার ওপরে তো তারা এমন এক জাতি যাদের গোটা ইতিহাসটাই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় ভরপুর। অতএব তাদের সন্তুষ্টি বিধানই একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের পর কেরেনেস্কি সরকার 'বুর্জোয়া' ও 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধ থেকে সরে দাড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ ইচ্ছা যদি সত্যি সত্যিই বাস্তবে রূপ নিত তবে পূর্ব রণাঙ্গণে নিয়োজিত বিপুলসংখ্যক জার্মান সৈন্য পশ্চিম রণাঙ্গণে নিয়োজিত হতে পারতো। আর তাই যদি হতো তবে ফরাসী সীমান্তে মিত্রবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। এ সম্ভাবনা দূর করার জন্যই যে কোনো উপায়ে আরো কিছুদিন রাশিয়াকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। বলাবাহুল্য যে, বলশেভিক বিপ্লবে রাশিয়ার ইহুদীরা এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। এ আন্দোলন ইহুদীদেরই অর্থসম্পদে পরিচালিত হয়। জ্যাকব শিফ্, কুইনলুইবা, ব্যাংকিং হাউস, ওয়েস্ট ফলেন, রাইনল্যাণ্ড সিণ্ডিকেট, ইয়ার্জীন ব্যাংকিং হাউস প্রমুখ ব্যাংক মালিকগণই অঢেল অর্থ সাহায্য দিয়ে এ বলশেভিক আন্দোলন মজবুত করে গড়ে তুলেছিলেন। দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যারা প্রথম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে নেতৃস্থানীয় বলশেভিক ইহুদীদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তাদের সহায়তায় রাশিয়াকে আরো কিছুদিন যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখা যাবে। চতুর্থতঃ ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল আমেরিকা জার্মানীর বেপরোয়া ডুবোজাহাজ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আংশিকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করেনি। অথচ এ সময় ইপারের তৃতীয় যুদ্ধে বৃটেন জার্মানীর কাছে ভয়ানকভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো।

ইতালী ক্যাপোরেটো অভিযানে (২৪/১০/১৭ থেকে ২৬/১২/১৭ পর্যন্ত) জার্মান-অস্ট্রিয়া যুগ্মবাহিনী ইতালীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। এ যুদ্ধে প্রায় ৩ লাখ ইতালীয় সৈন্য বন্দী হয়। এমতাবস্থায় বৃটেনসহ অন্যান্য মিত্রশক্তি যুদ্ধে আমেরিকাকে অধিক সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করতে থাকে। প্রেসিডেন্ট উইলসনসহ মার্কিন প্রশাসনের ওপর ইহুদী বুদ্ধিজীবী ও ধনিক শ্রেণীর প্রভাব সম্বন্ধে কমবেশি প্রত্যেকেই সচেতন ছিলেন। ব্যালফো ঘোষণার ন্যায় একটি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মার্কিন ইহুদীদের সহযোগিতা অর্জন করে জায়নিস্ট সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আমেরিকান সরকারকে পূর্ণভাবে যুদ্ধে নামানো সম্ভব বলে বৃটেন ও তার সহযোগি শক্তিসমূহ মনে করতে থাকে। পঞ্চমতঃ এর পিছনে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও লুকায়িত ছিলো। সুয়েজ খাল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের জন্য এত বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, তার নিরাপত্তার জন্য বৃটেন যে কোনো পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলো। আরব মুসলমানদের ওপর তারা কোনো দিনই পূর্ণ আস্থাস্থাপন করতে পারেনি। বৃটেন মনে করে যে, যদি তারা ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে একটা আবাসভূমি সৃষ্টি করে দেয়, তবে ইহুদী জাতিকে কৃতজ্ঞতার নাগাপাশে আবদ্ধ করা যাবে এবং এদের সাহায্যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সাফল্যজনকভাবে অর্জিত হবে। পরিশেষে, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে যে হারে ইহুদী সম্প্রদায় পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভিড় জমাতে থাকে তাতে ঐ সমস্ত দেশ-সমূহের সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এজন্যই যে, তারা যেখানেই গেছে সেখানেই রাষ্ট্র ও স্থানীয় জনগণের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছে। কাজেই এ ভয়ঙ্কর ইহুদী বাস্তুত্যাগীদের দূরে সরিয়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ বলে তারা মনে করেন। ফলে মুসলমানদের অসহায়তা ও অভিভাবকহীনতার সুযোগ নিয়ে মিত্রশক্তির (Triple Entente) পাণ্ডারা প্যালেস্টাইনী মুসলমানদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত করে সেখানে ইহুদী নামক এ বিষবৃক্ষটি রোপণ করে তাকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করতে নিয়মিত সেচকার্য চালানোরও পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

২.২১ ব্যালফোর ঘোষণা

যাই হোক বৃটেন সবদিক বিচার বিবেচনা করে ও অন্যান্য মিত্রশক্তির উৎসাহ পেয়ে ইহুদীদের প্রস্তাবিত শর্তে সম্মত হয়ে যায়। কিন্তু কূটকৌশলী জায়নিস্ট নেতারা বৃটেনের এ সম্মতি হওয়াতেই খুশীতে গলে গেলো না ; তারা সাবধানী নেতা ডঃ চেইম ওয়াজম্যানকে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস্ আর্থার ব্যালফোরের নিকট পাঠিয়ে দাবী পেশ করে যে, তারা বৃটিশ

সরকারের পক্ষ থেকে ইহুদীদের শর্ত পূরণের প্রমাণ স্বরূপ প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস সম্বলিত একটি সরকারী ঘোষণা শুনতে চায়। আর তা করলে বৃটিশ সরকারেরই উপকার হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদী সম্প্রদায় তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের লীলা ভূমিতে আবার ফিরে যাবার আনন্দে অনন্দিত হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, যুদ্ধে বৃটেনের বিজয়কে নিশ্চিত করে তুলতে। ইহুদীদের এ সুতীক্ষ্ণ যুক্তিতে বিশেষ করে বৃটেন চমৎকৃত হলো। ফলে বৃটিশ সরকার অন্যান্য মিত্র শক্তিসমূহের পরামর্শক্রমে ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বরে বিশ্ব ইহুদী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে একটি ঘোষণা প্রদান করে। তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস আর্থার ব্যালফোর কর্তৃক উক্ত ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় বলে বিশ্ব ইতিহাসে এ ঘোষণাটি "ব্যালফোর ঘোষণা" নামে খ্যাতি লাভ করে। বিশ্বজায়নিস্ট আন্দোলনের অর্থ যোগাদানকারী ধনকুবের রথচাইল্ডের নিকট পাঠানো একটি পত্রের মাধ্যমে ব্যালফোর উক্ত ঘোষণাটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। পত্রটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

Dear Lord Rathchild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of syimpathy with Jewish Zionist aspiration which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

His Majesty's Government view with the favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish Communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the Knowledge of the Zionist Federation.

২.২২ সাইক্স পিকোঁ চুক্তি ও অমুসলমানদের মুসলিম প্রীতির গোমর ফাঁক

আসলে এসব কিছুই বৃটেনের ভাওতাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা চাচ্ছিলো ওসমানীয় খেলাফতের ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে মুসলমানদের

অস্তিত্বের ওপর আঘাত করা। আর এ অসহায়ত্ব ও অনৈক্যের সুযোগে তাদেরকেও নিঃশেষ করা। কিন্তু আসলে মুসলিম নামে যে শক্তি ইতিপূর্বে মজলুমের উদ্ধারের জন্য অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, তাদের সামনে দাঁড়াবার মতো হিম্মত কোনো যালেম শক্তিরই ছিল না। যদিও এ সময় নীতিভ্রষ্টতার জন্য মুসলমানরা সূর্যের সেই শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তবুও অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েও সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রীর দল সরাসরি ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে লড়তে ভয় পাচ্ছিল। তাই তারা বীরের জাতি মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা গোপন ইহুদী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে এক অপবিপ্লব ঘটায়। তাদের এ শয়তানী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিভাবান মুসলিম যুবকগুলো নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং এ ভ্রষ্ট যুবকদের ফাঁদে ফেলবার জন্য নানা জাতীয় প্রলোভন দেখিয়ে 'ম্যাশনলজে' নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে রীতিমত 'ব্রেন ওয়াশ' করে প্রস্তুত করা হয়। ফলে এ সমস্ত তালিমপ্রাপ্ত যুবক এক আত্মধ্বংসী বারুদে পরিণত হয়। এ চলমান জীবন্ত বারুদ দিয়েই কুচক্রীর দল মুসলিম শক্তিকে বিনাশ সাধন করে। শরীফ হুসাইন ছিলেন এ ধরনের একটি চলমান জীবন্ত বারুদ। এ বারুদ দিয়েই মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলো মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক বিশাল ওসমানীয় খেলাফতের ধ্বংস সাধন করে।

কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের নেতা শরীফ হুসাইন ও তার দোসরেরা মুসলমান হওয়ায় কখনো ভাবতে পারেনি যে মিত্রশক্তির মুখপাত্র সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এমনিভাবে তাদেরকে প্রতারণা করতে পারে। তাই তারা প্রতারক বৃটিশ বন্ধুর প্রতিটি কথাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। অথচ কুচক্রী বৃটিশ এর মধ্যেই সংগোপনে ফরাসী ও রাশিয়ার সাথে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করে। মধ্যপ্রাচ্যের কোন্ অঞ্চল কে নিবে, তা ঠিক হয় এ গোপন চুক্তিতেই। ১৯১৫ সালের ২১ ডিসেম্বর এ কুখ্যাত চুক্তিটি ত্রিশক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির খসড়াটি বৃটেনের কূটনীতিবিদ স্যার মার্ক সাইকস ও ফ্রান্সের জর্জ পিকোঁ প্রস্তুত করে বলে এটা ইতিহাসে "সাইকস্-পিকোঁ" চুক্তি নামে পরিচিত।

২.২৩ শরীফ হুসাইনের বৃটিশ বাহিনীর সাথে অভিযান

এ গোপন চুক্তি সম্বন্ধে শরীফ হুসাইন ও তার দোসররা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো। সে জন্য বৃটেনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্বের প্রথমে সে

শৃংখলাবোধ বিবর্জিত আরব বেদুঈনদের একটি আধুনিক বাহিনীতে পরিণত করার কঠিন দায়িত্ব প্রথমে আজিজ আলী আল মিসরী ও পরে জাফর পাশা আল আশকারীর ওপর অর্পণ করে। এরা উভয়েই ইতিপূর্বে ওসমানীয় বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলো। পরে সেখান থেকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে শরীফের দলে এসে যোগ দেয়।

পরবর্তীতে শরীফ হুসাইন তার গোটা বিদ্রোহী বাহিনীকে তিনটি দলে বিভক্ত করেন এবং এর পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তাঁর তিন ছেলের ওপর ন্যস্ত করেন। বড় ছেলে আলীর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহী বাহিনী পরিচালিত হলো তা সরাসরি মদীনায় গিয়ে পৌঁছালো এবং মদীনা অবরোধ করে অবস্থান করতে লাগলো। মেঝো ছেলে আবদুল্লাহর নেতৃত্বে যে বাহিনী তিনি পাঠালেন তা ওয়াদী-আইস-এ ঘাঁটি গেড়ে ওসমানীয় বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং ওসমানীয় বাহিনীর রসদপত্র লুণ্ঠিত করার জন্য সেখানে অবস্থান করতে লাগলো। এদিকে সেজো ছেলে ফয়সলের নেতৃত্বে তৃতীয় বাহিনীটি উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এ বাহিনীই আরব বিদ্রোহে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে উপকূলবর্তী শহর ওয়াজ দখল এ বাহিনীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু আরব বেদুঈন বাহিনীর সৈন্যরা আধুনিক রণকৌশলে অনভিজ্ঞ হওয়ায় এবং অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা থাকায় তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মিত্র শক্তির কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কিছু সংখ্যক মিত্রপক্ষীয় সামরিক উপদেষ্টার উপস্থিতি পরিস্থিতির পরিবর্তনে সহায়তা করে। তাদের নির্দেশক্রমে হেজাজ রেল পথের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হয়। কর্নেল টমাস্, এডওয়ার্ড লরেন্স, কর্ণেল এস. এফ. নিউকম, মেজর পি. জয়েস্ প্রমুখ বৃটিশ উপদেষ্টাদের প্রচেষ্টায় আরব বাহিনী কিছুটা উৎকর্ষতা অর্জন করে। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে আকাবা দখল এ উৎকর্ষতারই বহিঃপ্রকাশ। এরপর আরো উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে দামেশক দখল করাই আরব বিদ্রোহীদের মূল লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এ লক্ষ অর্জনের জন্য আরব গোত্রগুলোর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর এ প্রয়োজন যে হবে তা বৃটেনের নেতৃত্বদানকারী ইহুদী নেতৃবৃন্দ বেশ আগেই বুঝতে পেরেছিলো। তাই তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বৃটিশরা অনেক আগেই দক্ষিণ আরবের ২৩টি ক্ষুদ্র সালতানাত ও শেখ রাজ্যকে চুক্তিতে আবদ্ধ করে। বৃটিশদের নির্দেশে ঐ সমস্ত শেখরা শরীফ হুসাইনের প্রেরিত বাহিনীকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে জান-প্রাণ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। লুয়াইতাত গোত্রের প্রধান শেখ আউদা আবু তাইয়েহ ও

রুয়ালা গোত্র প্রধান শেখ নূরী আশ শা'লানের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে ফয়সলের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। আকাবা দখলের পর

চিত্র ৫ ঃ প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী এল্যানবীর জেরুজালেমে প্রবেশের চিত্র।

আরব বাহিনীর কার্যকলাপের সামরিক গুরুত্ব মিত্রশক্তি দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে। সিরিয়া হতে ওসমানীয় প্রশাসনযন্ত্র তাড়ানোর জন্য মিশর থেকে পাঠানো মিত্র বাহিনীর নেতা স্যার আর্চিবল্ড মারে প্রথমদিকে আরব কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। গাজা এলাকার ওপর বৃটিশ অভিযান ব্যর্থ হলে স্যার এডমাণ্ড এ্যালেনবী সেনাপতি মারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে দ্রুততার সাথে

এ্যালেনবী সিনাই উপদ্বীপ অতিক্রম করেন এবং ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে শরীফ হুসাইনের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে হুড় হুড় করে পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে ঢুকে পড়েন।

ইতিমধ্যে জেনারেল মড (Maude)-এর পরিচালনায় বৃটিশ বাহিনীর অপর এক দল বাগদাদও দখল করে নেয়। মিত্রবাহিনী এভাবে সিরিয়া, প্যালস্টাইন ও হেজাজে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে।

স্থলযুদ্ধে জার্মান বাহিনী বৃটিশকে শায়েস্তা করতে না পারায় নৌযুদ্ধে মরণ আঘাত হানা শুরু করে। জার্মান সাবমেরিন আইরিশ উপকূলে 'লুসিটানিয়া' (Lusitania) নামক একটি যাত্রীবাহী জাহাজ মাত্র বার মিনিটে ডুবিয়ে দেয়। ফলে ১২০০ জনের সলিল সমাধি হয়। এদের মধ্যে ১২০ জন ছিলো মার্কিন নাগরিক। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান বিরোধী জনমত গড়ে ওঠে। আর এদেরকে উস্কানি দিতে লাগলো জায়নবাদীরা এবং এমনভাবে প্রেসিডেন্ট উইলসনের ওপর চাপ দিতে থাকলো যাতে এক রকম বাধ্য হয়েই তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তবুও তিনি তখনো ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েননি। কিন্তু ব্যালফোর ঘোষণার সাথে সাথে তিনি মহাবিপদে পড়েন। কারণ তিনি শান্তিবাদী লোক ছিলেন। তাই তিনি সাধ্যমত নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী নেতৃবৃন্দ ও জনমত দারুণভাবে তাঁর সমালোচনা শুরু করে এবং জায়নিস্ট নেতৃবৃন্দের চাপে একান্ত বাধ্য হয়েই উইলসন পুরোপুরিভাবে যুদ্ধে নেমে পড়েন। এর পরপরই মহাযুদ্ধের পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। প্রতিটা রণাঙ্গনেই শত্রুপক্ষের বিপর্যয় ঘটতে থাকে। জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম রণাঙ্গনে পিছু হটতে বাধ্য হয়। হিণ্ডেনবুর্গ লাইন বিধ্বস্ত হয়। জার্মান ডুবো জাহাজের অপকীর্তি 'কনভয় ব্যবস্থা' (Convoy system) দ্বারা ব্যহত করা হয়। মিত্রবাহিনী সার্বিয়া দখল করে এবং বুলগেরিয়া ১৯১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করে। এশিয়ায় ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ অধিকৃত হলে তুর্কী সুলতান ৩১ অক্টোবর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। ইতালী Vittorio Veneto-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। ফলে ৩ নবেম্বর অস্ট্রিয়া মৈত্রী স্থাপন করে। এভাবে জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্রসমূহের পতনে জার্মানীর আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত হয়। শেষ পর্যন্ত জার্মানীর অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ ও বিদ্রোহ এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপর্যুপরি বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে না পেরে জার্মানীও ১৯১৮ সালের ১১ নবেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। এরপর বিজয়ী পক্ষ ভার্সাই চুক্তি দ্বারা জার্মান (১৯১৯ সালের জুন) এবং সেভার্সের চুক্তির মাধ্যমে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যকে ভাগ-

বাটোয়ারা করে নেয় (১৯২০ সালের আগস্ট)। সেভার্সের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মিসর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপলিটানিয়া, মরক্কো ও তিউনিস প্রভৃতি স্থানের ওপর অধিকার ত্যাগ করতে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পরাজিত সুলতান মুহাম্মাদ ষষ্ঠকে বাধ্য করা হয়। ওসমানীয়াদের আধিপত্য খর্ব করে হেজাজকে বৃটেনের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার ওপর থেকে ওসমানীয়াদের অধিকার বিলোপ করে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটভুক্ত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। সিরিয়াকে পরে ফরাসী ম্যাণ্ডেটভুক্ত করা হয়। স্মার্না ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িক ভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে রাখা হয়। কিন্তু ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ গ্রীসকে একেবারে দিয়ে দেয়া হয়। রোডস ও দার্দানেলিস দ্বীপপুঞ্জ ইতালীকে দেয়া হয়। পরে দার্দানেলিস ও বসফরাস প্রণালীকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়। ওসমানীয়ার পরাজিত সম্রাট আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এভাবে বিশাল ওসমানীয়া সাম্রাজ্য সেভার্স-এর সন্ধি অনুযায়ী কনস্টান্টিনোপল এবং আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়। পরাজিত ষষ্ঠ মুহাম্মাদ এ গ্লানিকর চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এভাবে তুর্কীর মুসলমানরা নীতিভ্রষ্ট হয়ে এক গৌরবময় ইতিহাসের কবর দিয়ে পরাজয়ের গ্লানিকর মালিকা গলায় ধারণ করে।

২.২৪ ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির দ্বিতীয় পদক্ষেপ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঐতিহাসিক ব্যালফোর (ঘটনা ও তার ফলশ্রুতি) হিসেবে জায়নবাদী ইহুদী সংগঠনসমূহের আন্তরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের প্রধানতম কারণ ছিলো। অন্যদিকে এ ব্যালফোর ঘোষণা শুধুমাত্র প্যালেস্টাইনের ইতিহাসেই নয় বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর এজন্যই একে 'কুখ্যাত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়ে থাকে। জায়নবাদীদের জন্য এ ঘোষণা ছিলো এক মহাবিজয়।

এরপর জায়নবাদীদের লক্ষ হয় ঃ

১. অন্যান্য মিত্রশক্তি কর্তৃক উক্ত ব্যালফোর ঘোষণার অনুমোদন, এবং

২. "সাইকস-পিকোঁ" চুক্তিতে প্যালেস্টাইনে যে আন্তর্জাতিক প্রশাসন প্রবর্তিত করার কথা ছিলো তার পরিবর্তে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসন চালু করা।

প্রথম লক্ষটি খুব সহজেই অর্জিত হয়। আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইতালী আভ্যন্তরীণ জায়নবাদী নেতৃবৃন্দের চাপে খুব তাড়াতাড়িই ঘোষণাটি অনুমোদন করে।

দ্বিতীয় লক্ষটি অর্জনের পথে একমাত্র ফ্রান্সের পক্ষ থেকে বাধার আশংকা ছিলো ; কিন্তু ফ্রান্সের জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ সেই আশংকা দূর করতে অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখায়। তারা ফ্রান্স সরকারের ওপর। যথেষ্ট চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সেই বাধা অতি সহজেই দূরীভূত করতে সক্ষম হয়। ফলে বৃটেন বিনা বাধায় স্যান রেমো সম্মেলনের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের ওপর 'ম্যাণ্ডেট' ক্ষমতা লাভ করে।

অত্যাধুনিক অস্ত্রবলে বলিয়ান ও বন্ধু মিত্রশক্তি পাশে থাকা সত্ত্বেও যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সরাসরি নিজে পবিত্র জেরুজালেমে ঢুকে পড়ার সাহস পায়নি—শরীফ হুসাইনের হাত ধরেই ১৯১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জেরুজালেমে পা রাখতে সাহস পায় ; অনুরূপভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইসরাঈল প্রথম মহাযুদ্ধে ওসমানীয় খিলাফতের পতন ঘটালেও এবং তাদের বন্ধু বৃটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স যুদ্ধে বিজয়ী হলেও, সরাসরি নিজেরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জেরুজালেম অধিকার করতে সাহস পায়নি। তাই ম্যাণ্ডেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাদের প্রপিতা কুচক্রী বৃটিশের হাত ধরেই তারা পবিত্র নগরী জেরুজালেমে অনুপ্রবেশ করে। এরপর শুরু হয় আর এক নতুন অধ্যায়।

❑

তৃতীয় অধ্যায়

জায়নবাদীদের চক্রান্ত ও ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

৩.১ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম

বৃটিশরা জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনের ওপর যে ম্যাণ্ডেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তার নীতি নির্ধারণেও ইহুদীরা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ এ ম্যাণ্ডেটরী শাসনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সময় একে নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদীদের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে। তাই ম্যাণ্ডেট দলিলেই বলা হয় যে, ম্যাণ্ডেটরী শাসন কর্তৃপক্ষ প্যালেস্টাইনে ইহুদী আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ অর্জনের জন্য 'জাইয়ীশ এজেন্সী'-এর সহযোগিতায় কাজ করবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলমানদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেও সে ইহুদীদের সাথে প্রকৃত বন্ধু সুলভ আচরণই করে এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে থাকে। আর এ পালন করার নাট্যমঞ্চে জায়নবাদী ইহুদী গোষ্ঠী যেমন করে তাকে নাচতে বলে ঠিক তেমনিভাবে বৃটিশরাজ নাচতে থাকে। ফলে শুধু প্যালেস্টাইনের সমস্যার সাথেই নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সাথে বৃটেন নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। সে ম্যাণ্ডেটরী শাসন ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথেই বহিরাগত ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে বাধভাঙা স্রোতের ন্যায়ই বিশ্বের বিভিন্ন দিক থেকে প্যালেস্টাইনের ওপর ইহুদী আগমনের ঢল নামে। এ সমস্ত নবাগত ইহুদী প্যালেস্টাইনের আদিবসতিদের জোরপূর্বক তুলে দিয়ে তাদের বাড়ী ঘর দখল করে নেয়। এর বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো তারা নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করলো। ফলে তখন থেকে জেরুজালেমসহ প্যালেস্টাইনের সর্বত্রই এক সন্ত্রাসের রাজ্য কায়েম হলো।

এমনিভাবে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসন প্রবর্তিত হবার পর প্যালেস্টাইন সমস্যা এক নতুনরূপ নিতে থাকে। অবৈধভাবে 'ব্যালফোর ঘোষণা' দিলেও একেবারে আইনকে বাদ দিলে চলবে কেন ! তাই বৃটিশ সরকার একটু আইনের আশ্রয় নিবার জন্য প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদীর জনসংখ্যার একটা সমতা আনার জন্যই বহিরাগত ইহুদীকে এমনিভাবে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করায়। এজন্য যে, যখন 'ব্যালফোর ঘোষণা' ঘোষিত হয় তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদীর সংখ্যা ছিল মাত্র ছাপান্ন হাজার ; অপরদিকে

সেখানে প্যালেস্টাইনী বা ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। বিশ্ব জায়নবাদী সংগঠন যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদী কুড়িয়ে এনে এনে সংঘবদ্ধভাবে (আলেয়া) প্যালেস্টাইনে অনবরত ঢুকাতে থাকে এবং সন্ত্রাস ও হত্যার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনীদের তাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করতে থাকে, তখন স্বভাবতই প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে এবং প্যালেস্টাইনীদের সংখ্যা সেখানে কমতে থাকে। এভাবে যখন ইহুদী ও প্যালেস্টাইনীদের সংখ্যার একটা সমতা এলো এবং তার পরে পরেই ইহুদীদের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়তে লাগলো তখন থেকে বৃটিশ কুচক্রীরা মনে করতে থাকে যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় এসে গেছে। ফলে সে ধীরে ধীরে ইহুদী রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করে। এদিকে কিন্তু ফ্রান্স, বৃটিশ ও আমেরিকার নির্দেশে প্যালেস্টাইনে ইহুদী আগমন অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে।

ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বয়ং বৃটিশ সরকার নিলেও তাই বলে ইহুদী সংস্থাগুলোর নেতৃবৃন্দরা বসে থাকলো না। জার্মান ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এ সমস্ত ইহুদী নেতৃবৃন্দ আধুনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে ছিলো পূর্ণ সচেতন। সমষ্টিগত যে কোনো কাজের সফলতা যে সংগঠনের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল তা তারা বেশ ভালো করেই জানতো। আর জানতো বলেই জায়নবাদী আন্দোলনের প্রথম থেকেই শক্তিশালী সংগঠন সৃষ্টির ওপর তারা অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে আসছিলো। তাই তারা পূর্ব থেকেই মাটির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের ওপর নিজেদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষিখামার গড়ে তুলতে থাকে। সদস্য সংখ্যা, জমির পরিমাণ ও কতখানি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তারই ভিত্তিতে 'মোশাভ'—'কাভূতজা' ও 'কিবুজ' স্থাপন করা হয়। সুসংগঠিত এ খামার-গুলোতে যৌথ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও যৌথ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার ভাব বৃদ্ধি করে। প্রতিবেশীদের—প্রধানত আরবদের আক্রমণ হতে ঐ যৌথ খামারগুলো রক্ষা করার জন্য জায়নবাদী ও অন্যান্য ইহুদী সংগঠন নিজেদের মধ্য থেকে বাছাই করা যুবকদের নিয়ে প্যারামিলিটারী বাহিনী গড়ে তোলে। এ বাহিনী 'হাসোমার' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ বাহিনী ইহুদী খামার গুলোর নিরাপত্তা বিধানে অত্যন্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। তবে এ বাহিনী শুধু যে ইহুদী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো তা-ই

নয়, বরং হাজার হাজার প্যালেস্টাইনের নিরীহ নাগরিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে এবং অস্ত্রের মুখে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে।

শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তারা একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে। 'কুপাত-পোলাই এরেৎজ ইসরাঈল' নামে পরিচিত উক্ত তহবীল থেকে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক প্রকল্পাদি গ্রহণ করা হতো। শ্রমিকদের চাকুরী নিশ্চিত করার জন্য এবং চাকুরী সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের জন্য তারা 'মিসরাদ-হাভদা' নামে চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য তারা 'প্যালেস্টাইন সংযুক্ত শ্রমিক সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করে। আবার সুপরিকল্পিতভাবে প্যালেস্টাইনে জমি ক্রয় করার জন্য 'ইহুদী জাতীয় তহবিল' ও 'প্যালেস্টাইন গঠন তহবিল' ছাড়াও জায়নবাদীদের নেতৃত্বে 'হে ভরাত হাকসারাত হা-ইশুভ' জমি ক্রয় সম্পর্কিত সংস্থা গঠন করে। উপরন্তু তারা Anglo-Palistine Bank-ও প্রতিষ্ঠা করে।

প্রত্যেকটি ইহুদী বসতিতে অত্যাধুনিক শিক্ষা কেন্দ্রে চিকিৎসালয়, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করার জন্য বিবিধ দেশ থেকে আগত ইহুদীদের ভাষার ওপর জোর না দিয়ে হযরত মূসা আ.-এর প্রতি নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থ 'তাওরাতের' ভাষা সেই 'হিব্রু'-কে-ই শিক্ষা ও অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকরী প্রচেষ্টা চালানো হয়। মৃত প্রায় একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু সহজ সাধ্য ছিলো না ; তবুও জায়নবাদীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে তাও তারা করতে সক্ষম হয়।

১৯২০ সালে শ্রমিকদের জন্য 'হিস্তাদ্রুত' নামে ট্রেড ইউনিয়ন জায়নবাদীরা প্রতিষ্ঠা করে। পরে এ ইউনিয়ন প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনকারী ইহুদীদের এবং ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির পরে ইসরাঈলের অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। সাধারণ অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন বলতে আমরা যা বুঝি 'হিস্তাদ্রুত' তা থেকে ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু শ্রমিকেরাই যে এর সদস্য হতে পারতো তা-ই নয়; এর সংবিধান অনুযায়ী যে কেউ জীবিকার জন্য অন্যের শ্রমের ওপর নির্ভর না করে নিজেই পরিশ্রম করে সে-ই হিস্তাদ্রুতের সদস্য হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষি শ্রমিক ও কারখানা শ্রমিক ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এর সদস্য হতে পারতো। যেমন সকল শ্রেণীর সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীবৃন্দ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, লেখক, গায়ক, শিক্ষক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সংগঠনের সদস্যদের স্বাস্থ্য-

বীমা, বাসস্থানের সুযোগ সুবিধা, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও আরো নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দান করে। শ্রমিকদের নিযুক্তি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে জায়নবাদীদের এ ট্রেড ইউনিয়ন 'দরকষাকষি সংস্থা' হিসেবে কাজ করতে থাকে। এর ব্যবস্থাপনায় বহু আইনজীবীদের সমবায় 'হামাশ বির', সমবায় বাজার 'তেনভা' ও অনেক শিল্প-কারখানা প্যালেস্টাইনের বুকে জায়নবাদীরা গড়ে তোলে। 'সোলেল বোনেহ' নামে পরিচিত এর একাংশ রাস্তা-ঘাট ও দালান-কোঠা তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিলো। এর অপর অংশ 'জীম' নামে পরিচিত। এ জীমের ওপর সামুদ্রিক পরিবহনের যাবতীয় তদারকীর দায়িত্ব অর্পিত ছিলো।

ইহুদী বসতিগুলোতে এরূপ বহুবিধ সংস্থা গড়ে উঠলেও সমগ্র প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের কার্যকলাপ সমন্বিত করার জন্য এতদিন কিন্তু কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'ভাআদ হাযমানী' নামে এরূপ একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এটা একটি 'অন্তবর্তীকালীন সংসদ' হিসেবে জায়নবাদীদের কাজ করতে থাকে। এরপর জায়নবাদী আন্দোলনের হারৎজেল উত্তর প্রধান চেইন ওয়াইজম্যানের নেতৃত্বে ১৯২০ সালে 'ভাআদ লিউমী' নামে একটি 'জাতীয় সংসদ' গঠিত হয়। এ জন্মের পর থেকেই প্যালেস্টাইনে ইহুদী সমাজের সংসদ রূপে কাজ করতে থাকে।

প্যালেস্টাইন ম্যাণ্ডেট সংক্রান্ত দলিলের ৪ ধারায় বলা হয়েছিলো যে, ইহুদীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী 'ইহুদী সংস্থার' সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। 'ব্যালফোর ঘোষণায়' প্যালেস্টাইন ইহুদীদের হাতে প্রদান করা হয়েছে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা প্যালেস্টাইনী-আরব, এমন কি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিও তাদের চিরাচরিত স্বভাবমাফিক ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার শুরু করে। এতদিনে নিরীহভাবে বসবাসকারী প্যালেস্টাইনী ইহুদীগণও তাদের সাথে যোগ দেয়। যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের সাথে এতদিন তারা অনুগত নাগরিক হিসেবে বসবাস করছিলো, এখন থেকে তারা দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের দাবীদারের মত আচরণ করতে লাগলো। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি লুই ব্রাণ্ডাইস প্যালেস্টাইনে ইহুদী গোষ্ঠীর পর্যবেক্ষক হিসেবে আসেন। একজন প্রখ্যাত জায়নবাদী নেতা হিসেবে প্যালেস্টাইনে ইহুদী স্বার্থ তদারক করাই ছিলো তার এ সফরের মূল উদ্দেশ্য। বৃটিশ সামরিক প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল লুই বোল্স-এর নিকট দাবী করেন যে,

সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্ত ও অধ্যাদেশ কার্যকরী করার পূর্বে জায়নবাদী সংস্থার অনুমোদন অবশ্যই লাভ করতে হবে। লুই ব্রাণ্ডাইসের এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার জেনারেল বোল্‌স-এর ব্যক্তিত্বের ওপর চরম আঘাত হানে। তাই তিনি উক্ত দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ব্রাণ্ডাইস ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং ভীতিপ্রদর্শন করে বলেন যে, বিষয়টি বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালনের গোচরীভূত করা হবে।

হিব্রু ভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, মুদ্রা ও অন্যান্য সরকারী দলিলপত্রে হিব্রুভাষা ব্যবহার ছাড়াও 'এরেৎজ ইসরাঈল' (ইসরাইল রাষ্ট্র) শব্দ ব্যবহার জায়নবাদী সংস্থার সদস্যদের বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুযোগ—এ রকমের হাজারো রূপ দাবী-দাওয়া জায়নবাদীরা পেশ করতে থাকে। সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার মুখে বৃটিশ সরকার এর অনেকগুলো মেনে নিতেও বাধ্য হয়। এ সকল দাবীর প্রত্যেকটি মেনে নেয়ার জন্য জাইয়নবাদী নেতৃবৃন্দ প্রচেষ্টা চালায়। বৃটেন ও আমেরিকার ইহুদী ও ইহুদী ঘেষা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে জায়নবাদীরা প্যালেস্টাইনের সামরিক প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখলে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে জেনারেল লুই বোলস বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট লিখিত এক প্রতিবেদনে অভিযোগ করেন ঃ

"My own authority and that of every department of my Administration is claimed or impinged upon by the Zionist Commission, and I am definitely of the opnion that this state of affeirs can not continue without great danger to the public peace and to the prejudice of many administration."

কিন্তু মিঃ বোল্‌স সম্ভবতঃ মোটেই জানতেন না যে, শুধু বৃটেনই নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্রান্সও জায়নবাদী ইহুদীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আর তাই ইসরাঈল এমন কি আজও কোনো শক্তিকেই তোয়াক্কা না করে একের পর এক সম্মিলিত জাতিসংঘের সনদ লংঘন করে চলেছে অব্যাহত গতিতে। তার গতি যে শুধুমাত্র প্যালেস্টাইনের ভূ-খণ্ডেই সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এর বাইরেও অনেক অনেক দূর পরিব্যাপ্ত তাও নিশ্চয়ই তিনি জানতেন না। তাই তিনি কোনটা ন্যায় বা কোনটা অন্যায়, তা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—লুণ্ঠনকারীদের মুখে একটু লাগাম পরাতে দুঃসাহস করছিলেন।

৩.২ ভার্সাই সন্ধিতে জায়নবাদীদের প্রস্তাবিত রাজ্যের সীমানা

যাই হোক, জায়নবাদীগণ প্রথমতঃ চেষ্টা চালায় প্যালেস্টাইনে একটু পা রাখতে ; আর তা যখন তারা ইতিমধ্যেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তখন তারা বৃহত্তর লক্ষবস্তুর দিকে বেপরোয়াভাবে ধাবিত হতে থাকে। ১৯১৯ সালে প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে জায়নবাদীরা যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতে তাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের আপাততঃ একটা পূর্ণ সীমানা দেয়। পেশকৃত উক্ত সীমানাতে সমগ্র প্যালেস্টাইন ছাড়াও (ক) হারমন পর্বতে জর্দান নদীর উৎপত্তিস্থল এবং লিতানী নদীর দক্ষিণ অংশসহ দক্ষিণ লেবানন ; (খ) ইয়ারমুক নদী, কুনেতরা শহর ও গোলান হাইটসহ দক্ষিণ-পশ্চিমে সিরিয়া, (গ) জর্দান উপত্যকা, ডেডসী এবং আম্মানের পশ্চিম অঞ্চল থেকে আকাবা পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগ এবং আল-আরিশ থেকে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে।

৩.৩ জায়নবাদীদের মূল পরিকল্পনা

কিন্তু এটাই তাদের আসল সীমানা নয় ; জায়নবাদীরা সমগ্র বিশ্ব-রাষ্ট্রের ওপর একটি 'ভৌতিক সরকার' কায়েম করতে চায়। গুপ্ত ইহুদীবাদী আন্দোলনের কাগজপত্র ঘেটে জানা গেছে যে, ইহুদী পণ্ডিতেরা কপটতার আশ্রয় নিয়ে সমগ্র বিশ্বজয়ের একটি নীল নকশা তৈরি করে। ইতিহাসের বিবর্তনের সাথে সাথে এ মূল পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করার বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং এর বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায়। ইহুদী পণ্ডিতেরা কূটকৌশলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোটা বিশ্বকে ইহুদীবাদের পদানত করার জন্য সাপের ন্যায় ধূর্ত-কৌশল অবলম্বন করার জন্য সাপকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। উক্ত সাপের মাথা জায়নবাদীদের পরিকল্পনা রচনাকারীদের এবং এর দেহ সমগ্র ইহুদী জনতার প্রতীক। ইহুদীবাদ (Zionism) প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগঠন কায়েম করা হয়, তার সংগঠন ও নেতৃত্ব গোপন রাখা হয়। এমন কি সাধারণ ইহুদীরাও তা জানতো না।

হুবহু পরিকল্পনা মাফিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য এ প্রতীক সাপের মাথা জায়ন পাহাড় পর্যন্ত পৌছবে এবং এর আগে সে ইউরোপের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে এ মহাদেশটিকে শক্ত করে ঘেরাও করে ফেলবে (ইতিমধ্যে ফেলেছেও) এবং এরপর ক্রমান্বয়ে গোটা বিশ্ব তার আবেষ্টনীর আওতায় চলে যাবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক প্রাধান্য কায়েম করে। এর মাধ্যমেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটা ইহুদী

জাতির প্রতি বিজ্ঞ ইহুদী মুরব্বীদের নির্দেশ ছিলো। উক্ত Protocol-এ আরো বলা হয়েছে, সাপের মাথাটিকে জায়ন পাহাড়ে ফিরে যেতে হলে ইউরোপের সকল সর্বভৌম শক্তিসমূহকে খর্ব করতে হবে। আর্থিক সংকট সৃষ্টি ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে এসব সার্বভৌম রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে হবে। আর নৈতিক অধঃপতন ঘটানোর জন্যই ফরাসী বা ইতালীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ ধারণ করে ইহুদী যুবতী রমণীগণ সহায়তা করবে। জাতীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার সুনিশ্চিত হাতিয়ারই হচ্ছে যুবতী নারীর দল।

সাপটি যেসব দেশ অতিক্রম করেছে সেসব দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হলেও জার্মান দেশ প্রকৃতপক্ষে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন। জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও সুযোগ দেয়া হচ্ছে। রাশিয়ায় এ সাপের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পূর্বপর্যন্ত এ দুটি দেশ আর্থিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কারণ সাপের (১৯০৫ সালে) তৎপরতা রাশিয়াতেই কেন্দ্রভূত। প্রফেসর নাইলাস "The Protocol of the Learnd Elders of Zion'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে ১৯০৫ সালে উপরোক্ত তথ্যটি দেয়। নকশাতে সাপের পরবর্তী গন্তব্যস্থল চিহ্নিত করা হয়নি। কিন্তু কতকগুলো 'তীর চিহ্ন' থেকে বুঝা যায় যে, সাপটির গতিমুখ মস্কো, কায়েফ ও ডেসা এবং আরো দক্ষিণপূর্ব অর্থাৎ মুসলমান দেশগুলোর দিকে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে ইহুদীদের বিপ্লব ঘটানোর অনেক আগে বিজ্ঞ ইহুদী মুরব্বীরা উপরোক্ত উপদেশপূর্ণ নকশাটি তৈরি করেছিলো।

৩.৪ জায়নবাদীদের বিস্ফোরক ঘোষণা

যাই হোক, প্যালেস্টাইনে বৃটিশের ম্যাণ্ডেটরী শাসনামলে জায়নবাদীদের স্বার্থ এবং আরবদের স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক ছিলো না। জায়নবাদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থ যে আরব ও প্যালেস্টাইনীদের সীমাহীন দুর্গতি, তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। তাই প্রথম থেকেই দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম সংঘাত দেখা দেয়। গোটা ম্যাণ্ডেট শাসনামল এ ধরনের সংঘাতে পরিপূর্ণ। যখনই কোনো সংঘাত শুরু হয় তখনই বৃটিশ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যাপৃত প্যালেস্টাইনীদের ধোঁকা দিবার জন্য নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে ইহুদীদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ মজবুত করে তুলতে সহায়তা করে। তাই তারা মিছামিছি

ব্যাপারটি অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত পরিষদ গঠন করে। এমনিভাবে ১৯২০ সালে 'পালিন কমিশন,' ১৯২১ সালে 'হেক্রোফ্‌ট কমিশন, ১৯৩০ সালে 'শ কমিশন', ১৯৩৭ সালে 'পীল কমিশন' এবং ১৯৩৮ সালে 'উডহেড কমিশন' গঠন করে প্যালেস্টাইনে পাঠায়। কিন্তু ইহুদী ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত প্যালেস্টাইনের বৃটিশ প্রশাসনের সংকট কেটে গেলে তদন্ত কমিশনের প্রস্তাবাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। অপরদিকে আরডিউইংগেটের ন্যায় কিছু সংখ্যক বৃটিশ সামরিক অফিসার প্রকাশ্যভাবে ইহুদীদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে তোলে। কিন্তু প্যালেস্টাইনী আরবরা একান্ত বাঁচার তাগিদেই বিদ্রোহ শুরু করলে বৃটিশ সরকার তা দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। প্যালেস্টাইনের ভূ-খণ্ডে প্যালেস্টাইনী ও ইহুদীদের ওপর এরূপ 'অছি' সেজে বৃটিশ সরকার যেভাবে বিমাতা সুলভ আচরণ করতে শুরু করলো এতে প্যালেস্টাইনীরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক হতাশার মধ্যে পড়ে।

৩.৫ 'লীগ অব নেশন'-এর দুয়ারে প্যালেস্টাইনীরা

অপমানিত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত প্যালেস্টাইনী আরবরা তাই বিশ্বের শান্তির প্রতীক 'লীগ অব নেশনের' নিকট এর প্রতিকার চেয়ে প্রার্থনা জানালো। কিন্তু সেখানেও ইঙ্গ-মার্কিন ইহুদীদের চরম কর্তৃত্ব। 'লীগ অব নেশনের' নিকট ন্যায্য বিচার পেলো না তারা। তাই জোরজবরদস্তিমূলক অন্যায় আচরণের প্রতিকার চেয়ে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য প্যালেস্টাইনী-আরবরা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিলো, কিন্তু ইঙ্গ-ইহুদী যৌথ বাহিনী প্রাণনাশ করে হলেও নৃশংসভাবে তা প্রতিহত করে। ইহুদীদের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজার 'স্বেচ্ছাসেবক' নিয়োগ করা ছাড়াও প্যালেস্টাইনে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ এ উন্নীত করা হলো। ফলে প্যালেস্টাইনী আরব ভাইদের রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী কয়েকটি আরব দেশ হতে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক আসলেও এ সংঘর্ষে আরবদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। মাত্র ৮০জন ইহুদী ও ২৮জন বৃটিশ সৈন্য এ সংঘর্ষে নিহত হয়। অপরপক্ষে আরবদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিলো আট শতাধিক।

৩.৬ প্যালেস্টাইনী আরবদের পরাজয়ের কারণ

যুদ্ধে আরবদের এরূপ অধিক সংখ্যক প্রাণের ক্ষয়ক্ষতির কারণ অবশ্য বহুবিধ ছিলো ঃ নীতিভ্রষ্টতা, শিক্ষা থেকে সরে থাকা, ইহুদীদের গোপন তৎপরতার ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলতা, যারা মুক্তি সংগ্রামকে সুষ্ঠু

ও সঠিকভাবে পরিচালনা করবে তাদের শহরে গিয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকা, সংগঠনের অভাব, ফ্রিম্যাসন সৃষ্ট আরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ইত্যাদি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান আরবদের পতনের মূল কারণ। তাছাড়া প্যালেস্টাইনী আরব ও ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মধ্যে বিরাট গুণগত পার্থক্যও ছিল। প্যালেস্টাইন সমস্যার বিবর্তনে এ পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জায়নবাদী আন্দোলন এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো হতে আগত আশকে নাজী ইহুদীগণ। নেতৃত্বদানকারী প্রায় প্রত্যেকেই ছিলো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। আধুনিক সমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে তারা ছিলো পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। যুক্তি ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে সমাজের সমস্যা সমাধান করার মত যোগ্যতা ও মনোভাব তাদের ছিলো। এ সকল ইহুদী নেতৃবৃন্দের অনেকেই পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কৃতিছাত্র ছিলেন। ফলে যে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা অনুধাবন করার এবং যে কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের সমস্যাগুলো যোগ্যতার সাথে তুলে ধরার ক্ষমতা তাদের ছিলো। এ প্রসঙ্গে বহু ভাষাবিদ ইহুদী নেতা মোশে শারেট ও আবা ইবানের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি।

অন্যদিকে সামান্তাতান্ত্রিক আরব সমাজে সামন্তরাই নেতৃত্ব দান করে। আধুনিক শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এ সমস্ত সামান্তগণ মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক ছিলো। আরব সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ফলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা হুসাইনী ও নাশাশিবী বংশের মধ্যে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরোধের কথা উল্লেখ করতে পারি। আন্তঃআরব সম্পর্কের প্রশ্নেও প্যালেস্টাইনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য প্যালেস্টাইন-আরব ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করে। প্যালেস্টাইন সিরিয়ার অংশমাত্র অথবা এর পৃথক কোনো সত্ত্বা আছে—এ প্রশ্নে প্যালেস্টাইনের নেতৃবৃন্দ একমত হতে পারেননি। তাছাড়া আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিলো না। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হতে একটি প্রশ্নকে বিবেচনা না করে অনেক সময় ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে। জেরুজালেম নগরীর মেয়রের পদ লাভ করার জন্য নাশাশিবী বংশ বৃটিশের সমস্ত কার্যকলাপকে সমর্থন করতে থাকে। এর প্রধান কারণ, এ বংশের নেতৃস্থানীয় মাথাগুলো ফ্রিম্যাসন-এর শিকারে পরিণত হয়। ফলে এরপর থেকে এ বংশ প্যালেস্টাইনী আরবদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদীদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করতে থাকে।

বিখ্যাত হুসাইনী বংশের সম্মানিত সদস্য ও এককালে জেরুজালেম নগরীর মেয়র মূসা কাযিম আল হুসাইনী সামান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে ফিলিস্তিনী বা প্যালেস্টাইনী আরবদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জায়নবাদী কার্যকরী সংসদের সদস্য এইচ. এম. কারভাস্কির নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করার পর থেকেই এটা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এরপর থেকে তিনি জায়নবাদী ইহুদীদের সাথে সমঝোতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করেন।

অন্যদিকে আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক ছিলেন ধর্মীয় নেতা। এদের মধ্যে পরবর্তীকালের জেরুজালেমের মুখ্য মুফতী হিস্বেবে আখ্যায়িত কামাল আল কাসসাব-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা এদের থাকলেও আধুনিক সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিলো যেমন অগভীর, সেই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাদের পদ্ধতিও ছিলো মধ্যযুগীয়। এ বিরাট বৈষম্যের জন্য প্যালেস্টাইনী আরবরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও প্রথম থেকেই সুবিধা করতে পারেনি।

৩.৭ আবার বিদ্রোহ ও বৃটিশ বাহিনীর অত্যাচার

কিন্তু তাই বলে প্যালেস্টাইনের মুক্তি পাগল সাধারণ মানুষ হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলো না। তারা প্রাণকে বাজি রেখে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ১৯২০ সালে, ১৯২৮ সালে, ১৯২৯ সালে এবং ১৯৩৬ সালে জায়নবাদী সন্ত্রাসবাদী দলের ও তার দোসর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের রাজকীয় বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্যালেস্টাইনী আরবদের এ মারমুখী তৎপরতা রোধ করার জন্য ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে বৃটিশ সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে এক লাখে উন্নীত করে। এরপর তারা জরুরী আইন প্রয়োগ করে সমগ্র প্যালেস্টাইনকে এক বন্দী শিবিরে পরিণত করে। নির্যাতনের শিকারে নিপতিত হলো এক লাখ প্যালেস্টাইনী আরব, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আত্মাহুতি দিলো পনেরো হাজার প্যালেস্টাইনী যুবক ও নিরীহ জনতা ; আহত হলো ত্রিশ হাজারেরও অধিক।

৩.৮ বৃটিশ সরকারের নতিস্বীকার ও 'প্যাসফিল্ড' শ্বেতপত্র প্রকাশ

প্যালেস্টাইনে তখন বেশ গোলমালে পরিস্থিতি। সামরিক চক্র কোনো ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না প্যালেস্টাইনের মুক্তি পাগল জনগোষ্ঠীকে। তাই বৃটিশ সরকার নবগঠিত কমিশনকেও পাঠালেন প্যালেস্টাইনে। ১৯৩০

সালের শ' কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে স্যার জন হোপসিম্পসনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিরাজমান পরিস্থিতিতে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে প্রবেশ সীমিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার 'প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে। ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের জন্য আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা এবং ইহুদী নয় প্যালেস্টাইনের এ শ্রেণীর অধিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সরকারের দায়িত্ব বলে যে প্রচারণা চালানো হয়, তা খণ্ডন করে শ্বেতপত্রে বলা হয় ঃ "This is a conception which His Majesty's Government have always regarded as totally erroneous."

৩.০৯ ইহুদী ও প্যালেস্টাইনীদের আপসে আনার জটিল প্রচেষ্টার ব্যাখ্যা

এ ঘোষণা প্রকাশের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্র ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং বৃটিশ বাহিনী বৃটিশ সরকারী কর্মচারী ও প্যালেস্টাইনী জনগণের ওপর এক বর্বরোচিত হামলা চালায়। এভাবে চার্চিল এ্যামেরী, বল ডুইন ও অস্টেন চেম্বারলেনের ন্যায় বৃটিশ রাজনীতিবিদদের সমর্থনে জায়নিস্ট গোষ্ঠী উক্ত শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড নতিস্বীকার করে এক পত্রে চেইম ওয়াইম্যানকে জানিয়ে দেন যে, ইহুদীগণ বিনা বাধায় প্যালেস্টাইনে প্রবেশ অব্যাহত রাখতে পারে। তবে ১৯৩৪ সালে ৪০,০০০ এবং ১৯৩৫ সালে ৬২,০০০ এর বেশি যেন না যায়। আবার ১৯৩৫ সালে প্যালেস্টাইনী আরব নেতৃবৃন্দ অন্যান্য দেশের মত নির্বাচিত সংসদের দাবী করলে আবারো ইহুদীদের চাপের মুখে বৃটিশ পার্লামেন্ট এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়, ফলে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। এ সমস্যার কোনো একটি সমাধান বের করার ছলে বৃটিশ সরকার লোক দেখানোর জন্য ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে লণ্ডনে একটি ত্রিদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। আরব পক্ষে প্যালেস্টাইনী আরবদের প্রতিনিধি ছাড়া বিভিন্ন আরব দেশের প্রতিনিধিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এত প্রবল ছিলো যে, তারা একত্রে আলোচনা করতে অসম্মত হয়। ফলে উক্ত সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩.১০ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ম্যাকডোনাল্ড শ্বেতপত্র

এ ব্যর্থতা এবং ঘনায়মান আর একটি বৃহত্তম সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে অতি সত্বর একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে তৎপর

হয়। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত ম্যাকডোনাল্ড শ্বেতপত্র উক্ত তৎপরতারই সোনালী ফসল। এ শ্বেতপত্রে মূলত প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন এবং ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক জমি কিনার ব্যাপারে নতুন নীতি প্রকাশ করা হয়। প্রথমোক্ত সমস্যা সম্বন্ধে বলা হয় যে, আগামী পাঁচ বছরে—পঁচাত্তোর হাজার ইহুদী প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে পারবে। প্রত্যেক বছর দশ হাজার করে ইহুদী আগমন করবে বলে মন্তব্য প্রকাশিত হয় এবং আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করার শর্তে অতিরিক্ত আরো পঁচিশ হাজার ইহুদী প্রবেশ করতে পারবে—একথাও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আরো মন্তব্য করা হয় যে, পাঁচ বছর পরে প্যালেস্টাইনে ইহুদী আগমন আরবদের সম্মতির ওপর নির্ভর করবে। অবৈধভাবে ইহুদী আগমন বন্ধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। জমি কেনা-বেচা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিশন মত প্রকাশ করে যে, উচ্চতর জন্মহারের দরুন আরব জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আরব কৃষকদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। একটি বড় রকমের ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি রোধ করতে হলে কোনো কোনো এলাকায় কৃষকদের জমি—কেনা নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বিশেষ বিশেষ এলাকায় বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বলে মন্তব্য করা হয়। এ সুপারিশের আলোকে ১৯৪০ সালে জমি হস্তান্তর আইন পাশ করা হয়। এ আইনে দেশের জমি তিনটি এলাকায় ভাগ করা হয়। এর মধ্যে প্রথম (ক) এলাকায় জমি বেচা-কেনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, (খ) দ্বিতীয় এলাকায় জমি হস্তান্তর সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং (গ) বাকী এলাকায় জমির বেচা-কেনা স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে উল্লেখ করা হয়।

উপরোক্ত শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বার্থ সামান্য পরিমাণে রক্ষার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মহল রাতারাতি মুসলিম দরদী হয়ে গিয়েছিলো। সে তার এ প্রয়াসকে আরব জাহানের সামনে 'টোপ' হিসেবে ফেলে রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে তার স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য আরবদের শান্ত রাখার চেষ্টা চালায়। তাদের এ প্রতারণা তারই একটি পদক্ষেপের অংশ।

৩.১১ ইহুদীদের বলয় পরিবর্তন ও তার কারণ

স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী চক্র তার জন্মদাতা বৃটেনের একটু স্বার্থের খাতিরে মুসলমানদের প্রতি এতটুকু প্রয়াসও সহ্য করতে পারেনি। তাই এ বেঈমান জাতি তার মুক্তিদাতা বৃটেনের মুখে পদাঘাত করে উদীয়মান 'সুপার পাওয়ার' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ প্রসঙ্গে Alan R. Taylor-এর মন্তব্য হলো ঃ "Later in the

war, however, many zionists began to feel that Bretain was losing her position as a first-class power and they therfore turned to the United States on the primary source of Gentile super-support for Zionism. In the part, America had proves to be a valuable source of financial assistance to the movement laut during the war it also emerged as the new centre from which political help was to be sought." এ থেকে প্রমাণিত হয় ইহুদী জাতির কৃতজ্ঞতা ও নীতিবোধ বলতে কোনো কিছু নেই। শুধু স্বীয় স্বার্থের পিছনেই এরা ধেঁয়ে চলতেই চায়।

৩.১২ বিল্টমোর কর্মসূচী ঘোষণা

এরপর থেকে জায়নবাদীরা ১৯৩৯ সালের 'ম্যাকডোনাল্ড শ্বেতপত্রে'র বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা আমেরিকান সরকারকে বৃটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এরপর জায়নবাদীরা ১৯৪২ সালের ১১ মে নিউইয়র্কে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে কতকগুলো প্রস্তাব পাশ করে। এ প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ঃ (ক) অনতিবিলম্বে সমগ্র প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; (খ) একটি ইহুদী সেনাবাহিনী গঠন ; (গ) ১৯৩৯ সালের 'ম্যাকডোনাল্ড শ্বেতপত্র' বাতিল করণ ; এবং (ঘ) প্যালেস্টাইনে ইহুদী আগমন সংক্রান্ত দায়িত্ব ইহুদী এজেন্সীর (Jewish Agency) ওপর ন্যস্তকরণ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সম্মেলন নিউইয়র্কের 'Biltmore Hotel'-এ অনুষ্ঠিত হয় বলে গৃহীত প্রস্তাবাবলী 'বিল্টমোর কর্মসূচী' নামে পরিচিত।

পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ বিশ্বাসঘাতকতা করার দরুন যে সকল ইহুদী ঐ সমস্ত দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়, তারা আশ্রয়হীন্ হয়ে পড়ে। জায়নবাদীগণ সংঘবদ্ধভাবে ঐ সমস্ত ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে আনতে থাকে। এভাবে এ জাইয়নবাদীরা শ্বেতপত্রে নির্ধারিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যক ইহুদীকে জাহাজে করে প্যালেস্টাইন ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করানো অব্যাহত রাখে।

৩.১৩ বৃটেন আবার আরবদের দুয়ারে

এতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্ব ইহুদী সংস্থাসমূহকে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আর এর প্রতিদানে সে মুসলমানদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদীরূপ একটি বিষবৃক্ষকে প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গিয়ে মুসলমানদের বুকের ওপর রোপণ করে দেয়। শুধু রোপণ

করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তাকে রীতি মত সার-মাটি ও নিয়মমত সেচ দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করে তুলতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে বৃটেন আবার এক বিরাট সমস্যায় পড়ে। এ সময় জার্মানের লৌহমানব হিটলারের ভয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা বৃটিশ সাম্রাজ্য সংরক্ষণের জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাই সে ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইনে অতিরিক্ত ইহুদী প্রবেশ প্যালেস্টাইনী আরবদের অনুমতি সাপেক্ষে রাখে। বৃটেনের এতটুকু ন্যায়নীতি পালন সন্ত্রাসবাদী ইহুদী গোষ্ঠী সহ্য করতে পারেনি। তাই সে তার প্রপিতা বৃটেনের মুখে দু' লাথি মেরে দিয়ে উদীয়মান পরাশক্তি আমেরিকার কোলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফলে বৃটেন তার অবৈধ সন্তানটির উগ্র আচরণে মনে একটু ব্যথা পায় আর এজন্য সে এখন থেকে প্যালেস্টাইন ইহুদীকরণের ব্যাপারে কিছুটা নিয়মতান্ত্রিকতার আশ্রয় নেয়াব চেষ্টা চালায়। আমেরিকার বলে বলিয়ান হয়ে জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ এদিকে বৃটেনের উক্ত প্রচেষ্টা মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দেবার জন্য এক নৃশংস পথ অনুসরণ করে। তারা অতি নাটকীয়তার সাথে কয়েকটি ইহুদী যাত্রীবাহী জাহাজ (বৃটেনকে জব্দ করার জন্য) নিজেরাই সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত করে দেয়। এভাবে কুচক্রী ইহুদী গোষ্ঠী বৃটেনকে বিশ্বের সামনে অপরাধী সাব্যস্ত করে। ইহুদীদের এরূপ দুঃসাহসিকতা দেখে আমেরিকান সরকার ভাবলো, নব অনুরক্ত এ ইহুদী জাতকে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করলে সে সুন্দর ফল পেতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমেরিকান সরকার জায়নবাদী নেতাদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয় এবং প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দা প্যালেস্টাইনীদের সন্ত্রাসের মুখে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুীদের ভিতর শক্তিশালী গোপন সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বোতভাবে সাহায্য করে।

এমন সময় এশিয়ার পরাশক্তি জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমেরিকার নৌঘাটি 'পার্লহারবারের' ওপর বোম্বিং করলে আমেরিকা দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং আণবিক বোমার মাধ্যমে জাপানকে ধ্বংস করার জন্য প্রমাণিত দুঃসাহসিক ইহুদী জাতকে আমেরিকা বেছে নেয় এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য মার্কিন পরাশক্তি একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। এ মানব বিধ্বংসী পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব হাতে তুলে নেয় একজন ইহুদী বৈমানিক ; নাম তার 'ক্লাড এথার্লী'। হিরোশিমা ও নাগাশিকিকে একটি প্রাণহীন বিধ্বস্ত শহরে পরিণত করে এ কুখ্যাত দুঃসাহসিক ইহুদী বৈমানিক। জাপান শহর দুটির মাটি তামায় পরিণত করে দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্তব্ধ করে দেয় ইহুদী বৈমানিকের নিক্ষিপ্ত ঐ

বোমাটি। বিশ্ব প্রমাদ গুণলো এবং একটা শিহরণ তার ওপর দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানির মত চলে যাবার সাথে সাথে অসাড় হয়ে পড়লো গোটা বিশ্ব।

জায়নবাদীদের চেলা বৈমানিক ক্লড এথার্লীর এরূপ একটি জঘন্যতম বর্বরচিত কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হবার পর চারিদিকে ইহুদী বিদ্বেষের আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠলো। অন্যদিকে বৃটেন হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া ইহুদী জাতের অন্তর্ঘাতি কার্যকলাপের জন্য নিয়তই ভীত সন্ত্রস্ত থাকলো। আবার আমেরিকা নবাগত ফন ব্রাউন (প্রথম রকেট 'এ্যাপোলো-ফাস্ট' তৈরি করেন), ডঃ স্লোটন (আণবিক বোমা আবিষ্কারক), এবং আলবার্ট আইনস্টাইনের মত ইহুদী বৈজ্ঞানিকদের শক্তি হাতে পেয়ে নিজেদেরকে অত্যন্ত ধন্য মনে করলো। মনোতুষ্টির মাধ্যমে তাদের হাতে রাখার জন্য সবরকম ন্যায়নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে হলেও বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল ইহুদীর মন যোগানোর চেষ্টা করতে থাকে। এরপর থেকে শুধু অর্থনীতির দিক থেকেই নয় ; বরং আমেরিকার রাজনীতির ওপরও ইহুদীদের প্রভাব গভীরতম হয়ে ওঠে। ফলে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে নিজস্ব একটা আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হলো।

৩.১৪ জায়নবাদীদের মধ্যে 'সন্ত্রাসবাদ' নীতি হিসেবে গৃহীত হয়

এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই জায়নবাদীদের মধ্যে 'সন্ত্রাসবাদ' নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। জাবোটিনস্কির নেতৃত্বে একদল জাইয়নবাদী ট্রান্স-জর্দানকে ব্যালফোর ঘোষণার আওতায় আনবার জন্য আন্দোলন শুরু করে। শক্তিতে বিশ্বাসী এ দল 'সংশোধনবাদী' নামে পরিচিত। ইসরাঈলী প্রধান মন্ত্রী (১৯৮২) মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে অন্য একটি সন্ত্রাসবাদী দল 'ইরগুন ভাইলিউমী' (Ergun Zvaileumi) সংক্ষেপে 'ইরগুন' নামক চরম সন্ত্রাসবাদী দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পোল্যাণ্ড থেকে আগত ইহুদী আব্রাহাম স্টার্নের নেতৃত্বে আর একটি দল, যা 'স্টার্নের বেপরোয়া দল' নামে পরিচিতি লাভ করে তাও আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া ইহুদী সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষামূলক আধা-সামরিক বাহিনী 'হাগানা'-ক্রমে একটি আক্রমণাত্মক বাহিনীতে পরিণত হয়। 'বিল্টমোর' কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৪৩ সাল থেকেই উপরোক্ত দলগুলো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা শুরু করে। ১৯৪৪ সালে তারা বৃটিশ হাইকমিশনার স্যার হ্যারল্ড ম্যার্কসাইকেলের জীবন নাশের বৃথা চেষ্টা করে। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে কায়রোয় অবস্থানরত মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড মোনকে (Lord Moyne) এরা হত্যা করে। ১৯৪৪

সালের ১৭ তারিখে কমন্সসভায় এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মন্তব্য করেন যে, মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ইহুদীদের দাবী-দাওয়া সমর্থন করা সত্ত্বেও জায়নবাদীগণ যে ধরনের সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছে তা নাৎসী বর্বরতা ও নৃশংসতাকেও ম্লান করে দিচ্ছে। জায়নবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সন্ত্রাস-বাদীদের সমূলে উৎখাত করা একান্ত প্রয়োজন। মূলত এ সময় বৃটেন ইহুদী কুচক্রীদের সন্ত্রাসবাদের নিকট অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব ইউরোপে ইহুদী সমস্যার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। হিটলারের ইহুদী বিরোধী নীতির ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা বিভিন্ন আশ্রয়-শিবিরে অবস্থান করছিলো। তদুপরি পূর্ব ইউরোপের ওপর বামপন্থী ইহুদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ সমস্ত দেশেও ডানপন্থী ইহুদীদের একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে ইহুদী বিরোধী মনোভাব বা আন্দোলন এ সমস্ত দেশে নতুন কোনো ব্যাপার ছিলো না ; অতীতে এ ধরনের ঘটনার ফলে খুব কমসংখ্যক ইহুদীই দেশ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু এখন এদের দুরবস্থাকে মূলধন করে জায়নবাদীরা এদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে গিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে প্রয়াস পায়, যাতে তাদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্বরান্বিত হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জায়নবাদীরা হাজার হাজার ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করাতে থাকে।

৩.১৫ হ্যারি ট্রুম্যানের নির্বাচন ও তাঁর সরকারের ওপর ইহুদী প্রভাব

জায়নবাদীদের কড়া সমর্থক হ্যারি ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইহুদীরা তাদের লক্ষ অর্জন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। বিশেষত এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের দাবীর সমর্থনে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। ১৯৪৪ সালের নির্বাচনে 'ডেমোক্র্যাটিক' ও 'রিপাবলিকান'—উভয় দলই মার্কিন ইহুদীদের সমর্থন আদায়ের জন্য তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় প্যালেস্টাইনে অবাধ ইহুদী প্রবেশ ও একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নিম্ন ও উচ্চ পরিষদে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদী গমন ও একটি ইহুদী আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিন সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তাছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর বড় বড় শহরের মেয়র, ব্যবসায়ী, সম্পাদক, অধ্যাপক এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা পৃথক পৃথক বিবৃতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী করতে থাকে।

৩.১৬. এ্যাংলো-আমেরিকান রিপোর্ট

এরপর নয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে অবস্থানরত ইহুদীদের মধ্য হতে এক লাখ লোককে অনতিবিলম্বে প্যালেস্টাইনে প্রবেশের ছাড়পত্র দেবার জন্য বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করলে সমস্যা আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়। বৃটিশ সরকার অবৈধভাবে এভাবে প্যালেস্টাইনকে ইহুদীকরণের একক অপরাধের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়াসী হয়। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে একটি যুক্ত 'এ্যাংলো-আমেরিকান' তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য পেশ করে। হলোও তাই। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে ৬ জন বৃটিশ ও ৬ জন মার্কিন সদস্য নিয়ে এ ব্যাপারে একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। পূর্ব ইউরোপ ও প্যালেস্টাইন সফর করে এসে কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয় যে, প্যালেস্টাইনকে পুরোপুরি আরব বা পুরোপুরি ইহুদী দেশ মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। কোনো সম্প্রদায়ের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে উক্ত রিপোর্ট এমন একটি প্রশাসন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যা ত্রিধর্মের অনুসারীদের এ পবিত্র ভূমির স্বার্থরক্ষার সাথে সাথে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.১৭ গ্রেডি মরিসন কমিশনের রিপোর্ট ও প্রতিক্রিয়া

১৯৪০ সালের ভূমি হস্তান্তর আইনে জমি বেচা-কেনার ওপর যে বাধানিষেধ আরোপিত হয় তা তুলে নেবার এবং এক লাখ ইহুদী শরণার্থীর প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অনুমতি দানের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু রিপোর্টের অন্যান্য দিক উপক্ষো করে শুধু এক লাখ ইহুদী শরণার্থীর প্যালেস্টাইনে প্রবেশ সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বৃটিশ সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকলে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ বেভিন ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। কারণ এতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জাতির অবমাননা করা হয়েছে বলে তারা মনে করতে থাকে। অন্যদিকে আমেরিকার কূটনীতির জয় হয়। তাই বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করে। ফলে একদিকে মার্কিন সরকার ও বৃটিশ সরকার-এর মধ্যে এবং অন্যদিকে বৃটিশ সরকার ও ইহুদীদের মুখপাত্র জায়নবাদীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সম্পর্কের এ অবনতির অপনোদনের জন্য আবার নতুন করে দু' দেশের সদস্য নিয়ে 'গেভি-মরিসন' নামে আর একটি কমিশন গঠিত হয়। এ নয়া কমিশন প্রস্তাব করে যে, দু' জাতির স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি ফেডারেল ধরনের রাষ্ট্র গঠন করা উচিত এবং ইহুদী শরণার্থীদের প্যালেস্টাইনে প্রবেশ দু' সম্প্রদায়ের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

কিন্তু এ শেষোক্ত বাক্যটিই ইহুদীদের মাথায় বজ্রপাত ঘটালো। প্যালেস্টাইনে প্রবেশের জন্য প্যালেস্টাইনী আরবদের মতামতের ওপর নির্ভর করতে হবে ? অসম্ভব! ইহুদী সম্প্রদায় তা কিছুতেই বরদাশত করতে পারবে না। ফলে প্রয়োগ করলো তাদের অমোঘ অস্ত্র সেই 'সন্ত্রাসবাদ'। আগে তারা বৃটিশ প্রশাসনকে নস্যাৎ করার জন্য একযোগে বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হলো। ১৯৪৬ সালের ১৬ জুন হাগানা-রা প্যালেস্টাইনের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর যোগাযোগ রক্ষাকারী এগারোটি সেতু মাইনের আঘাতে উড়িয়ে দিলো। জুলাই মাসের ২২ তারিখে জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলের একাংশ ইরগুণ সন্ত্রাসবাদীরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিল। ফলে এখানে অবস্থিত বৃটিশ সরকারী দফতরে কর্মরত শতাধিক বৃটিশ, আরব ও ইহুদী নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে বিশেষ করে পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়।

এমতাবস্থায় যুদ্ধংদেহী মনোভাবাপন্ন জায়নবাদীগণ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জায়নবাদী সম্মেলনে সমগ্র প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প সমন্বিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে ইহুদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাত্রা তুঙ্গে ওঠে। জানুয়ারী মাসের ১২ তারিখে একটি দল বৃটিশ পুলিশ ফাঁড়ির ওপর গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে পাঁচ জন পুলিশকে হত্যা করে ও ৩৪ জনকে চরমভাবে আহত করে। ২৭ জানুয়ারী একজন বৃটিশ বিচারক ও অন্য একজন নিরীহ নাগরিককে ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করে। এভাবে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে বৃটিশ সরকারকে প্যালেস্টাইন পরিত্যাগ করানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতি এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় যে, বৃটিশ মহিলা ও শিশুদের সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বৃটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীবৃন্দ নিরাপত্তার জন্য কাঁটা তারের আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করতে থাকে।

৩.১৮ প্যালেস্টাইন ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জাতিসংঘের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সন্ত্রাসবাদী ইহুদী সম্প্রদায় উদীয়মান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে পুষ্ট হয়ে যখন প্যালেস্টাইনের বৃটিশ সরকারকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে কোণঠাসা করে ফেলে তখন তারা 'জান বাঁচানো ফরয' ভেবে বিষয়টি জাতিসংঘের নিকট দ্রুত পেশ করে। এটা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের

ঘটনা। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে প্যালেস্টাইনের এ সমস্যাটি আলোচিত হয় এবং প্যালেস্টাইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটিতে যে সকল দেশ সদস্য ছিলো তারা হলো ঃ (ক) অস্ট্রেলিয়া, (খ) কানাডা, (গ) হল্যাণ্ড, (ঘ) পেরু, (ঙ) সুইডেন, (চ) উরুগুয়ে, (ছ) গুয়েতেমালা, (জ) চেকোশ্লোভাকিয়া (ঝ) যুগোশ্লোভিয়া, (ঞ) ভারত ও (ট) ইরান। এ কমিটি প্যালেস্টাইন সফর করে ৩১ আগস্ট তারিখে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে উক্ত কমিটির সদস্য বৃন্দ একমত হতে পারেনি। কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়েতেমালা, হল্যাণ্ড, পেরু, সুইডেন ও উরুগুয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ প্যালেস্টাইনে ম্যাণ্ডেট শাসনের অবসান চায় এবং একটি আরব ও একটি ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তারা আরো মত প্রকাশ করে যে, ত্রিধর্মের অনুসারীদের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র জেরুজালেম নগরী একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক এলাকা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর প্রশাসনিক কার্য পরিচালিত হবে স্বয়ং জাতিসংঘ কর্তৃক। আর আরব ও ইহুদী রাষ্ট্র দুটি একটা 'অর্থনৈতিক ইউনিয়নের' বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত থাকবে একথাও উল্লেখ করা হয়। অপর পক্ষে ভারত, ইরান ও যুগোশ্লোভিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ প্যালেস্টাইনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ম্যান্ডেট ক্ষমতার অবসান কামনা করে এবং আরব ও ইহুদী এলাকার স্বায়ত্বশাসনসহ একটি ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে— যার রাজধানী হবে পবিত্র জেরুজালেম নগরী।

ইহুদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র জায়নবাদীগণ তড়িঘড়ি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দেয় এবং এটা যাতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শীঘ্রই গৃহীত হয়, সে ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

৩.১৯ প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণে ট্রুম্যান সরকারের কারসাজি ও বিশ্বব্যাপী এর প্রতিক্রিয়া

১৯৪৭ সালের শেষ দিকে উল্লেখিত প্রস্তাব দুটি জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটিতে আলোচিত হতে থাকে। পরিশেষে প্রস্তাব দুটি পাশের জন্য ভোটাভোটির ব্যবস্থা করা হয়। এ সিদ্ধান্তটি নেয়ার পর ইহুদী জাতির মুখপাত্র জায়নবাদীগণ এবং ইহুদীদের তল্পীবহ মার্কিন প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ জাতি সংঘের

সচেতন সদস্যরা যে কোনো মতেই প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণে সহায়তা করবে না—এ সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিলো। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও জায়নবাদী নেতৃবন্দ বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণের সপক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। এর পরেও যখন তারা প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারলো না, তখন একবার নয় পরপর দু'বার অধিবেশন স্থগিত রাখে এবং চীন, গ্রীস, হাইতী, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া এবং ফিলিপাইনের ওপর চাপ দিতে থাকে ; যাতে তারা প্যালেস্টাইন বিভক্তি-করণের সপক্ষে ভোট দেয়। এটা ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে Manchester Guardean এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যের নাম করা পত্র-পত্রিকা যেমন The Newyork Times, The Newyork Herald Tribune ও London Times ইত্যাদিতে বেশ কড়া ভাষায় সমালোচনামূলকভাবে লিখালেখি হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

"During that crucial interlude, four nation's opposed to partition, Greece, Haiti, Liberia, and the Philipines, were subjected to a deluge of diplomatic pressures and menaces. The United States, again acting on the instigation of the White House, threw the full impact of its tremendous prestige behind the Jewish cause. Two justices of the United States Supreme Court personally Cabled Philippine President Carlos Rajas warning that the Philippines will isolate unillions and millions of American friends and supporters if they continue in their efforts to vote aganist partion. Twenty-six senators Cabled Rajas and urged him to change his nation's vote. The Philippine ambassador was summoned to a blunt but intensive briefing at the White House. Finally Rajas ordered his delegation in the higher national interest to switch its vote from against to for partition."

লাইবেরিয়াকে বশে আনার জন্য জায়নবাদী ইহুদীরা লাইবেরিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ইহুদী শিল্পপতি Harvey Firestone-কে ব্যবহার করে। বিশ্ব জায়নবাদী সংগঠনের নেতৃবন্দ H. Firestone-কে এ বলে ভয় দেখতে থাকে যে, বিশ্বের নিপীড়িত ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য একটা স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সে যদি সামান্য কথা দিয়েও সাহায্য না করে তবে বিশ্বের ইহুদী সম্প্রদায়সহ তাদের অন্যান্য গইমবন্ধুরাও সর্বতোভাবে "Firestone Rubber Company"-এর যাবতীয় দ্রব্য বর্জন করবে। আর

যদি সে এ ব্যাপারে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট William Tubman-কে বুঝিয়ে প্যালেস্টাইন বিভক্তির সপক্ষে ভোটদানে বাধ্য করেন তবে তার শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল প্রচলনের জন্য তারা আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। ফলে H. Firestone বাধ্য হয়েই ছলে-বলে কলে-কৌশলে William Tubman -কে পথে নিয়ে আসেন। এভাবে হাইতীর সিনিয়র স্টেটস্‌ম্যান Adlof A. Berle-কে দিয়ে হাইতীর প্রেসিডেন্টকে বশে আনেন এবং আরব বিশ্বের গ্রীক উপনিবেশ বজায় রাখতে গ্রীকগণ যে বন্ধু দেশটির ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলো জায়নবাদীরা সুকৌশলে সে দেশটিকেও এ ব্যাপারে কাজে লাগায়। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এ সমস্ত দেশ এরূপ অবৈধ কাজে মোটেই রাজি ছিলো না। শেষে দেখা গেলো, যে সমস্ত দেশে জায়নবাদীদের চরম কর্তৃত্ব এবং যে সমস্ত রাষ্ট্র আমেরিকার তল্পীবাহক ছিলো কেবল তারাই প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণের সপক্ষে ভোট দিয়েছিল।

সাধারণত পাশ্চাত্য দেশগুলোই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, কিউবা, গ্রীক এবং তুরস্ক—এ বিভক্তির বিপক্ষে ভোট দেয়। এক দিকে পরাশক্তি আমেরিকান ও রাশিয়ান সরকারের হুমকি, অন্যদিকে প্যালেস্টাইনীদের মাতৃভূমিকে কর্তন করে আর এক দস্যু তস্করের হাতে তুলে দেয়ার মহাপাপ—এ উভয় সংকটের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, আর্জেন্টিনা, চিলি, চীন, কলম্বিয়া, এলসালভেদর, ইথিওপিয়া, হন্দুরাস, মেক্সিকো, বৃটেন ও যুগোশ্লোভিয়া ভোটদানে বিরত থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। তবে বৃটেনের ব্যাপারটা এখানে সম্পূর্ণ আলাদা—সে আসলে ইহুদীদের ওপর রাগ করেই অনুরূপ নিরবতা পালন করে—নীতি বোধে পরিচালিত হয়ে নয়।

মার্কিন ও রুশীয় সরকার চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে জায়নবাদীদের সমর্থনে নিজেদের প্রভাবের চূড়ান্ত অংশটুকু পর্যন্ত ব্যয় করে বিশ্বের বৃহত্তম একটি অবৈধ কাঠামোকে দাঁড় করানোর জন্য যেভাবে উলঙ্গপনার আশ্রয় নেয় তার কোনো নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার এহেন একটা জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপনে বিবেকবান বিশ্ব আজ ক্ষতবিক্ষত। এমন কি স্বয়ং আমেরিকার নিম্নপরিষদের অনেক সদস্যরাও এর তীব্র নিন্দা করেন। মার্কিন নিম্নপরিষদের সদস্য Lawrence H. Sumith প্রেসিডেন্টের এহেন ন্যক্কারজনক কাজের সমালোচনা করে বলেন ঃ

"The decisive votes for partition were cast by Haite, Liberea and Philippines. These votes were sufficient to make the two-thirds majority. Previously these countries opposed this move.... The pressure by delegates, by our officials, and by the private citizens of the united States constitutes reprehensible conduct against them an us."

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব Summer Welles এ সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"By direct order of the white House, every form of pressure, direct or indirect, was brought to bear by American officials upon those countries, outside the Muslim World that were known to be either uncertain or opposed to partition."

আমেরিকার বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট Dr. Steplan B. L. Penrose-এর উক্তিটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অদূরদর্শিতার জন্য মার্কিন জাতির গৌরবময় ইতিহাসে এহেন অমানবিক কার্যের জন্য যে কালিমা লেপন করা হলো তাতে এক ডেঁকচি দুধের ভিতর এক ফোটা গো-চনার ন্যায়ই কাজ করেছিলো। এজন্য তিনি অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তেই আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ

"The political maneuvering which bed to the final acceptence of the United Nations' General Assembly of the majority report of UNSCOP provides one of the blacker pages in the history of the American international policies, There can be no question but that it was American pressure which brought about the acceptence of the recommendation for partition of Palestine with Economic Union voted by the general Assembly on November 29, 1947. It was this effective American pressure for partition which largely responsible for the trrifie drop which American prestige took in all parts of the Arab and Muslim World."

৩.২০ প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণের স্বপক্ষে জাতিসংঘের যুক্তি খণ্ডন

এভাবে কুচক্রী ইহুদী সম্প্রদায়ের খপ্পরে পড়ে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেই না কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়লো তার চেয়েও অধিক পরিমাণে

পাপের ভাগি হলো সম্মিলিত জাতিসংঘ স্বয়ং। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বরে তার এ প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণ কোনো দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য ছিলো না। উপরন্তু একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘের কোনো প্রস্তাব একটি সুপারিশ মাত্র ; কোনো দেশের ওপর সে প্রস্তাব জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার অধিকার তার নেই। তার এ দস্যুবৃত্তি জাতিসংঘ সনদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের মুরব্বী সেজে কেমন করে ইউ. এন. ও. একটি দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে পায়ে মাড়িয়ে দেশটি ভাগ করে অপর এক চরম বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী জাতকে তার একাংশে দৃঢ় ভিত্তির ওপর বসাতে পারে ? এর জবাব বিশ্ববাসী খুঁজে আজও পায়নি—পাবেও না আর কোনো দিন। বিবেকবান বিশ্ব তাই আজ ক্ষতবিক্ষত।

হয়তো সম্মিলিত জাতিসংঘ বলবে, না সে ঠিকই করেছে ? কারণ তাদের পূর্বপূরুষ হযরত ইবরাহীম আ.-এর আল্লাহ তাঁকে ইরাকের বাবেল শহর থেকে এখানে এনেছিলেন এবং এখানে অবস্থান করেই আল্লাহর একত্ববাদ —"লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইবরাহীমু খালীলুল্লাহ"—এ মহাবিপ্লবাত্মক বাণীকে বিশ্বের মানুষের নিকট পৌছে দিতে আদেশ করেছিলো। শুধু তার জন্যই নয়, বরং তাঁর বংশধররাও যাতে ঐ স্থানকে কেন্দ্র করে আল্লাহর একাত্মবাদ ইসলামকে বিশ্বের মানুষের নিকট পৌছে দেয় তার জন্যও হযরত ইবরাহীমকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেন ঃ

(১) "I am yhwh that brought thee out of Ur of the chaldes to give to thee this land to inherit it."

(২) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ "And I will make of thee a great nation..... and they went forth to go into the Land of Cannan... and the Cannanite was then in the land. And the Lord apperd to Abraham and said : "Unto thy seed will I give this land." [Old Testament].

এজন্যই বনী ইসরাঈল বংশের পরবর্তী নবীগণ হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত, সকলেই এখানে বা এর আশেপাশে প্রেরিত হন এবং ওখানেই অবস্থান করে আল্লাহ প্রদত্ত অনুশাসনকে মানুষের নিকট পৌছে দিতে থাকেন ; যদিও তাদের জীবনের ওপর অসংখ্য হুমকি এসেছিল। ইহুদীদের পূর্বপুরুষ এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর উত্তরসূরী হযরত ইসহাক, হযরত ইসরাঈল (ইয়াকুব), হযরত দাউদ ও মহান সম্রাট হযরত সুলাইমান আ. ঐ একই

নীতি অনুসরণ করেন। এর ফলে দেখা গেলো একদা তারা আল্লাহর অসীম করুণায় সিক্ত হয়ে ঐশ্বর্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেলো। এভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রতি যে 'ওয়াদা' দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেন। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ইবলিস হযরত আদম আ.-এর বংশধরদের এরূপ সুখ ও ঐশ্বর্য সম্মান প্রতিপত্তি মোটেই সইতে পারলো না ; সে আদাজল খেয়ে লেগে গেলো বনী ইসরাঈলদের বিভ্রান্ত করতে এবং এভাবেই সে সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত আদম সন্তানের মুণ্ডুপাত করে চলেছে। সাধারণভাবে শয়তান ইবলিসের প্রতারণায় বনী ইসরাঈলরা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলো। পরিণামে 'ঐশী অনুশাসন'-কে পায়ে মাড়িয়ে ব্যভিচারী ও দাম্ভিক হয়ে উঠলো। তাদের এ মহাপাপের ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটা নয়, আল্লাহ পাক বহু নবীও (পথপ্রদর্শক) পাঠালেন। কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের ঐ সকল সম্মানিত অতিথি নবীদের কথা তো শুনলই না ; বরং তাদের উদ্ধারকর্তা ঐ সকল নবী-রাসূলকে নির্মমভাবে হত্যা করা শুরু করলো। নবীদের অবলুপ্তির পর ইহুদী আলেম সমাজ নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে তাওরাতের ন্যায় ঐশী গ্রন্থগুলোর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন, পরিবধন এবং কর্তন করে যা করলো তাতে সমাজ বিষিয়ে উঠলো। আল্লাহর আরশ থরথর করে কেঁপে উঠলো। আল্লাহ পাক আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। ফলে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বনী ইসরাঈলদের সাথে সম্পর্কের ছেদ টানলেন। আর এর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলদের ঐশ্বর্য গেলো। ইবলিস ও তার চেলা-চামুণ্ডের পায়ের 'ফুটবলে' পরিণত হলো। ফলে তাদের থেকে শান্তি গেলো। নিজেরা আত্মকলহে লিপ্ত হলো, রাজ্য ভাগ হলো ; রাজ্যদ্বয় গেলো ; শাসক পদ থেকে নেমে এসে শাসিতে পরিণত হলো ; অত্যাচারী জাতিদের দাস-দাসীতে পরিণত হলো ; যারা পালিয়ে বাঁচলো তারা আশ্রয়হীন হয়ে বিভিন্ন দেশের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে বাধ্য হলো ; কিন্তু সেখানেও শান্তিতে থাকতে পারলো না ; তাদের প্রতিটি কাজই তাদের বিরুদ্ধে রায় দেয়াই রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাড়ীতে বস্তিতে ; এমনকি বিছানার সুখ-শয্যায় নির্মম মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। তাও আবার দু'-এক দিন নয়, মাসের জন্য নয়, বছর ব্যাপী নয়—যুগ যুগ ধরে।

এমনিভাবে যেদিন থেকে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর সাথে নেমকহারামী করে আল্লাহদ্রোহী ইবলিসের পক্ষাবলম্বন করলো, ঐশী দূতদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে লাগলো, ঐশী গ্রন্থগুলোর প্রতি চরম বেয়াদবী করে তাঁর রদবদল করা শুরু করলো, সেদিন থেকেই হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রতি রাব্বুল আলামীনের যে 'ওয়াদা' ছিলো তা রহিত হয়ে গেল। কেননা যখন

তারা আল্লাহ পাকের কালামকে বিকৃত করলো, তাদের পথপ্রদর্শক ঐশী দূতদের প্রতি দুর্ব্যবহার করলো, মেরে মেরে রক্তাক্ত করলো, পীঠমোড়া করে বেঁধে জেলে আটক করলো, আবার জেল থেকে বের করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মহা সমারোহে হত্যা করলো—তাও আবার এক জনের নয়, দু'জনের নয়, বরং অসংখ্য। অতএব ধৈর্যের সীমা আর কতই বা থাকতে পারে ? সুতরাং তারা যখন এভাবে আল্লাহকে ছেড়ে অত্যাচারী, দাম্ভিক, অভিশপ্ত ইবলিসের পক্ষাবলম্বন করলো, তখন তাদের শ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহর সাথে আর কি সম্বন্ধ থাকতে পারে ? আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে শয়তানের হয়ে যাও তখন তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার নয়। অতএব যে আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ.-কে তৎকালীন বিশ্বসম্রাট খোদায়ী দাবিদার ইরাকের শাহানশাহ অত্যাচারী নমরূদের কবল থেকে উদ্ধার করে প্যালেস্টাইনে নিয়ে যায় (খৃঃ পূঃ ২০০০ সালে) এবং এটাকে কেন্দ্র করেই আল্লাহর মনোনীত একত্ববাদী ঐশী জীবনব্যবস্থা ইসলামকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিযুক্ত করেন, সেই আল্লাহই তাঁকে আরো বলে দেন যে, তোমার বংশধরদের জন্যও ঐ একই ব্যবস্থা চালু থাকবে। আর প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানই তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো—ঐশীতন্ত্র প্রচারের জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ইবরাহীমের বংশধর বনী ইসরাঈলরা স্রষ্টার সাথে নেমকহারামী করে যখন ইবলিসের ওয়াসওয়াসা কৃত শয়তানী জীবন বিধান এখান থেকে বিস্তার ও তার প্রচার করা শুরু করলো তখন আল্লাহ পাক স্বীয় ক্ষমতা বলে তাদেরকে প্যালেস্টাইনের পবিত্রতম ভূমি ঐতিহাসিক জেরুজালেম নগরী থেকে নির্মমভাবেই বের করে দেন এবং শাস্তি স্বরূপ আরো অধিকতর—অত্যাচারী জাতিদের দাস-দাসীতে পরিণত করেন। বিশ্বচরাচরের একমাত্র মালিক স্বয়ং আল্লাহই তার সৃষ্ট ঐ ভূমিকে বনী ইসরাঈলের জন্য মনোনীত করেছিলেন ; আবার সেই স্রষ্টাই প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমিকে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন; যেহেতু রাব্বুল আলামীনের সাথে বনী ইসরাঈল ও তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীমের যে সন্ধি ছিলো তারা তা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করেছিলো। কাজেই প্যালেস্টাইনের ওপর আজকের ইসরাঈল জাতির দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আর এর সাথে সাথেই সম্মিলিত জাতিসংঘের একমাত্র অবলম্বনের বস্তু যুক্তি সৌধের কাঁচের প্রাসাদ খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া যে সমস্ত ইহুদী জনতা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে আবার আল্লাহর নির্দেশিত পথে ফিরে

আসে এবং আপদ-বিপদের উত্তাল তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করে প্যালেস্টাইনের পাক ভূমিতেই বসবাস করতে থাকে তারা কখনোই চায়নি যে প্যালেস্টাইন বিভক্ত হোক এবং জায়নবাদী আত্মধ্বংসী পাশ্চাত্যের ঐ বিশ্বাসঘাতকের দল আবার প্যালেস্টাইনে ফিরে এসে অশান্তির বন্যা বইয়ে দিক।

৩.২১ প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণে জাতিসংঘের কুকীর্তি

এতদসত্ত্বেও জায়নবাদীদের হাতের পুতুল সম্মিলিত জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনকে ভাগ করতে যেয়ে যা করলো তা কোনো দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য ছিল না ; না ছিলো জমির ওপর ইহুদীদের মালিকানা ; না ছিল জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা।

১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা ছিল প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দা প্যালেস্টাইনীদের এক-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে এক-দশমাংশ ছিলো দেশীয় ইহুদী। অবশিষ্ট যে সমস্ত ইহুদী তখন প্যালেস্টাইনে অবস্থান করছিলো তারা জন্মগত ও নাগরিকতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ছিল ভিনদেশী। এমন কি প্যালেস্টাইন বিভক্ত করে যে অংশ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেয়া হয়েছিল সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা ছিল প্যালেস্টাইনী। এ অংশে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৪,৯৯,০২০ জন। পক্ষান্তরে ৫,০৯,৭৮০ জন ছিল প্যালেস্টাইনী।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইন বিভক্ত করণের সময় প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যাকে আরো একটু বিশ্লেষণ করলে প্যালেস্টাইনী ও ইহুদীদের সংখ্যার তারতম্যটা আরো একটু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রস্তাবিত ইহুদী রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডটাকে আমরা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করে বৈষম্যটা তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এ প্রস্তাবিত ইহুদী রাষ্ট্রের দক্ষিণের বীরশেবা অঞ্চলে যেখানে প্যালেস্টাইনীরা সংখ্যায় ছিলো ১,০৩,৮২০ জন, সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ১,০২০ জন। উক্ত ভূ-খণ্ডের উত্তরাংশের গ্যালিলি অঞ্চলে যেখানে প্যালেস্টাইনীদের সংখ্যা ছিলো— ২৮,৭৫০ জন, সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৮৬,২০০ জন। কেবলমাত্র এ ভূ-খণ্ডের মধ্য-অঞ্চলের শারোন ও ইস্‌দ্রাক্লনে ইহুদীদের সংখ্যা বেশি ছিলো। এখানে প্যালেস্টাইনীদের সংখ্যা ছিল ৩,০৬,৭৬০ জন। কিন্তু ইহুদীদের সংখ্যা ছিলো ৪,৬৯,২৫০ জন। তবে যে, সমস্ত প্যালেস্টাইনীরা যাযাবর ছিলো তাদের এ গণনার মধ্যে ধরা হয়নি।

প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে পরাশক্তির পরামর্শক্রমে ইহুদী ধনকুবের রথচাইল্ড পরিবার ও অন্যান্যদের অর্থের

সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে কুড়িয়ে আনা ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে প্রচুর খামার জমি, কমলালেবুর বাগান ইত্যাদি প্যালেস্টাইনীদের নিকট থেকে কেনা হয়। তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছুঁতো ধরে ইহুদীরা বহু জমি প্যালেস্টাইনীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। এ প্রচেষ্টা বহু পূর্ব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। তবুও প্যালেস্টাইন বিভক্ত করার সময় দেখা গেলো ইহুদীরা অতি সামান্য পরিমাণ ভূ-খণ্ডের ওপরই মালিকানা স্থাপন করতে পেরেছে। ঐ সময় প্যালেস্টাইন সরকারের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্যালেস্টাইনের মোট ভূ-খণ্ডের ৫.৬৬ শতাংশের ওপর ইহুদীদের মালিকানা ছিলো। প্যালেস্টাইন বিভক্তি-করণের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ যে এড্হক কমিটি গঠন করেছিলো তার ১নং সাব-কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাতে উল্লেখ করা হয় যে (১৯৪৭ সালের ৩০ জুন) ১৮,০২,৩৮৬ ডুনোম ভূ-খণ্ড ইহুদীদের অধিকারে ছিলো (১ ডুনোম=১০০০ বর্গমিটার)। এর ভিতর ২,০০,০০০ ডুনোম জমি তারা প্যালেস্টাইন সরকারের কাছ থেকে 'লীস' নিয়েছিলো। এ জমিগুলো ছিলো হাইফা উপসাগরীয় অঞ্চলে।

পক্ষান্তরে ঐ একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্যালেস্টাইনীরা ১,২৫,৭৪,৭৭৪ ডুনোম পরিমাণ জমির অধিকারী ছিলো। তবে উক্ত পরিসংখ্যানে বিশাল চারণ ভূমিকে বাদ দেয়া হয়েছিলো। কারণ ঐ জমিগুলো গ্রামীণ প্যালেস্টাইনীদের মালিকানায় ছিলো না। ঐগুলো প্যালেস্টাইন সরকারের খাস জমি। এ খাস জমির পরিমাণ ছিল মোট প্যালেস্টাইন ভূ-খণ্ডের ৪৬%। অতএব দেখা যাচ্ছে প্যালেস্টাইনে ইহুদীরা এতকিছু করেও অতি সামান্য ভূ-খণ্ডের ওপরই নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। অথচ সম্মিলিত জাতিসংঘ যখন প্যালেস্টাইনকে ভাগ করলো তখন ইহুদীদেরই প্যালেস্টাইন ভূ-খণ্ডের বৃহত্তম অংশ দিল। আর যারা ছিল অনেক বেশি পরিমাণ জমির মালিক, তাদেরই দিলো সবচেয়ে কম ভূ-খণ্ড। ৫৭% দিল (১৪৫০০ বর্গ কিলোমিটার) ইহুদীদের। আর প্যালেস্টাইনীদের দিল ৪৩% (১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার)। উপরন্তু কুচক্রী ইহুদীদের ক্রীড়নক জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনীদের প্যালেস্টাইনের যে অংশে নিয়ে গেল, তার অধিকাংশই ছিল পাহাড়িয়া ও মরুময় অঞ্চল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে, বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের মুরব্বী সেজে কেমন করে জাতিসংঘ এমন একটা মহাপাপ করতে পারলো! এ থেকে কি প্রমাণিত হয়নি যে স্বয়ং জাতিসংঘও সম্পূর্ণ ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত?
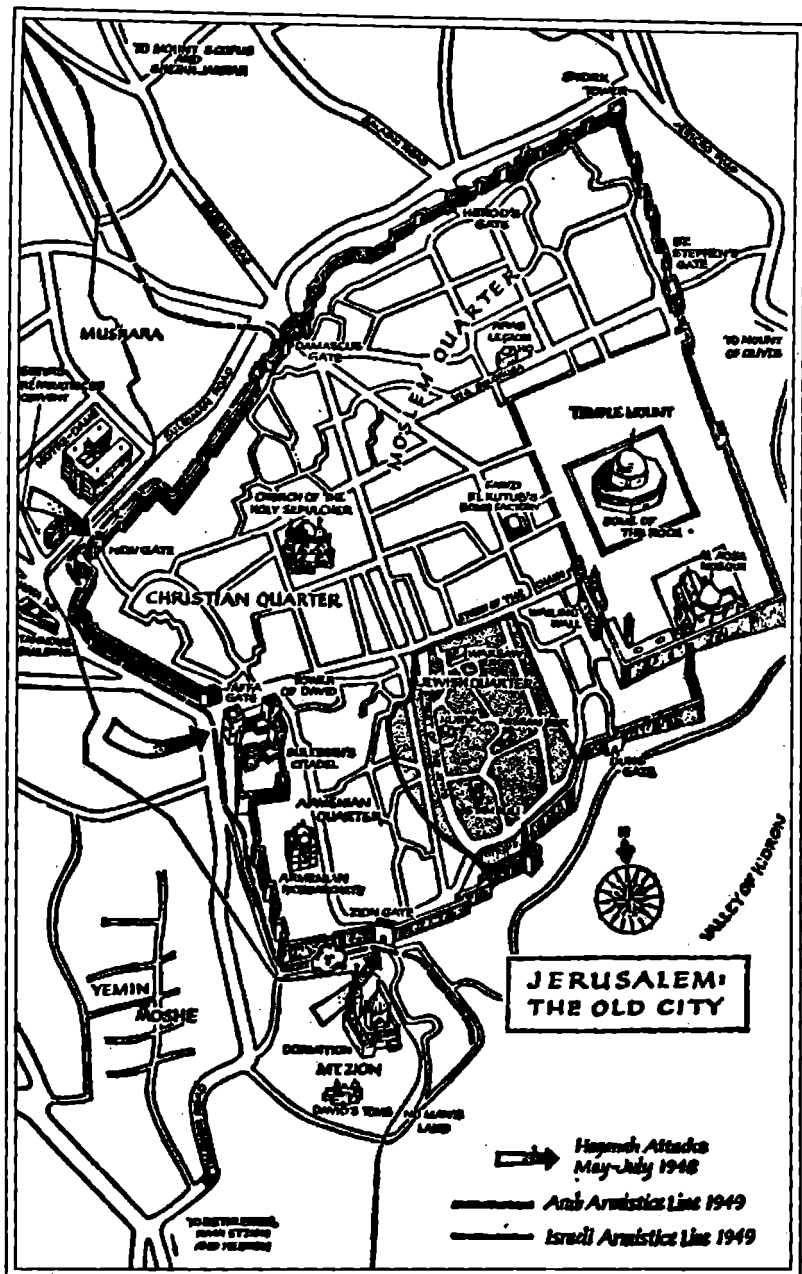
মানচিত্র ৩ ঃ ১৯৪৮ ও '৪৯ সালে সংঘটিত জেরুজালেমের গৃহযুদ্ধের মানচিত্র।

৩.২২ জাতিসংঘ কর্তৃক বিভক্তি প্রস্তাব ও তার পরে

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জাতিসংঘ পবিত্র জেরুজালেম নগরীর ওপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়নি। বরং এ মহান নগরীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদার কারণে তাঁকে নিরপেক্ষ রেখে বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘের প্রশাসনিক আওতায় নিয়ে যায় এবং এক বিশেষ আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেয়া হয়। তাছাড়া একে অসামরিক ও নিরপেক্ষ নগরী ঘোষণা করা হয়। জেরুজালেমের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানগুলোতে ধর্ম, বর্ণ, ভাষার কারণে কিংবা নর-নারীর মধ্যে কোনো রকম বৈষম্য সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয় এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি 'ট্রাস্টিশীপ কাউন্সিল' জেরুজালেমের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করবে—একথাও বলা হয়।

❑

চতুর্থ অধ্যায়

প্যালেস্টাইনের ইহুদী ও মুসলিম নেতাদের জীবনী

৪.০১ ডেভিড বেনগুরিয়ন

প্যালেস্টাইনের এ বিভক্তি প্রস্তাব গৃহীত হবার সংবাদটি প্যালেস্টাইনে পৌছার সাথে সাথে বিদ্রোহের দাবানল চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এ বিরাট অন্যায়ের প্রতিবাদে প্যালেস্টাইনী জনগণ হয়ে ওঠে দুর্বার, দুর্দমনীয় ও বিশৃংখল। প্রতিবাদমুখর প্যালেস্টাইনবাসীর মিছিলের পর মিছিল যেন সমুদ্র সৈকতে দণ্ডায়মান, দর্শকের চোখে হাজারো বেপরোয়া তরঙ্গরাজির ন্যায়ই প্রতিভাত হতে থাকে। এর পরের প্রতিটি ঘটনাই প্যালেস্টাইনের আকাশকে অমানিশার ঘন কালো অন্ধকারে ঢেকে দেয়। ফলে চারদিকে সন্দেহ, ভয় ও আতঙ্করূপ নানা জাতীয় অশান্তিময় অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এটাকে কুচক্রী ইহুদী সম্প্রদায় তাদের লক্ষে পৌছানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে যে স্বাপ্নিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা এতদিন তারা অন্তরে স্থান দিয়ে আসছিল তা বাস্তবে রূপ দানের জন্য সন্ত্রাসবাদকেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী দল এ সন্ত্রাসী কার্যকলাপে এক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে তারা হলো ঃ (ক) রিভিউনিস্ট (খ) ইরগুইন (গ) হাগানা (ঘ) স্টার্নের বেপরোয়া দল (ঙ) পালমাক বাহিনী। এ দলগুলোর শীর্ষে অবস্থান করে যারা জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনের পবিত্র মাটিকে অপবিত্র করলো— তারা হলো ঃ (১) ডেভিড বেনগুরিয়ন; (২) ডেভিড শালটিল, (৩) মোরডেস্টাই র‍্যানান ; এবং (৪) যশোয়া জেটলার। এদের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করলো তাদের ভিতর ঃ (ক) যিগাল যাদিন ; (খ) ভিভিয়ান হারজোগ ; (গ) টেড্ডী কোলেক ; (ঘ) ইলিয়াহু স্যাচারভ ; (ঙ) হ্যাইম স্ন্যাভিন ; (চ) ইয়াহুদা এ্যারাজি ; (ছ) ফ্রেড্ডী ফ্রেডকিন্‌স ; (জ) ইহুদ্ এ্যাভ্‌রিল ; (ঝ) মিসেস গোল্ডা মায়ার ; (ঞ) মোশে দায়ান ; এবং (ট) মেনাহেম বেগিনের নাম আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। প্যালেস্টাইন নামক একটি দেশের আদি অধিবাসী প্যালেস্টাইনীদের ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ ও তাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনে (এদের ভিতর) যারা অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখালো তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এদিক দিয়ে সর্বাগ্রে আসে ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্থপতি ডেভিড বেনগুরিয়নের নাম। তিনি প্লনোস্কি নামক একটি ক্ষুদ্র শিল্প সমৃদ্ধ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শহরটি

পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ারশ-র ৩৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। তার ডাক নাম ছিল ডেভিড গ্রীন। 'বেনগুরিয়ন' তার রাজনৈতিক জীবনের ছদ্ম নাম। নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই এরূপ করেছিলেন। বেনগুরিয়ন শব্দের অর্থ "সিংহ শাবক"।

চিত্র ৬ ঃ ডেভিড বেন গুরিয়ন।

ইসরাঈল রাষ্ট্রের জনক থিওডর হারৎজেল ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে ড্রাইফুস বিচারের পর ফরাসী বিপ্লবের অমোঘ বাণী–Liberty, equality and fratermity-এর মুক্তি প্লাবনে বিধৌত হয়েও স্বয়ং ফ্রান্সেই যখন আবার ইহুদী বিদ্বেষ দাবাগ্নির ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখলেন এবং এর ঢেউ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে আঘাত করলো তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। এ সময় তিনি অস্ট্রীয়-সাংবাদিক হিসেবে ফ্রান্সে অবস্থান করছিলেন। কাজেই স্বচক্ষে এ নতুন ইহুদী বিরোধী উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়ে স্বীয় জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি ইহুদী জাতির একটা চিরস্থায়ী মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এ সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। এ সিদ্ধান্তটিই তিনি লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত এ সিদ্ধান্তটির নাম দেন তিনি "Der Judenstaat"। এটা ছিলো ১০০ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এ চটি বইটিতে তিনি বিশ্ব ইহুদী সম্প্রদায়ের মুক্তির পথ বাতলিয়ে একটি নীল নকশা এঁকে দিয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে তাঁর এ বইটি প্রকাশের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষিত ইহুদী গোষ্ঠী হারৎজেলের প্রতিভার প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে কাজে লেগে যায়। বিশ্বব্যাপী ইহুদী জনতার এ উচ্ছ্বাসকে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহারের জন্য পরের বছরেই (১৮৯৭ সালে) তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বাসল্স শহরে বিশ্ব জায়নবাদী কংগ্রেস-এর (World Zionist Congress) সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এগুলো হলো ঃ

১. একটি জাতীয় ইহুদী তহবীল গঠন।

২. প্যালেস্টাইনের ভূমির সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একটি ভূমি ক্রয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ;

৩. ইহুদী জাতির প্রতীক বহনকারী একটি জাতীয় পতাকা সৃষ্টি, যেটা সাদা ও কালো—এ দুটি রং-এর সমন্বয়ে তৈরি হবে ; এবং

৪. কাংখিত রাষ্ট্রের একটি জাতীয় সংগীত থাকবে ; আর সেই সংগীতটি হবে—'হাটিক্‌ভা' (Hatikvah)-যার বাংলা হলো—'আশা'।

মূলত এ সম্মেলনের পর থেকে বিশ্বব্যাপী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইহুদীদের ঐতিহ্যের প্রতীক পবিত্র 'জায়ন' পাহাড়ের নামকে স্পর্শ করে এ আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো বলে বিশ্ব ইহুদী সম্প্রদায়কে খুব দ্রুত এটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ফলে মহাপ্লাবনের মতোই হারৎজেল সৃষ্টি এ জায়নবাদী আন্দোলন বিশ্বকে প্লাবিত করে। এটা থেকে থিওডর হারৎজেলের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

পোলিশ আইনবিদ ডেভিড বেনগুরিয়নের পিতাও এ জায়নবাদী আন্দোলনের স্রোতধারায় মিশে যান। একদা তিনি জায়ন প্রেমিক এক দল জনতার সামনে প্লানেস্কির একটি হল ঘরের মধ্যে সাংগঠনিক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ; এমনি সময় বেনগুরিয়নও সেখানে যেয়ে উপস্থিত হন। পিতার চোখের আড়ালে থেকে তিনি হল ঘরের দরোজার ফাঁক দিয়ে পিতার বক্তৃতা শুনছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। তিনি পিতা কর্তৃক জাতীয় নেতা হারৎজেলের লিখিত পুস্তকের শাণিত যুক্তি ও আবেদনের ব্যাখ্যা শুনে এত আকৃষ্ট হন যে, এরপর থেকে তিনি জায়নবাদী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মীতে পরিণত হন। জাতীয় এ আন্দোলনকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি স্বয়ং জেরুজালেমে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তিনি সরাসরি পবিত্র হারাম শরীফের নিকট যান এবং দেখেন যে তাঁর আগেই তাঁরই মতো বহু জায়ন প্রেমিক ইহুদী বিশ্বের চল্লিশটি দেশ থেকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তারা একে অপরের পরিচয় জানতে চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ একে অপরের ভাষা বুঝতে পারছে না। অথচ তারা সবাই শিক্ষিত। এ ব্যাপারটি ডেভিড বেনগুরিয়নকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ, যদি একে অপরের সাথে ভাবের আদান প্রদান করতে না পারে তবে নবাগত প্যালেস্টাইনের ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়ে উঠবে কি করে ? আর তাদের ভিতর সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বই যদি গড়ে না ওঠে, তবে কি জিনিসকে অবলম্বন করে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে ? তাই তিনি লক্ষ অর্জনের পথে এ বিরাট বাধাটাকে

অতিক্রম করার জন্য এমন একটি 'কমন' ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন, যে ভাষা বিশ্বের প্রতিটি ইহুদীর কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 'তাওরাতের' (মূসা আ.-এর প্রতি অবতীর্ণ) ভাষা 'হিব্রু'-কেই তিনি নির্বাচন করেন। এ নির্বাচনে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। হারৎজেল যেমন 'জায়ন' নামটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করেছিলেন ; ডেভিড বেনগুরিয়ন সেই আন্দোলনকে আরো সুসংহত ও শক্তিশালী করার জন্য ইহুদী জাতির প্রাণের মানুষ ও মুক্তি দাতা হযরত মূসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ তাওরাতের ভাষা হিব্রুকেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। এভাবে তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথের যাবতীয় বাধাকে নিজ বুদ্ধিমত্তার বলে একে একে দূরিভূত করে বিশ্বব্যাপী হারৎজেল সৃষ্ট আন্দোলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে এগিয়ে নিয়ে যান। তাই তাঁকে আধুনিক ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্থপতি বলা হয়।

৪.২ ডেভিড শালটিল

শালটিল ছিলেন জার্মানীর হামবুর্গ শহরের বাসিন্দা। পিতা ছিলেন একজন জুতা ব্যবসায়ী। তাঁর পরিবারের সকলেই 'তালমুদের' অনুসারী। কিন্তু শালটিল ছিলেন একটি ভিন্ন রকমের লোক। ইহুদী ধর্মের বাড়াবাড়ি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মানব সৃষ্ট হিন্দু ধর্মের প্রথা অনুযায়ী হিন্দুরা যেমন প্রতীমার সামনে ভোগ দেয় ; ইহুদী ধর্মেও অনুরূপ একটি কুপ্রথা প্রচলিত ছিলো। হিন্দু ধর্মে যেমন প্রচলিত আছে কেউ ঐ ভোগের দ্রব্য ভক্ষণ করলে তার অমঙ্গল হয়, অনুরূপভাবে ইহুদী সমাজেও এরূপ একটি ধারণা প্রচলিত ছিলো। ডেভিড শালটিল এটার পিছনে কোনো যুক্তিই খুঁজে পেতেন না। তাই তিনি পরীক্ষার জন্য একদা ইহুদী ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র দিনে ("Yom Kippur") এরূপ একটি নিষিদ্ধ দ্রব্য (শুকরের এক টুকরা মাংশ) ভক্ষণ করে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন এজন্য যে, God তাঁকে শাস্তি দেন কিনা তা পরীক্ষার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কোনো কিছুই হলো না তখন তিনি তাদের ধর্মের প্রতিই চরমভাবে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এটাকে কেন্দ্র করে পরে তাঁর পিতার সাথেও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে তিনি তাঁর পিতাকেও সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন এক দিকে যেমন উক্ত কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মের সমর্থক, অন্যদিকে একজন বড় রকমের বুর্জোয়া। পিতা-পুত্রের এ সংঘাতের পরিণাম স্বরূপ শালটিল জন্মভূমি ত্যাগ করেন এবং প্যালেস্টাইনে গিয়ে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর।

প্যালেস্টাইনে গিয়ে কিছুদিন তিনি তামাকের ক্ষেতে কাজ করেন। দু'জন মিলে একটি ছোট রুম ভাড়া নেন—যার অর্ধেক ভাড়া তিনি নিজে দিতেন। আর বাকীটা দিতেন তার সহকর্মী বন্ধুটি। এভাবে প্রথম প্রথম তিনি খুব কষ্টে কালাতিপাত করতে থাকেন।

এরপর তিনি একটি হোটেলের বয়গিরীর চাকুরী নেন। কিছুদিন পরেই তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে হোটেলের সকল বাবুর্চীর প্রধানের পদ দান করা হয়। হোটেলটি ছিলো তেলআবিবে অবস্থিত। কিন্তু তা হলে কি হবে ? বড় ঘরের সন্তান হওয়ায় ডেভিড শালটিল এখানে বেশি দিন থাকতে পারলেন না—অত্যন্ত কষ্টবোধ হওয়ায় তিনি এ চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র একটু ভালো চাকুরী খোঁজ করতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্য তিনি মিলানে চলে যান এবং সেখানে একটি টেক্সটাইল মিলে চাকুরী নেন। এখানে এক বছর চাকুরী করার পর তিনি মনে মনে ভাবলেন, এ চাকুরী করে কোনো রকমে টিকে থাকা যায় ; কিন্তু তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যায় না। অথচ খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে বড়লোক হতেই হবে। অতএব এমন একটা পথ অবলম্বন করতে হবে যাতে রাতারাতিই আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়া যায়। এজন্য তিনি জুয়া খেলাকেই উদ্দেশ্যে হাসিলের মোক্ষম অস্ত্র বলে মনে করতে থাকেন। কিন্তু এটাকে অবলম্বন করে যত তাড়াতাড়ি তিনি বড় লোক হতে চেয়েছিলেন তার চেয়ে আরো অধিক তাড়াতাড়ি নিঃস্বতে পরিণত হন। এতে করে তিনি ক্ষণিকের জন্য বিব্রত বোধ করলেও একেবারে ভেঙে পড়লেন না। বরং আর একটি নতুন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন! এ সময় তাঁর বয়স তেইশ বছর। এর পাঁচ বছর পর তিনি ফ্রান্সে যান এবং সামরিক ট্রেনিং নিয়ে সার্জেন্ট-এর পদে উন্নীত হন। বেশ কিছুদিন এখানে আঞ্চলিক প্রধানের (Legion Veteran) দায়িত্ব পালন করেন। ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলার ক্ষমতায় আসলে ইহুদী দলন শুরু হয়। হিটলার কর্তৃক ইহুদী

চিত্র ৭ ঃ ডেভিড শালটিল-জেরুজালেম ইউনিট-এর হাগানা সন্ত্রাসবাদী দলের প্রধান।

দলন শুরু হলে তিনি জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জার্মান থেকে পলায়নরত হাজার হাজার ইহুদীকে তিনি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে পাঠাতে থাকেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বয়ং প্যালেস্টাইনে গিয়ে উপস্থিত হন এবং নবাগত ইহুদীদের সেখানে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দিতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি তীব্রভাবে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন। তাই তিনি আবার ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। এ কাজে যখন তিনি দারুণভাবে ব্যস্ত এবং এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন, এমতাবস্থায় এক লাখ মার্কসহ আচীন নামক এক ট্রেন স্টেশনে হিটলারের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার পুলিশ 'গেস্টেপো'-র নজরে আটকে যান। এটা ১৯৩৬ সালের নভেম্বরের ঘটনা। এরপর তাঁকে জার্মানীর এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারে বার বার স্থানান্তর করতে থাকে। এতে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চব্বিশটি কারাগারের তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বাধ্য হন। হিটলারের গেস্টেপো বাহিনীর বিভৎস নির্যাতনের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তিনি একটি উপস্থিত বুদ্ধির আশ্রয় নেন। এ উপস্থিত বুদ্ধির বলেই তিনি নাজি বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে খুব তাড়াতাড়িই তিনি কারাগারের সমস্ত কয়েদীর সরদারে পরিণত হন। এখন থেকে তাঁর কাজ হলো, যে সমস্ত ইহুদীকে নাজী বাহিনী হত্যা করতে চায়, তাদেরকে দিয়ে অদূরে একটি ট্রেন্স খুঁড়িয়ে নেয়া এবং সেখানে তাদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ব্রাশ টেনে হত্যা করা এবং হত্যা পথের যাত্রী আর এক দল ইহুদীকে দিয়ে উক্ত ট্রেন্সের মধ্যে ঐ লাশগুলোর চাপা মাটি দেয়া। এ নৃশংস কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য একদা তিনি আর একটা উপস্থিত বুদ্ধির আশ্রয় নেন এবং অত্যন্ত সফলভাবে কৃতকার্য হন। তারপর তিনি সরাসরি প্যালেস্টাইনে ফিরে যান। ১৯৪২ সালে তিনি ডেভিড বেনগুরিয়ন কর্তৃক জেরুজালেম হাগানা সন্ত্রাসবাদী দলের প্রধান কমাণ্ড পদে নিযুক্ত হন। তাঁর পরশ পেয়েই হাগানা গ্রুপ একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয় এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখে প্যালেস্টাইন বিভক্ত হলে জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে শালটিল এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

৪.৩ যিগাল যাদিন (Yigal yadin)

যিগাল যাদিন তেলআবিবের একজন নামকরা প্রত্নতত্ত্ববিদ। তখন তাঁর বয়স ছিলো বত্রিশ বছর। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে জেরুজালেমসহ গোটা

চিত্র ৮ ঃ যিগাল যাদিন

প্যালেস্টাইন গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি হাগানা দলের প্লানিং অফিসার পদের দায়িত্ব নেন। যুদ্ধের স্ট্রাটেজী তিনিই ইহুদীদের দিতেন এবং তাঁরই নির্দেশ মত ইহুদীরা জেরুজালেমের গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করে। তিনিই ডেভিড বেনগুরিয়নকে যুক্তি দেন যে, অবস্থা বেগতিক দেখলেই সন্ধি করে বসবেন এবং ঐ সন্ধির ফাঁকে দ্রুত বন্ধু দেশসমূহ থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করবেন। যাতে ইহুদী বাহিনী দ্বিগুণ ত্রিগুণ শক্তি নিয়ে আবার নতুন করে প্যালেস্টাইনীদের ওপর আঘাত হানতে পারে। তারই পরামর্শে বেনগুরিয়ন আরব লীগের সাথে সংযুক্ত দেশসমূহের হেডকোয়ার্টারে গুপ্তচর পাঠান এবং তাদের আক্রমণ পরিকল্পনাটি পূর্বাহ্নেই জেনে নেন। জেরুজালেম আক্রমণের সময় তিনিই সন্ত্রাসবাদী হাগানাদের 'ডি, ডেলেট' (D, Dalet) পরিকল্পনাটি দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিশ্রুত একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

৪.৪ ভিভিয়ান হারজোগ (Vivian Herzog)

হারজোগ ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। প্যালেস্টাইন বিভক্তিকালে তাঁর বয়স ছিলো ঊনত্রিশ বছর। প্রথম জীবনে তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সামরিক বিভাগের 'ইনটেলিজেন্স ব্রান্সের লোককে বোধ হয় স্বয়ং আজরাইলও ভয় করে চলেন।' ভিভিয়ান হারজোগ পূর্বে বৃটেনের এ বিভাগেরই লোক ছিলেন। কাজেই বৃটিশ বাহিনীর সাথে তাঁর একটি সখ্যতা স্বভাবতঃই ছিলো। এজন্য জায়নবাদী নেতারা ফিলিস্তিনে অবস্থানরত বৃটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ইহুদী গেরিলাদের দলে ভিড়াবার জন্য কাজে লাগান। তাঁরা হারজোগের আন্তরিক কর্ম প্রচেষ্টায় তা লাভ করতেও সক্ষম হন।

চিত্র ৯ ঃ ভিভিয়ান হারজোগ

৪.৫ টেডডী কোলেক (Teddy Kollek)

চিত্র ১০ ঃ টেডডী কোলেক

টেডডী কোলেক তিবেরিয়াস হ্রদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। প্যালেস্টাইন বিভক্তিকালে তাঁর বয়স ছিলো সাইত্রিশ বছর। প্রথম জীবনে তিনি হ্রদ থেকে মাছ ধরে বিক্রি করতেন। সম্ভবত তিনি একজন জেলের ঘরের সন্তান। জায়নবাদী আন্দোলন শুরু হলে তিনি এতে যোগদান করেন। জেরুজালেমের গৃহযুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্ব দেখান তাতে ইহুদীরা চমৎকৃত হয় এবং পরবর্তীকালে তাকে জেরুজালেমের মেয়র পদে অভিষিক্ত করেন।

৪.৬ ইলিয়াহু স্যাচারভ (Eliahu Sacharav)

চিত্র ১১ ঃ ইলিয়াহু স্যাচারভ

স্যাচারভ পোল্যাণ্ডের অধিবাসী ও ইঞ্জিনিয়ার। গৃহযুদ্ধ কালীন তাঁর বয়স ছিলো তেত্রিশ বছর। তিনি সংগ্রামরত ইহুদীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে গোপন অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে পাঠাতে থাকেন। এভাবে তিনি প্যালেস্টাইনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদী আবাস ভূমি গড়ে তুলবার পথ সুগম করেন।

৪.৭ হাদাসাহ লিমপেল (Hadassah Limpel)

লিমপেল পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। নাজী বাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাশিয়া আক্রমণের জন্য পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে যখন 'মার্চ' করছিলো তখন তার বয়স চৌদ্দ বছর। সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত নাজী

চিত্র ১২ ঃ হাদাসাহ লিমপেল

বাহিনীর কুচ-কাওয়াজ শুনে তিনি যখন তা উপভোগ করার জন্য বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন নাজী বাহিনী তাঁকেই (লিমপেলকে) উপভোগ করার জন্য মিলিটারী ভ্যানে তুলে নেয়। এভাবে নাজী বাহিনী হাজারো রকমের অনাচার, ব্যভিচার ও অত্যাচারে সরলপ্রাণ মানুষের জীবন বিষিয়ে তুললে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহও নাজী বাহিনীর ওপর বিষিয়ে ওঠেন এবং রাশিয়ার মাটির সাথে তাদেরকে মিশিয়ে দেন। রাশিয়ায় প্রেরিত হিটলারের সেই অজেয় বাহিনীর মাত্র কয়েকজন দেশে ফিরতে সক্ষম হয়। তাও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। আল্লাহ্ পাক তাদের নির্মূল করে দিয়েছিলেন।

অত্যাচারী জার্মান বাহিনী যখন রাশিয়ার 'রেড গার্ডের' (Red Guard) পাল্টা আক্রমণে নাকানিচুবানী খেয়ে আত্মগোপন করে এবং পালিয়ে ইরান, পাকিস্তান হয়ে ভারতে আসেন। তখন থেকেই তিনি জায়নবাদী আন্দোলনে যোগদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি মনে মনে স্থির করেন, ইহুদীদের জন্য পৃথক একটা আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তিনি আর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন না। তাই তিনি বোম্বাই থেকে পানি জাহাজে করে প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। তারপর তিনি জেরুজালেমের গৃহযুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আবদুল কাদের হুসাইনীর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে জেরুজালেমে হাজার হাজার ইহুদী পরিবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে এ ইহুদী যুবতী নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তাদের উদ্ধার কল্পে একটি গোপন রাস্তা উন্মুক্ত করতে যান। কিন্তু প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের নজরে পড়ায় তিনি গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

চিত্র ১৩ ঃ শ্লোমো শ্যামীর

৪.৮ শ্লোমো শ্যামীর (Shlomo Shamir)

শ্যামীর সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। তবে এতটুকুই জানা যায় যে,

জেরুজালেমে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ব্রিগেড কমাণ্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় (১৯৪৮ সালে) তাঁর বয়স ছিলো তেত্রিশ বছর। বর্তমানে ইনি সামরিক বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

৪.৯ হ্যাম স্লাভিন (Haim Slavine)

চিত্র ১৪ ঃ হ্যাম স্লাভিন

স্লাভিন ছিলেন বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্থপতি ডেভিড বেনগুরিয়নের অস্ত্র বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিন বছর পূর্বে তিনি ডেভিড বেনগুরিয়নের নির্দেশে অস্ত্র কারখানা কেনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হন। বেনগুরিয়ন কর্তৃক অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে পালন করতে সক্ষম হওয়ায় ইসরাঈলী জনগণের নিকট তিনি আজো বরণীয় হয়ে আছেন। কয়েক বছর আগেও তিনি ইসরাঈল রাষ্ট্রের গৃহনির্মাণ শিল্পের পরিদর্শক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

৪.১০ ইয়াহুদা এ্যারাজি (Yehuda Arazi)

এ্যারাজি পোল্যাণ্ডের অধিবাসী। সময় গৃহযুদ্ধকালীন তাঁর বয়স ছিলো একচল্লিশ বছর। তিনি একাধারে রসায়নবিদ, পদার্থবিদ এবং ইঞ্জিনিয়ার।

চিত্র ১৫ ঃ ইয়াহুদা এ্যারাজ

একদা তিনি পোল্যাণ্ডের শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ; হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি দোকানের সামনে বেশ কিছু লোক ভিড় জমিয়ে আছে। তাঁর মনে একটু কৌতূহল হয় কারণটা জানার জন্য। তাই তিনি দ্রুত এগিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন একজন যন্ত্র উৎপাদক দেউলিয়া হয়ে পড়ায় তাঁর কারখানাটি নিলামে বিক্রি হচ্ছে। তিনি এতে হস্তক্ষেপ করেন এবং দেনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। এরপর তিনি মালিককে সাথে করে উক্ত

কারখানাটি আবার চালু করেন। মূলত এটি ছিলো কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা। নিজে একজন পদার্থবিদ ও প্রকৌশলী হওয়ায় প্রতিভার সদ্ব্যবহার করে উক্ত কারখানায় এমন সব উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন শুরু করেন, যার দরুন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কারখানাটির সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এখানকার যন্ত্রপাতির চাহিদা এত বেড়ে গেলো যে, দেখতে দেখতে কারখানাটির চেহারাই পাল্টে গেলো। কয়েক মাসের মধ্যেই কারখানাটির দেনা পরিশোধ হয়ে গেলো এবং ব্যাংকে প্রচুর অর্থ প্রতিদিন জমা হতে লাগলো। এ্যারাজি এবার নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। প্যালেস্টাইনে একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চলছিলো তা সফলকাম করে তুলতে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি ভাবলেন এখানে যদি যুদ্ধাস্ত্র তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়, তবে খুব কম খরচেই উৎপাদন করা যাবে। এ চিন্তা করেই তিনি কাজে লেগে গেলেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র প্রতিনিয়ত উক্ত কারখানা থেকে উৎপাদন হতে লাগল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে প্যালেস্টাইন থাকায় ইহুদীরা যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অমঙ্গল কামনা করতে থাকে কারণ দ্রুত অভিষ্ট লক্ষে পৌছার পথে প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত বৃটিশ শাসনকে বিরাট এক বাঁধা বলে মনে করতে থাকে। তাই তারা বৃটিশকে ছেড়ে মার্কিন বলয়ে চলে যায় এবং অস্ত্রের মাধ্যমে প্যালেস্টাইন থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে তাড়াবার চেষ্টা করে। এজন্য এ্যারাজি সংগ্রামরত প্যালেস্টাইনে জায়নবাদী ইহুদীদের জন্য ৩,০০০টি রাইফেল, ২২৬টি মেশিনগান, ১০,০০০টি হ্যাণ্ড গ্রেনেড, ৩ মিলিয়ন কার্তুজ, কয়েক শো মর্টার শেল্ এবং ৩টি ছোট আকারের উড়োজাহাজ পাঠিয়ে দেন। প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত ইহুদী নেতা ডেভিড বেনগুরিয়ন এতে খুশী হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন থেমে গেলো তখন বিশ্বের সর্বত্র এক প্রশান্তিময় অবস্থা বিরাজ করতে লাগলো। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য চায়ের আসরে ভিড় জমায়। প্রত্যেকের নজর সংবাদ পত্রের দিকে। এ্যারাজিও এ অবস্থার বাইরে ছিলেন না। ঐ সময় তিনি একটি ক্যাফেতে বসে চা পানরত অবস্থায় একটি সংবাদপত্রের ওপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর চোখের সামনে সংগ্রামরত ইহুদীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এসে যায়। এটা ছিলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাত লক্ষ নতুন মেশিনারী যন্ত্রাংশ আবার স্বাভাবিক ধাতুতে পরিণত করা হবে। ইয়াহুদা এ্যারাজি চিন্তা করলেন, যদি ঐ যন্ত্রাংশগুলো কেনা যায় তবে তা দিয়ে এমন একটি অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলা যাবে যেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে এবং ঐ অস্ত্রসমূহ

প্যালেস্টাইনে পাঠিয়ে দিয়ে সেখানে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সফল করে তোলা যাবে। এ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসেন এবং ডেভিড বেনগুরিয়নের নিকট সংবাদটি পাঠানোর জন্য একটি ড্রাফট করেন। পত্রটি যথাসময়ে বেনগুরিয়নের নিকট পৌঁছলে বিস্তারিত জেনে তিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং দ্রুত এ্যারাজিকে নিউইয়র্কে যাবার নির্দেশ দিয়ে একটি টেলিগ্রাম করেন। বেনগুরিয়নের নির্দেশ পেয়েই এ্যারাজি কালবিলম্ব না করে নিউইয়র্কে চলে যান এবং সেখানে বেনগুরিয়নের বন্ধু Rudolf G. Sonneborn-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এ্যারাজি যন্ত্রাংশগুলো (৭৫,০০০টি) ক্রয় করেন এবং সেগুলো প্যালস্টাইনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এরই সাহায্যে বেনগুরিয়ন তেলআবিবের কিবুজের নিচে বিরাট এক অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলেন। যা সন্ত্রাসবাদী ইহুদী সংস্থাগুলোর গেরিলাদের অস্ত্র সরবরাহ করে তাদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তোলে।

৪.১১ ফ্রেড্ডি ফ্রেডকিন্‌স (Freddy Fredkins)

চিত্র ১৬ ঃ ফ্রেড্ডি ফ্রেডকি্নস

ফ্রেডকিন্‌স মূলত একজন বিস্কুট ফ্যাক্টরীর কর্মচারী। জায়নবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করলে তিনি এতে যোগদান করেন। পরে হাগানা সন্ত্রাসবাদী দলের একজন কর্মী হন। দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে হাগানা দলের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। এভাবে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সুকৌশলে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ফিলিস্তিনে পাঠাতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সংস্থাও গড়ে তোলেন। যার নাম দেন—"Ocean Trade Air Ways". এটা প্যারিসের একটি সরাইখানাতে অবস্থিত ছিলো। এছাড়া "Toussus-Le-Noble-Air" নামে আর একটি ইহুদী বিমান ঘাঁটি প্যারিসের বাইরে ছিলো। একটি Flying Club-এর আওতায় এটা গড়ে উঠেছিলো। এটা তাঁরই কৃতিত্ব।

৪.১২ ইহুদ্ এ্যাভরিল (Ehud Avriel)

এ্যাভরিল অষ্ট্রিয়ার আদি বাসিন্দা। জায়নবাদী আন্দোলন শুরু হলে তিনি এতে যোগদান করেন। প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী এ্যাভরিল
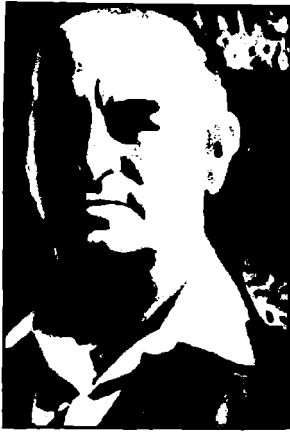
চিত্র ১৭ ঃ ইহুদ এ্যাভরিল

জায়নবাদী আন্দোলন পরিচালনায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। ফলে খুব দ্রুত তিনি শীর্ষস্থানীয় জায়নবাদী নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিটি কাজে তাঁর নিপুনতার পরিচয় পেয়ে তাঁরা তাঁকে গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োগ করেন। দশটি বছর তিনি এ গুরুদায়িত্ব পালন-কালে ভিয়েনা, ইস্তাম্বুল, এথেন্স ও প্যারিসে যান এবং সেখানকার জায়নবাদী আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত প্রায় এক লাখ ইহুদীকে তিনি অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করান। এরপর তিনি স্বয়ং প্যালেস্টাইনে ফিরে এসে ঐ সমস্ত নবাগত ইহুদীদের বসতি-স্থাপনের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় তিনি উত্তর প্যালেস্টাইনের নাহারিয়ার এক কিবুজে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইন বিভক্তি হওয়ার সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ডেভিড বেনগুরিয়ন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রচুর অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, জঙ্গীবিমান ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্রের আশু প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন। তাই বিদেশ থেকে এগুলো সংগ্রহ করার জন্য এ্যাভরিলকে বিদেশে পাঠান। নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিনি আধুনিক ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

৪.১৩ গোল্ড মায়ার (Gold Meir)

মিসেস গোল্ড মায়ার সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত কেভে নামক স্থানে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পেশার দিক দিয়ে মায়ারের পিতা ছিলেন একজন কাঠ মিস্ত্রী। গোল্ড মায়ারের বয়স যখন সতেরো বছর তখন তিনি আমেরিকায় চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জায়নবাদী আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি জাইয়ীশ এজেন্সীর রাজ নৈতিক সেক্রেটারী পদে উন্নিত হন। জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনে যে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায় ১৯৪৭ সালে শেষের দিকে এবং ১৯৪৮ সালের মে মাসের দিকে যখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় তখন ইহুদী বাহিনী চরমভাবে মার খেয়ে 'ওলিভ' নামক পাহাড়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এ সময় ট্রান্সজর্দানের বীর সেনানী মেজর আবদুল্লাহ তেলের নেতৃত্বে গোটা জেরুজালেম নগরী

চিত্র ১৮ ঃ গোল্ড মায়ার

প্যালেস্টাইনী মুক্তিবাহিনীর প্রায় করায়ত্বে আয়ত্বে চলে আসে। ফলে জায়নবাদী নেতারা তাদের সুদীর্ঘ দিনের সংগ্রাম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবার আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত্র হয়ে ওঠেন। এ সময় ডেভিড বেনগুরিয়ন একটা বুদ্ধি আটলেন যে, যদি ছলে-বলে-কলে-কৌশলে লীগ বাহিনীর শক্তিশালী সদস্য ট্রান্সজর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহকে হাত করা যায়, তবেই কেল্লা ফতেহ। আর এটা করা যে সহজ হবে তা তিনি অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ বিতর্কিত জেরুজালেমের সত্ত্ব নিয়ে ট্রান্সজর্দানের হাশেমী বংশ ও জেরুজালেমের হুছাইনী বংশের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই একটা দ্বন্দ্ব ছিলো। এ দ্বন্দ্বকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন ডেভিড বেনগুরিয়ন। তিনি বাদশাহ আবদুল্লাহকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেন যে, যদি জায়নবাদীরা গৃহযুদ্ধে জয় লাভ করতে পারে, তবে পবিত্র জেরুজালেমের ওপর হাশেমী বংশের অধিকার অবনত মস্তকে স্বীকার করে নেবে। এভাবে শত প্রলোভনের শক্তিশালী জাল তিনি বাদশাহ আবদুল্লাহর দিকে বিস্তৃত করেন। এরপর সেই জালে বাদশাহকে আটকানোর জন্য এ ইহুদী যুবতীকে টোপ্ হিসেবে ব্যবহার করেন। ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে মায়ার বাদশাহ আবদুল্লাহর পিছু নেন এবং তাঁকে নিজ বশে আনতে পূর্ণ সক্ষম হন। তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন ইজরা ডেনিন।

মিসেস মায়ার জীবনকে বাজী রেখেই ট্রান্সজর্দানের উদ্দেশ্যে সেদিন রওনা হন এবং যথা সময়ে তিনি বাদশাহ আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন। তারপর তিনি ডেনিনকে পাশের রুমে রেখে অন্য একটি রুমে এক আন্তরিক পরিবেশে বাদশাহর সাথে মিলিত হন। দীর্ঘ সময়ের আলাপ আলোচনার পর মায়ার তার কূটনীতি নামক চরম মোনাফেকী অস্ত্র প্রয়োগ করে বাদশাহর সচেতনতাবোধকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করেন। 'অপারেশন' যখন প্রায় 'সাকসেস্' তখন মায়ার বিদায় অনুমতি প্রার্থনা চাওয়ার একটু আগেই অঙ্গভঙ্গি করে স্বীয় 'ব্রিফক্যাসটা কাছে টেনে নিয়ে খুলেন এবং পঞ্চাশ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারের নতুন বাণ্ডিলগুলো আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে বললেন ঃ এটা আপনার দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করবেন যাতে সাধারণ মানুষ শান্তি পায়। এরূপ মধু বর্ষণে বাদশাহ ভাবে

গদগদ হয়ে আরব লীগের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার আত্মঘাতি শপথ মায়ারের সম্মুখে নেন এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রাম থেকে তাঁর বাহিনী সরে দাঁড়াবে এটাও মিসেস মায়ারকে শুনিয়ে দেন। তাই লেপিয়ার এবং কলিন্‌স সত্যই বলেছেন ঃ

"The woman who had arrived in New York with ten dollars in her wallet and left with fifty million had been sent to Abdullah by David Ben Gurion for something more valuable than all the Zionist funds in the world, an agrement that would keep the Arab' Legion out of the approaching war."

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপই জায়নবাদী নেতারা ১৯৪৯ সালে তাঁকে নবীন ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ায় নিযুক্ত করেন। তারপর ১৯৬৯ সালের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তিনি প্রধান মন্ত্রী পদের জন্য প্রতিযোগিতা করেন। ইসরাঈলী জনগণ তাঁকে বিজয় মালা গলায় পরিয়ে আধুনিক ইসরাঈল রাষ্ট্রের সিংহাসনে বসায়।

উপরোক্ত জায়নবাদী পাণ্ডাদের নেতৃত্বে যখন হানাদার বরাবর ইহুদী বাহিনী পবিত্র জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইন দেশটিই লুট করে নেয়ার জন্য এর নিরীহ জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হায়নার মত এর অসহায় জনগণকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকে, তখন তাঁদের উদ্ধারের জন্য বেশ কিছু বীর মুজাহিদ এ অসহায় জনতার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের ভিতর যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি ছিলো তাঁরা হলেন ঃ জেরুজালেমের মুফতী হাজী আমিন আল হুসাইনী, প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুসাইনী, এস, এস, কমাণ্ডো ফওজী আল কুতুব এবং মেজর আবদুল্লাহ তেল। এদের সহযোগী হিসেবে যাঁরা জান-প্রাণকে উৎসর্গ করলেন তাঁরা হলেন ঃ ইসমাঈল শাফাওয়েত পাশা, নীমরা টেনাস, ইমাইল ঘুরী, স্যামী আবু সওয়ান, ইবরাহিম আবু দাইয়াহ, আছিয়া হ্যালবি, খালেদ হুসাইনী, কামাল ইরিকাত, মুনির আবু ফাদেল, বাজহাত আবু গারবিয়াহ এবং ফাদেল রশিদ।

৪.১৪ মুফতী হাজী আমিন আল হুসাইনী

প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের জাতীয় নেতা ছিলেন জেরুজালেমের মুফতী হাজী আমিন আল হুসাইনী। তাঁর পুরো নাম ছিলো মোহাম্মদ সাঈদ হাজী আমিন আল হুসাইনী। তিনি পবিত্র নগরী জেরুজালেমের হুসাইনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হন।
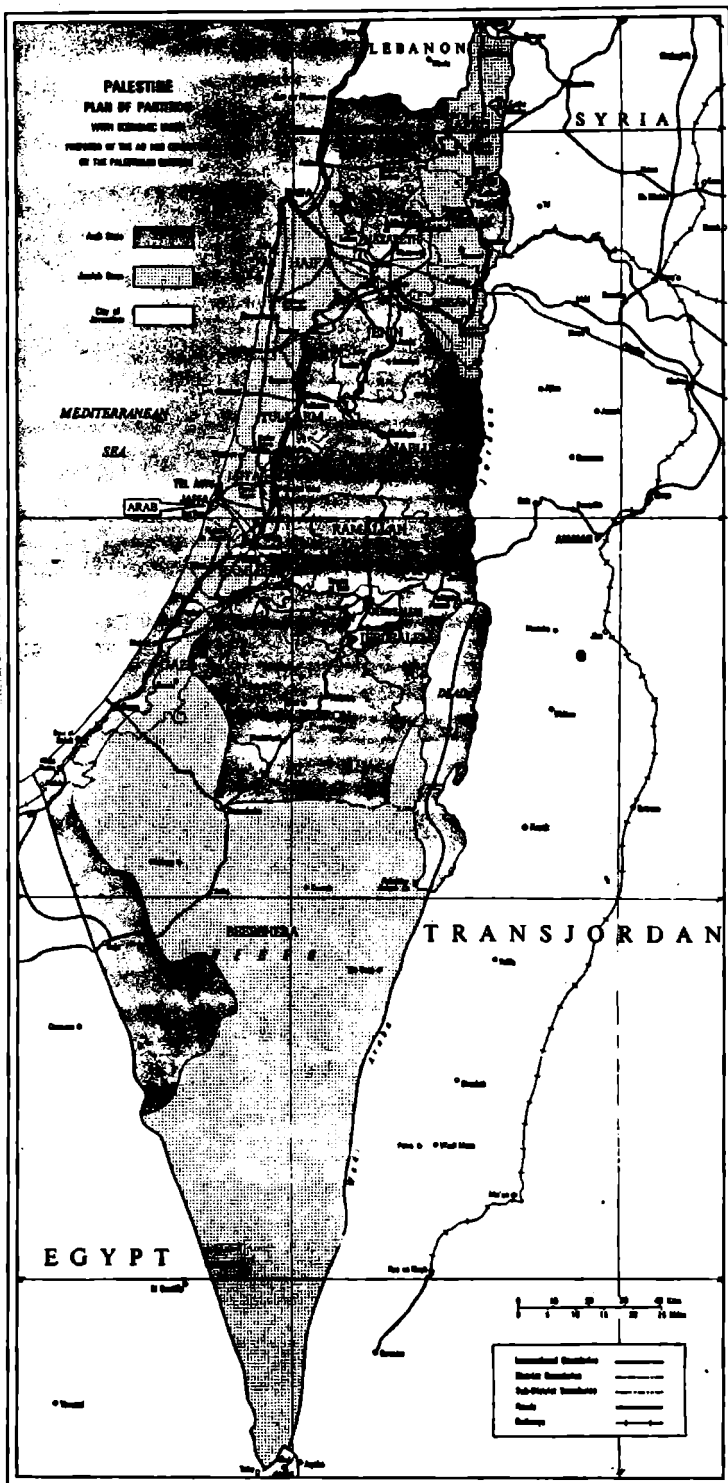
মানচিত্র ৪ঃ জাতিসংঘ কর্তৃক প্যালেস্টাইন বিভক্তির মানচিত্র।

চিত্র ১৯ ঃ জেরুজালেমের মুফতি হাজী আমিন আল হুসাইনী

অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সমাপন করে তিনি ওসমানীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর শারীরিক গঠন, চাহনী ভঙ্গি, হাটার স্টাইল, মনের দৃঢ়তা, তেজস্বীতা এবং বাচনভঙ্গির জন্য সকলেই আকৃষ্ট হতো। তাই শীঘ্রই বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর নজরে পড়ে যান তিনি। তাঁকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের কাজে ব্যবহারের জন্য একটা মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য তাঁকে শত প্রলোভন দেখিয়ে দলে ভিড়াবার চেষ্টা করা হয়। প্রথমে তাঁকে বড় বড় পার্টিতে (চা চক্রে) নিমন্ত্রণ করে অপ্রত্যাশিতভাবে আপ্যায়ন করতে থাকে। এ আপ্যায়নকে কেন্দ্র করে মাঝে মধ্যে তাঁকে ভালো ভালো জিনিস 'প্রেজেন্টেশন'ও দিতে থাকে। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁরা হাজী আমিনের মনকে নরম করার চেষ্টা চালায়। এরপর কুচক্রী বৃটিশ তাঁকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে বড় বড় পদও দান করতে থাকে। এভাবে বৃটিশ রাজ হাজী আমিনকে প্রচুর অর্থ প্রদানের সুযোগ পায়। এ অর্থ প্রদানের মাধ্যমেই কুচক্রীরা হাজী আমিনের বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস সাধন করে তাঁর অন্তরকে মমের মত গলানোর মহড়া চালায়। এজন্য বৃটিশ রাজ তাঁকে প্রথমে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্টের পদে নিয়োগ করেন এবং পরে সুদানের বৃটিশ উপদেষ্টার পদমর্যাদাও তাঁকে দেয়। এটাকে অজুহাত করে কুচক্রীরা হাজী আমিনকে লাখ লাখ পাউণ্ড ঘুষ প্রদানেরও সুযোগ পায় এবং তাঁকে প্রায় বশে এনে ফেলে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কুচক্রী বৃটিশদের আসল স্বরূপ হাজী আমিনের চোখের সামনে দিবালোকের ন্যায়ই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যায়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস সাধন করে তা গ্রাসের জন্য আরব জাতীয়তাবাদীদের তুর্কীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার, মহাযুদ্ধ থেমে গেলে আরব জাতীয়তাবাদীদের একটি পৃথক আবাসভূমি প্রদানের জন্য আরব জনতার মুখপাত্র হেজাজের শরীফ হুসাইনের সাথে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান ; আবার ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে (বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্য) ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়ার জন্য গোপনে 'সাইকো-পেকো' নামক চুক্তি, ফ্রান্স সরকারের সাথে স্বাক্ষর এবং

পরিশেষে কুখ্যাত ব্যালফোর ঘোষণা প্রদান ইত্যাদি প্রকাশ হবার সাথে সাথে হাজী আমিন সচকিত হয়ে ওঠেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশ পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হন। এরপর তিনি প্যালেস্টাইন ফিরে আসেন এবং প্যালেস্টাইনী জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য প্রচার অভিযান চালান। এতে করে প্যালেস্টাইনী যুব সমাজ খুব তাড়াতাড়ি সচেতন হয়ে পড়ে এবং কুচক্রীদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত হতে থাকে। এরপর বৃটিশ সামাজ্যবাদ ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতার দণ্ড হাতে করে যখন প্যালেস্টাইনী জনগণের বুকের ওপর এসে চেপে বসে তখন তাঁরা খুব একটা উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু পরে যখন কুচক্রীরা অবৈধভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাজার হাজার ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করাতে লাগলো তখন আর তারা স্থির থাকতে পারলো না। কারণ এ সমস্ত নবাগত ইহুদীরা এসে প্যালেস্টাইনীর জনসাধারণকে জোর পূর্বক তুলে দিয়ে তাঁদের বাড়ীঘর জবর দখল করে নিতে লাগলো। এতে করে প্যালেস্টাইনী যুব সমাজ প্যালেস্টাইনে ইহুদী ইমিগ্রেশন বন্ধ করার জন্য বাঁধা প্রদান করতে থাকে। এরই পরিণতি হিসেবে সর্বপ্রথম জাফা গেটে উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমূল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এ সংঘর্ষে ছয়জন প্যালেস্টাইনী আরব ও ছয়জন ইহুদী সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করেন। এ সংঘর্ষের জন্য বৃটিশ রাজ হাজী আমিনকে দায়ী করে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁরা বিচার করে দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা হাজী আমিন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আত্মগোপন করেন এবং ছদ্মবেশে ট্রান্সজর্দানে চলে যান।

প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট শাসনের রাজনৈতিক সচিব E. T. R. Chmond অত্যন্ত দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি প্যালেস্টাইনে গিয়ে হাজী আমিনের প্রভাব বুঝতে পেরে তাঁকে আবার পোষ মানানোর চেষ্টা করেন এবং এজন্য প্যালেস্টাইনের প্রথম বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার হারবার্ট স্যামুয়েলকে বিষয়টি জানিয়ে হাজী আমিনের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশকে বাতিল ঘোষণা করেন। উপরন্তু ইতিমধ্যে পবিত্র জেরুজালেমের মুফতীর সম্মানীয় পদটি শূন্য হলে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে দু'জনকে বাদ দিয়ে হাজী আমিনকেই উক্ত পদে নিয়োগ করেন। এভাবে কুচক্রী মহল সুকৌশলে প্যালেস্টাইনী মুক্তি আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিবার জন্য মুক্তি আন্দোলনের স্থপতি হাজী আমিনকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। এ সময় হাজী অমিনের বয়স মাত্র ২৮ বছর।

বৃটিশ কুচক্রীরা হাজী আমিনকে জেরুজালেমের মুফতীর পদ দান করার পর বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি চুপচাপ হয়ে যান। এতে কুচক্রীরা খুশীতে ডগমগ হয়। তারা ভাবতে লাগলো ঔষুধ ঠিকই ধরে গেছে। অথচ ব্যাপারটি ছিলো সম্পূর্ণ উল্টা। হাজী আমিন কুচক্রীদের ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য নিরবে কাজ করে যান এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে পবিত্র জেরুজালেমের "Supreme Muslim Council"-এর প্রেসিডেন্ট হন। ফলে প্যালেস্টাইনে যত প্রকার ধর্মীয় অর্থনৈতিক ফাণ্ড ছিলো তার তিনি সর্বময় কর্তা হয়ে যান। এভাবে নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধির কৌশলে প্যালেস্টাইনের মুসলিম সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসক হয়ে যান। এতে করে কুচক্রীদের বিরুদ্ধে মুক্তি পাগল প্যালেস্টাইনী জনগণকে সুসংগঠিত করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

১৯২৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ইহুদীদের একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে (Yom Kippur) বিলাপের প্রাচীরকে তারা নিজেদের মত করে ব্যবহারের চেষ্টা করে। এটাকে অজুহাত করে হাজী আমিন ধর্মভীরু ইহুদীদের ওপর দোষ চাপায় এ বলে যে, জায়নবাদী ইহুদীরা পবিত্র "কুব্বাতুস সাখরা" দখল করতে চায়। আর যেহেতু সে তখন মহান জেরুজালেম নগরীর বিশেষ সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত এবং জাতীয় নেতার আসনে প্রায় সমাসীন, সেহেতু তাঁর নির্দেশনায় পরবর্তীতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি দেখা যায় এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনী জনগণ মারমুখী হয়ে ওঠে। এরই পরিণতি হিসেবে পরের বছরেই এক জুম্মার নামাযের দিনে বিলাপের প্রাচীরের নিকট এক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ফলে একশো ইহুদী ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে। প্যালেস্টাইনীদের পক্ষেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ঘটনার পর থেকে হাজী আমিন আরো তৎপর হয়ে ওঠে এবং প্যালেস্টাইনের অপ্রাতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবি নেতায় পরিণত হন।

সামান্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে এরূপ বিরাট একটা কিছু সংঘটিত করার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা হাজী আমিনের থাকলেও এটা ছিলো খোদায়ী আইন ও ন্যায়নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এটা জায়নবাদী ইহুদীদের সৃষ্ট রাজনৈতিক কলা-কৌশল। তাদের থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ মুনাফেকী রাজনীতি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায়ই সংক্রামিত হয়। হাজী আমিন দীর্ঘক্ষণ ইহুদী ও ইহুদী কপট শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে থেকে থেকে এরূপ মানবতা বিরোধী অভিশপ্ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সিক্ত হন এবং তা মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন। সম্ভবত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন অতীতের মুসলিম রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দের ঐতিহ্যবাহী পবিত্র রাজনীতি এবং তাদের নিষ্কলুষ চারিত্রিক দৃঢ়তার সোনালী ইতিহাসের কথা। সে সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয় কখনও কপটতার পথ ধরে আসিনি ; বরং সত্য ও ন্যায়ের পথ ধরেই এসেছিল।

প্রকৃত মুসলমান যাঁরা তাঁরা সত্য সৈনিক। আর সত্য সৈনিকরা ন্যায়ের পথেই চলে ; তাই তাদের পাশে সর্বক্ষণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী এসে থাকে। এজন্য শত্রুদের তুলনায় সংখ্যায় স্বল্প হয়েও বিশাল শক্তিশালী বাহিনীর ওপর নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ তাঁরা করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টালে এর জ্বলন্ত প্রমাণ আপনারা একাধিক দেখতে পাবেন।

যাই হোক, ১৯৩৫ সালে হাজী আমিন প্যালেস্টাইনীদের গেরিলা যুদ্ধ কৌশল প্রশিক্ষণ দেন এবং অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদী প্রবেশের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেন। ফলে সশস্ত্র যুদ্ধ বেঁধে যায়।

এমনিভাবে হাজী আমিনের নেতৃত্বে যখন প্যালেস্টাইনী জনগণ দিনের পর দিন মারমুখো হয়ে ওঠে তখন বৃটিশ কুচক্রীরা প্যালেস্টাইনীদের দুর্বল করার জন্য তাদের ভেতর গৃহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। এটা সংঘটিত হয় হাজী আমিনের হুসাইনী বংশ ও প্রতিদ্বন্দ্বী জেরুজালেমের নাশাশিবি বংশের মধ্যে। এর ফলে প্রায় দু হাজার প্যালেস্টাইনী যুবক অকালেই মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় হাজী আমিনের জীবন সংশয় প্রকট হয়ে ওঠে। তাই তিনি নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেন। যখন বাইরে আসার প্রয়োজন হতো তখন তিনি বন্ধু হিটলারের দেয় বুলেট প্রুপ ওয়েষ্টকোট, মারসিডিস্ গাড়ী এবং দেহরক্ষীসহ বের হতেন।

বৃটিশরা যখন দেখলো কোনো ক্রমেই হাজী আমিনকে বাগে আনা যাচ্ছে না; বরং দিনের পর দিন সে শক্তিই সঞ্চয় করে চলেছে, তখন তারা তাঁকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর তাঁকে খুঁজা-খুঁজি শুরু করলে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রথমে জাফায় এবং পরে ফকিরের বেশ ধরে জেলেদের একটি নৌকার সাহায্যে সেখান থেকে লেবাননে চলে যান। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি বৈরুতে থেকেই জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনীর মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেন। বৈরুত তখন ফরাসীদের কর্তৃত্বাধীনে। এখানকার ফরাসী কর্তৃপক্ষ হাজী আমিনকে বন্দী করার চেষ্টা করলে তিনি চট করে সরে পড়েন এবং বাগদাদে গিয়ে আশ্রয় নেন। এখানে এসে তিনি অক্ষশক্তির সহায়তা নিয়ে ইরাকের প্রো-বৃটিশ সরকারকে

উৎখাতের চেষ্টা করেন ; কিন্তু তা ব্যর্থ হলে তিনি সেখান থেকে তেহরানে চলে যান। ইরান হাজী আমিনকে জায়গা দেয়ায় কুচক্রী বৃটিশরা ক্ষেপে যায় এবং ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধু রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ইরান আক্রমণ করে বসে। হাজী আমিন দ্রুত ইরান ত্যাগ করেন এবং বার্লিনে চলে যান। সেখানে গেলে এলযা হিটলার তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হাজী আমিন তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রভাব এবং হাজার হাজার মুসলিম সেচ্ছাসেবী দিয়ে হিটলারকে যুদ্ধে জয়ী করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জার্মানী পরাজয় বরণ করলে তিনি একটি প্লেনে করে প্যারিস চলে যান এবং ফরাসী সরকারের হাতে বন্দী হন। চার্চীমিডি কারাগারে তাঁকে বন্দী জীবন কাটাতে হয়। এটা ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা। ইতিমধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ফরাসী সরকারের সাথে বৃটেনের দ্বন্দ্ব শুরু হলে হাজী আমিনের মুক্তিলাভের একটা পথ হয়। প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত বৃটিশ সরকারকে নাজেহাল করে কিছুটা মনের ঝাল মিটানোর জন্য ফরাসী সরকার হাজী আমিনকে দেশে ফিরার অনুমতি দেন। এ সুযোগ পেয়েই হাজী আমিন ১৯৪৬ সালের ২৯ মে তারিখে নিজের বেশ ভূষার পরিবর্তন ও দাড়ি কেটে ছদ্মবেশ ধারণ করেন এবং একটি জাল পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন। তারপর আমেরিকার একটি TWA প্লেনে করে প্রথমে কায়রো ও পরে প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেন। এবার তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ডেভিড বেন গুরিয়ন যেমন ইহুদী গেরিলাদের সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত করছিলেন হাজী আমিনও অনুরূপ-ভাবে প্যালেস্টাইনী মুক্তি পাগল জনতাকে সুসংগঠিত ও পরিচালিত করেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রায় জয়লাভ করে ফেলেছিলেন কিন্তু এমনি অবস্থায় ঘুষখোর বাদশাহ আবদুল্লাহ সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। কারণ সে জোর করে প্যালেস্টাইনীদের ওপর যুদ্ধ বিরতি চাপিয়ে দেয়। এটা ছিল উভয় পক্ষের এক চরম ক্রান্তিলগ্ন—ইহুদী বাহিনীকে মেজর আবদুল্লাহ তেল, হাজী আমিন, আবদুল কাদের হুসাইনীর সহযোগিরা, ফওজী আল কুতুব ও অন্যান্য যোদ্ধারা পিটিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলেছিলো প্রায়। তাঁরা পিছু হটতে হটতে পাহাড়ের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয়। এমনি মুহূর্তে ট্রান্সজর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহর এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হাজী আমিন আল হুসাইনী হানাদার ইহুদীদের কবল থেকে স্বীয় মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলে জাতীয় নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং বৈরুতের পার্বত্য অঞ্চলে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাকী জীবন কাটান।

৪.১৫ আবদুল কাদের হুসাইনী

চিত্র ২০ ঃ প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুসাইনী।

প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুসাইনী প্রখ্যাত হুছাইনী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৮ সালে এবং হাজী আমিনের নিকটতম আত্মীয়। পিতা ছিলেন পবিত্র জেরুজালেম নগরীর মেয়র। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ যখন ম্যাণ্ডেট শাসকরূপে প্যালেস্টাইনে অবস্থান করে তখন থেকেই প্রতিটি ব্যাপারে তারা প্যালেস্টাইনী আরবদের সাথে বিমাতা সুলভ আচরণ করতে শুরু করে। এজন্য স্পষ্টভাষী মেয়র বৃটিশ কুচক্রীদের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। ফলে ১৯২০ সালে তাঁকে জেরুজালেমের মেয়র পদ হারাতে হয়। উল্লেখ্য প্যালেস্টাইনে ম্যাণ্ডেট শাসন চালু হবার পর জেরুজালেমের 'মুফতী' ও 'মেয়র' পদ প্রদানের ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকতো বৃটিশরা আবদুল কাদেরের পিতা তা জানতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বৃটিশ কুচক্রীদের সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম তিনি চালিয়েই যেতে থাকেন। ইতিমধ্যে আবদুল কাদের হুসাইনী কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন ১৯৩৩ সালে এবং পিতার সাথে যোগ দিয়ে বৃটিশ বিরোধী এ আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলেন। ফলে এ আন্দোলন শুধু প্যালেস্টাইন ভূ-খণ্ডেই আবদ্ধ থাকলো না বরং তা সুদূরের ইরাক ও মিশরকেও প্লাবিত করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা এর উৎসে গিয়ে আঘাত হানা শুরু করে ফলে আবদুল কাদেরের প্রাণ সংশয় দেখা দেয়। তখন তিনি আত্মগোপন করেন এবং সংগোপনে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁর গেরিলা অভিযানের নৈপুণ্যতা দেখে হাজী আমিন চমৎকৃত হন। তাই তিনি ভাবলেন যদি আবদুল কাদেরের মত কিছু যুবককে বিস্ফোরক বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা যায় তবে মুক্তি আন্দোলন সফল করে তোলা সহজতর হবে। তাই তিনি ১৯৩৮ সালে আবদুল কাদেরকে কতকগুলো যুবকের নেতৃত্ব দিয়ে নাজী পোল্যাণ্ডে পাঠান। সেখানে বিস্ফোরক বিদ্যার

কোর্স সমাপ্ত করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং এক শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। একদা এক সাংগঠনিক বক্তৃতায় এদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন ঃ

"Diplomacy and politics have failed to achieve our goals. The Arabs of Palestine had only one choice : 'We shall keep our honour and our country with our swords."

তারপর তিনি প্যালেস্টাইনের একটি মানচিত্র সম্মুখে রেখে যুদ্ধ স্ট্রাটেজী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গেরিলাদের শিক্ষা দেন। এরপর তিনি ইহুদীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করার জন্য জেরুজালেমের ইহুদী আবাসিক এলাকায় পাঠিয়ে দেন। কারণ ইহুদীরা বৃটিশদের সাথে যোগসাজশ, বহির্বিশ্ব থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ পত্র এনে এ সমস্ত আবাসিককে একটি শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করে। এটা প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরের মাসের ঘটনা। এ সময় আবদুল কাদের একজন চল্লিশ বছরের পরিপক্ক যুবক।

অবদুল কাদের হুসাইনী জন্মগতভাবেই ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তিনি যেমন ছিলেন দৈহিক শক্তির অধিকারী তেমনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমত্তারও অধিকারী, জাতীয় নেতা হাজী আমিনের যতগুলো সুনিপুণ লেফটেন্যান্ট ছিলেন তন্মধ্যে আবদুল কাদেরই ছিলেন সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত ও সাহসী। এজন্যে অন্যান্যদের তুলনায় তিনিই বেশি করে মুক্তি সংগ্রামে কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন। এভাবে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামকে এর ইপ্সিত লক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

কিন্তু পরে যখন মুক্তি সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। তখন অস্ত্রের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে লক্ষ অর্জনের পথে এটা এক পাহাড় সমান বাঁধা হয়ে দেখা দেয়। তাই তিনি দেশে দেশে অস্ত্রের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। পরিশেষে তিনি এর একটি সদগতি করার জন্য আরবলীগ বাহিনীর প্রধান জেনারেল শাফাওয়েত পাশার নিকট গিয়ে ধর্ণা দেন। কিন্তু সেখানে তিনি নিরাশ হন। জাতীয় জীবনের সবচেয়ে সংকটময় এ মুহূর্তে আবদুল কাদের হুসাইনীর প্রতি যিনি সব থেকে বেশি সহানুভূতিশীল হন তিনি হলেন তৎকালীন সিরিয় প্রেসিডেন্ট শুকুরী আল কুয়াতলী। ইতিমধ্যে দামেস্কে তাঁর নিকট সংবাদ গিয়ে পৌছায় যে, শত্রুরা প্যালেস্টাইনীদের প্রধান ব্যূহ ভেঙ্গে ফেলেছে এবং 'ক্যাস্টেল' ছিনিয়ে নিয়েছে। সংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং সিরিয় প্রেসিডেন্টের দেয় পঞ্চাশটি রাইফেল ও নিজের অর্থে কিনা তিনটে

ব্রেনগান স্বীয় কার গাড়ীর পিছনে আটকিয়ে জেরুজালেমে দ্রুত ফিরে আসেন। যখন জেরুজালেমে তিনি পৌছান তখন তাঁর হৃদয় ছিলো অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। কারণ যখন তিনি লুটেরাদের কাছ থেকে জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইন উদ্ধার কল্পে অস্ত্রের অভাবে পড়েন এবং তা সংগ্রহের জন্যে আরব রাষ্ট্র-সমূহের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ধর্ণা দেন তখন তাঁকে সবাই নিরাশ করে। আর এমনি অবস্থায় যখন তিনি উক্ত দুঃসংবাদটি শুনলেন তখন দারুণ-ভাবে ক্ষুব্ধ হন। এর ওপর ফিরার পথে দেখেন জেরুজালেমে লুণ্ঠনরত তাঁর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বি Kaukji-এর নিকট পাঠানোর জন্য আল-মাজাহ বিমান বন্দরে স্তূপিকৃত প্রচুর অত্যাধুনিক মারনাস্ত্র বিমানের অপেক্ষায় আছে। তাই তিনি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে জেরুজালেম ফিরে এসে সহযোগী গারবিয়াহকে বলেছিলেন ঃ "We have been betroyed"—আমরা প্রতারিত হয়েছি। কাজেই আমাদের সামনে মাত্র তিনটি পথ খোলা আছে ঃ হয় আমাদের মাতৃভূমি শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইরাকে গিয়ে ছদ্মবেশী কলঙ্কময় জীবনযাপন করতে হবে, নয়তো আত্মহত্যা করতে হবে, অথবা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে মাতৃভূমিকে শত্রু মুক্ত করার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে। কারণ আরব রাষ্ট্রপ্রধানেরা মুসলমান হলেও এখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিসমূহের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। অতএব আমাদেরকেই উদ্ধার করতে হবে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে।

এর সাথে সাথেই তিনি ইতিপূর্বে হাগানাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা দু'টি 'আর্মারড কার' গাড়ী আবু গারবিয়ার কাছ থেকে চেয়ে নেন। অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তিনি তাঁর একটিতে চেপে বসলেন এবং সহযোদ্ধা ইবরাহিম আবু দাইয়াহকে অপরটি প্রদান করে তাঁকে অতি সত্বর একশোজন গেরিলাসহ 'তূরা-রক-কোয়ারীর' নিকট সাক্ষাত করতে বললেন। এরপর তিনি হাই-স্পীডে কার গাড়ীটি হাকিয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে চলে গেলেন। এখান থেকে তিনি সেই হারানো ক্যাস্টেল পুনর্দখলের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল রাত ১০টার সময় তা অধিকারের জন্য অভিযান শুরু করেন। ইহুদীদের সন্ত্রাসবাদী দলগুলোও অবস্থা শোচনীয় ভেবে মরণ আঘাত হানা শুরু করে। ফলে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয়ে জড়িয়ে পড়ে। চার দিন চার রাত বৃষ্টির মত গোলাগুলী চলতে থাকে। এরই ভেতর তিনি ক্ষুধার্ত বাঘের মত শত্রুব্যূহ ভেদ করে অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। ফলে ক্যাস্টেলের পতন তাঁর হাতে তরান্বিত হয়ে পড়ে। যুদ্ধের ক্ষীপ্রতা এত তীব্র ছিলো যে, কে কোথায় অবস্থান নিয়েছে তা দেখার পর্যন্ত ফুরসৎ ছিলো না। এমতাবস্থায় 'কারমোয়েল' নামক একজন ইহুদী মেজর মাত্র পঁচিশ

গজ দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে। ফলে তিনি সাথে সাথেই সেখানে শাহাদাতবরণ করেন।

ইতিমধ্যে আবদুল কাদেরের কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে মুক্তিবাহিনীর জুনিয়র অফিসারেরা কানাঘুষা শুরু করে। এর পরিব্যাপ্তী ঘটতে ঘটতে শেষে জেরুজালেমের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গোটা প্যালেস্টাইন ব্যাপী এক হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে যায়। তাঁকে উদ্ধারের জন্য চতুর্দিক থেকে মুক্তি পাগল জনতা তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধারের জন্য পঙ্গপালের ন্যায় জেরুজালেমের দিকে ছুটে আসে। সাধারণ পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। বাস, ট্রাক ইত্যাদির মালিকগণ তাদের গাড়ীগুলো জেরুজালেমগামী সংগ্রামী জনতার পরিবহনের জন্য ছেড়ে দেয়। ফলে দেখতে দেখতে ক্যাস্টেলের আশপাশ মুক্তি যোদ্ধায় ভরে যায়। তাদের ধারণা ছিলো তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আবদুল কাদের হুছাইনী শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছে। তাই তারা তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধারের জন্য আগুন-গামী পতঙ্গের ন্যায়ই ক্যাস্টেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুমুল যুদ্ধের পর ক্যাস্টেল প্যালেস্টাইনী মুক্তি বাহিনীর করায়ত্বে আসে। এর সাথে সাথে শুরু হয় তাদের প্রিয় নেতাকে খুঁজে বের করার অভিযান। "অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এর পরের দৃশ্যটি ছিলো অত্যন্ত করুণ ও হৃদয় বিদারক। দৃশ্যটির বর্ণনা দিতে গিয়ে Larry Collins ও Douminiqw lapierre বলেছেন ঃ

"His discovery turned the Arab victory celebration in to a wake. The exullation of their triumph was replaced by terrified consternation, glee by hysteria. Men swarmed araund the body weeping and shrieking their grief, kissing the dead leader's ıace. Others mashed thir heads with the stook go ther rifles to mark their remorse."

এ সময় হাজী আমিন দামেস্কে জরুরী এক বৈঠকে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে নেতৃত্বস্থানীয় নেতাদের সম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর এ বীর সেনানীর শাহাদত বরণের সংবাদটি পৌঁছলে তখনই আলোচনা বন্ধ করে দেন এবং দ্রুত শূন্যস্থান পূরণের জন্য খালেদ হুছাইনীকে নিয়োগ করেন। ইনি ছিলেন শহীদ বীরের আপন ছোট ভাই। ফলে মুক্তি সংগ্রাম চলতেই থাকে। কিন্তু আবদুল কাদেরের অভাবে মুক্তি সংগ্রাম যেন দিনের পর দিন নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। কারণ প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে হারিয়ে মনের দিক দিয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল।

৪.১৬. এস. এস. কমাণ্ডো ফওজী আল কুতুব

চিত্র ২১ ঃ এস, এস, কম্যান্ডো ফওজী আল কুতুব।

ফওজী আল কুতুব প্যালেস্টাইনের অধিবাসী। হালকা পাতলা গড়ন ও স্বল্পভাষী ফওজী আল কুতুব ছিলেন দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ও চটপটে। হাতের আঙ্গুলগুলো ছিলো চিকন ও লম্বা এবং তবলচীদের আঙ্গুলের ন্যায়ই সদা চঞ্চল। তবে সেই চঞ্চলতা কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে সূর লহরী তুলার জন্য ছিল না ; বরং ঐ চঞ্চলতা ছিলো গ্রেনেড ছুড়ে হানাদার বাহিনীকে খতম করার জন্য। ১৯৩৬ সালের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি নিজেই জাইয়ীশ আবাসিক এলাকার অভ্যন্তর ভাগে ঢুকে পড়েন এবং পর পর ছাপ্পান্নটি হ্যাণ্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ করে শত্রুদের দারুণভাবে ঘায়েল করেন। এর ফলে ইহুদীরা ফওজী আল কুতুব সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে যায়। নয়া নয়া উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ফওজী আল কুতুব তাই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহুদীদের ঘায়েল করার একটি নয়া কৌশল আবিষ্কার করে ফেলেন। এবার তিনি গ্রেনেডগুলো এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফাটাতে লাগলেন যা ইহুদীরা ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারিনি। এখন থেকে সে পাইপ বেয়ে ছাদে ওঠে গিয়ে দড়ির সাহায্যে কয়েল ফিট করা গ্রেনেডগুলো ইহুদীদের শয়নকক্ষ ও অফিস আদালতের জানালার নিকট ঝুলিয়ে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে শুরু করে। কিছু দিন এভাবে চালানোর পর তাঁর এ যুদ্ধ কৌশল পরিত্যাগ করেন এবং আর একটি নয়া কৌশল আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি বেলুনের মধ্যে গ্রেনেড পুরে দিয়ে তা এমনভাবে সেট করে দিতেন যাতে ফিউজে লাগিয়ে দেয়া আগুন প্রথমে গিয়ে বেলুনে ধরে। ফলে যেই বেলুনের মুখে আগুন লাগতো, আর অমনি এমন তীব্র বেগে বেলুন থেকে গ্যাস বের হতো যার শব্দ পেয়ে ইহুদীদের আবাসিক এলাকার

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতো কি ঘটছে তা দেখার জন্য ; আর এরই ভেতর গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়ে সমবেত ইহুদী জনতার নাক-মুখ ঘায়েল করে দিতো। ফওজী আল কুতুব জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনে এরূপ অদ্ভুত কলা-কৌশলে গ্রেনেড ছুড়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, ইহুদীরা ঘরে বাইরে সর্বত্রই আতঙ্কের মধ্যে জীবন কাঁটাতে থাকে। এতে জায়নবাদী নেতারা ফওজী আল কতুবকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য হন্যে হয়ে পিছু লাগে। কিন্তু নাজী জার্মানী থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এস. এস. কমাণ্ডো ফওজী আল কুতুবকে নাগালে না পাওয়াই বেনগুরিয়ন নিজেই নিজের মাথার চুল ছিড়তে থাকেন। ডেভিড বেনগুরিয়নের এহেন দূরাবস্থা দেখে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিগুলোর চোখের জল টপাস্ টপাস্ করে পড়তে থাকে। তাই তারা যৌথ উদ্যোগে ফওজী আল কুতুবকে খুঁজা-খুঁজি শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ফওজী আল কুতুব প্রথমে দামেস্কে এবং পরে বাগদাদে গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানেও তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠলে বার্লিনে অবস্থানরত প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধার প্রধান কম্যাণ্ড হাজী আমিন আল হুসাইনী তাঁকে কাছে ডেকে নেন এবং বিস্ফোরণ বিদ্যায় আরো পারদর্শীতা অর্জনের জন্য নাজী হল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। এর এক বছর পরে হাজী আমিন তাঁকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি দল এস. এস. কমাণ্ডোর সাথে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ বিরোধী নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য সেখানে যেতে আদেশ করেন। এতে ফওজী দারুনভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং সরাসরি প্রত্যাখান করেন। জার্মানরা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করবে এটা তিনি কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর চরম আঘাত বলে মনে করতে থাকেন। হাজী আমিনের সাথে তাঁর এ মতদৈততা হিটলারের শক্তিশালী গোপন পুলিশ সংস্থা গেস্টেপোর চোখকে এড়াতে পারলো না। ফলে সাথে সাথে তাঁকে বন্দী হতে হলো এবং চোখ বেঁধে ব্রেসলিউ-এর অদূরে ইহুদী নির্যাতন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাঁকে ক্ষুধা পিপাসায় অন্যান্য হাজারো ইহুদী বন্দীদের সাথে শুকিয়ে কংকালসার হতে হলো। এখান থেকে জেনারেল হেনরিক হিমলার তাঁকে ইহুদীদের সাথে মরণগৃহে (Gass Chambers) নিয়ে যেতে চাইলে হাজী আমিন হুছাইনীর হস্তক্ষেপে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। তবে এ শর্তে যে, তাঁকে অবশ্যই জার্মান জাতির স্বপক্ষে আরব বিশ্বে প্রচারণা অভিযান চালাতে হবে। ফলে মুক্তিলাভের পর তাঁকে দিয়ে জার্মানরা এ কাজটি করিয়ে নেয়। এটা ১৯৪৫ সালের কথা। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিখ্যাত (Red Gaurd) লাল বাহিনী বার্লিনের ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ে। গোটা বার্লিন লাল আগুনে

চিত্র ২২, ২৩ ও ২৪ ঃ ফওজী আল কুতুবের দুঃসাহসিক অভিযানের তিনটি প্রামাণিক চিত্র।

দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এক দিকে আকাশ থেকে অগণিত জঙ্গী বিমানের গোলাবর্ষণ, অন্য দিকে অসংখ্য ট্যাঙ্কের বহর অপ্রতিহত গতিতে হিটলারের চেনসেলারীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জার্মান বাহিনীর শ্রেষ্ঠ ডিভিশনগুলো জার্মান জাতির প্রাণ প্রিয় 'ফুরার'কে রক্ষার জন্য সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সৈনিক প্রাচীর সৃষ্টি করেও শেষ রক্ষা করতে পারলো না— হাজার হাজার জার্মান বীর সৈনিককে পিষে দিয়ে মিত্র বাহিনীর ট্যাঙ্ক বহরগুলো নির্মমভাবে লক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জার্মান জাতীর এমনি সঙ্কটময় অবস্থার সুযোগে ফওজী আল কুতুব জার্মান থেকে পালানোর চেষ্টা চালান। প্রথমে তিনি মৃত একজন জার্মান সৈনিকের ইউনিফরম তাঁর শরীর থেকে খুলে তা নিজে পরে নেন; তারপর মিছামিছি হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ করে সোজা দক্ষিণে চলে যান এবং অষ্ট্রিয়ার সেলবার্গে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে এসে বিজয়ী আমেরিকান সৈন্যের হাতে বন্দী হন। চার মাস এভাবে কাটার পর আমেরিকান বাহিনী তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারে। ফলে তাঁকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পেয়ে তিনি সোজা দেশে ফিরে আসেন এবং পুরাতন বন্ধু আবদুল কাদের হুছাইনীর সাথে যোগ দেন এবং তাঁরই সাথে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৪৮ সালের শীত ও বসন্তকালীন সময়ের সন্ধিক্ষণে জেরুজালেমের গৃহযুদ্ধ এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। এ সময় ফওজী আল কুতুব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনায় এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখান।

৪.১৭ মেজর আবদুল্লাহ তেল

চিত্র ২৫ ঃ মেজর আবদুল্লাহ তেল

জেরুজালেমের হাগানা সন্ত্রাসবাদী দলের প্রধান পাণ্ডা ডেভিড শালটিলের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সত্য সৈনিক মেজর আবদুল্লাহ তেল। তিনি ছিলেন ট্রান্সজর্দানের এক জমিদার পরিবারের সন্তান। শৈশব কালের সেই দিনের করুণ দৃশ্যগুলো তিনি কখনও ভুলতে পারেননি, যেদিন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মুসলমান জাতির ঐক্যের প্রতীক বিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আর পরাজয়ের গ্লানি বুকে ধারণ করে রক্তাক্ত মুসলিম সৈন্যগুলো মাথানত করে তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে বন্দী অবস্থায় যাচ্ছিলো। সেদিন

কিশোর তেলের মনে বার বার এক প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো ; আর তা হলো কী কারণে বীর মুসলিম সেনানীরা এরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো ? এর সঠিক জবাব যখন তিনি কারোর কাছ থেকেই সেদিন জানতে পারেননি তখন থেকেই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অতীত ঘটনার প্রধান দলিল, ইতিহাসশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। ফলে তিনি ইতিহাস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানও অর্জন করেন। এরপর তাঁর জ্ঞান চক্ষুর কাছে এর সমস্ত রহস্যই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যায়। এভাবে ইহুদী ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিগুলোর গভীর ষড়যন্ত্রের জাল যখন তার জ্ঞান চক্ষুর সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসতে লাগলো তখন থেকেই মূলত তিনি চরম ভাবে বৃটিশ বিরোধী হয়ে উঠলেন। আর এরই পরিণতি হিসেবে তাঁকে মাত্র আঠারো বছর বয়সে বন্দী জীবনের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। সাতটি বছর পর তাঁকে এ মর্মে ছেড়ে দেয়া হয় যে, সে আর কখনও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করবে না ; বরং ম্যাণ্ডেট প্রশাসক হিসেবে প্যালেস্টাইনসহ আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশে যাতে বৃটিশরা আরামের সাথে শাসন কার্য চালাতে পারে তার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে যাবে। দূরদর্শী আবদুল্লাহ্ তেল শক্তি সঞ্চয় ও সুযোগ সন্ধানের জন্য আপাততঃ বৃটিশদের কথায় রাজি হয়ে যান। রাজি হলেই তারা ছাড়লো না—এর বাস্তব নজির স্থাপনের জন্য তাঁকে ইরাকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্যও যেতে হয়।

তাঁর বয়স যখন ত্রিশ বছর এবং আরব লিজিয়ন বাহিনীর মেজর পদে উন্নিত তখনই জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের এ ঘনঘটা। প্যালেস্টাইন খণ্ডিতকরণ তিনি কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এদিকে ট্রান্সজর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহ যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বেশ কিছু দিন চুপচাপ থাকেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আরব লীগ প্যালেস্টাইন উদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তিনিও এটাতে শরীক হতে নৈতিক দিক দিয়ে বাধ্য হন। এটাই মেজর আবদুল্লাহ্ তেলের কাংখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ এনে দেয়। ট্রান্সজর্দানের পক্ষ থেকে বাদশাহ আবদুল্লাহ প্যালেস্টাইন উদ্ধারের জন্য মেজর তেলকেই তাঁর প্রেরীত বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান। তেল মূলত এটাই সুদীর্ঘ দিন থেকে মনে মনে কামনা করছিলেন। তাই আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি কালবিলম্ব না করে জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইন লুণ্ঠনরত হানাদার ইহুদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবার জন্য দ্রুত জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর

হতে থাকেন। এতে বিচলিত হয়ে পড়ে ইহুদীদের প্রপিতা কুচক্রী পরাশক্তিগুলো। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলোর অভ্যন্তরে জায়নবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চরম প্রভাব ছিলো। তাই বিশেষ করে বৃটেন তার প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট প্রশাসকের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে কেন প্যালেস্টাইনী মুক্তিবাহিনী ইহুদীদের ওপর জয়ী হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তারা দেখলো মাত্র দুটি কারণেই ইহুদী বাহিনী পরাজয়ের জন্য দায়ী। এর একটি হচ্ছে, গোপনে প্যালেস্টাইনী যুবক-যুবতীদের গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে শক্তিশালী হওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে লীগ বাহিনীর যৌথ আক্রমণ। ম্যাণ্ডেট প্রশাসক এরপর প্যালেস্টাইনের আপামর জনসাধারণের ঘরে ঘরে তল্লাশী শুরু করে। এমনকি বোরকা পরিহিতা সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবতী মেয়েরাও রাস্তায় নামলে বৃটিশ সাফোক বাহিনী তাদের দেহ তল্লাশী করতে গিয়ে বেইজ্জতি করা শুরু করে। পরের পৃষ্ঠার চিত্রটি এরই বাস্তব প্রমাণ। এভাবে প্যালেস্টাইনী দলন শুরু হলে স্বভাবতই তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা দারুণভাবে ব্যহত হয়ে পড়ে। বৃটিশ সাফোক বাহিনী যখন প্যালেস্টাইনের যুবক-যুবতীদের ওপর এমনিভাবে অত্যাচার, বন্দী ও গোপন হত্যা চালিয়ে যাচ্ছিলো, একই সাথে তখন লীগ বাহিনীর ভেতর ভাঙ্গন ধরানোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে জোর তৎপরতা চলছিল। কুচক্রী ইহুদীরা প্রথমে প্যালেস্টাইন মুক্তি

চিত্র ২৬ ঃ প্যালেস্টাইনী মহিলাদের উপর বৃটিশ সাফোক বাহিনীর অত্যাচারের প্রামাণিক চিত্র।

আন্দোলনের প্রধান স্থপতি হাজী আমিন হুছাইনীর চারিত্রিক দৃঢ়তার ধ্বংস সাধনের ও মুক্তি আন্দোলনের গোপন পরিকল্পনা জানার জন্য এক যুবতী মহিলাকে রীতিমম ডিক্টেটিভ ট্রেনিং দিয়ে বার্লিনে হাজী আমিনের নিকট পাঠিয়ে দেয়। যে সুদীর্ঘদিন ধরে তাঁর 'মেইড সার্ভেন্ট' হিসেবে কাজ করতে থাকে এবং অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে সে হাজী আমিনের যাবতীয় পরিকল্পনা

ইহুদী হেড কোয়ার্টারে সংগোপনে পাচার করতে থাকে। কিন্তু হাজী আমিন তাঁর মেইড সার্ভেন্ট-এর আসল পরিচয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও জানতে পারেননি। তাই সেখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঐ মহিলাকে সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে এসেছিলেন। এদিকে লীগ বাহিনীর শক্তিশালী সদস্য বাদশাহ আবদুল্লাহকে বশে আনার জন্য আর একজন ছলনাময়ী রূপসী যুবতী নারীকে ট্রান্সজর্দানের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। নাম তার মিসেস গোল্ড মায়ার। বয়স তখন তার উনিশ হলেও কুটনীতির দিক দিয়ে তিনি খুবই নাম করে ফেলে। ঐ সময় তিনি Jewish Agency-এর রাজনৈতিক সেক্রেটারীর পদে সমাসীন। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ মায়ার জাতীর বৃহত্তম স্বার্থে জান-প্রাণকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হলো এবং ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে বাদশাহ আবদুল্লাহর প্রাসাদ ভবনে গিয়ে উপস্থিত হয়। পরিচিতি পর্ব শেষ হলে তাঁরা দুজনে অত্যন্ত নিরিবিলি ও আন্তরিক পরিবেশে এক নির্জন কক্ষে মিলিত হয় এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতী মায়ার তাঁর নারী হৃদয়ের কোমল উষ্ণতা দিয়ে বাদশাহ আবদুল্লাহর কঠিন হৃদয়কে মমের মত গলিয়ে ফেলে। ফলে তিনি এতই মহগ্রস্ত হন যে, মিসেস মায়ারের হাতে হাত রেখে কথা দেন তিনি এমন কোনো কাজ করবেন না, যাতে প্রেয়সী মায়ারের মনে এতটুকু ব্যাথার কারণ হতে পারে। বাদশাহ আবদুল্লাহর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মিসেস মায়ার জেরুজালেমে যুদ্ধ রত তাঁর বীর সিপাহী মেজর আবদুল্লাহ তেলের অগ্রাভিযান ওখানেই থামিয়ে দিবার জন্য শান্তির প্রস্তাব করে বসে। আবদুল্লাহ মায়ারের হাতে হাত রেখে কথা দেয় অবশ্যই তার অনুরোধ রক্ষা করবেন। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য মায়ার বেনগুরিয়নের দেয়া শেষ অস্ত্রটি শাহ আবদুল্লাহর ওপর ব্যবহার করেন। বিদায়ী মুহূর্তে মায়ার এ্যাটাসী ক্যাসটি খুলে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রিয়কে উপহার দিয়ে এলো। এতে ভাবে গদগদ হয়ে তিনি সাথে সাথে যুদ্ধ বন্ধের জন্য মেজর তেলকে আদেশ করে টেলিফোন করেন। অথচ এ সময় মেজর তেলের ও মুক্তিবাহিনীর নিকট সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের পতন আসন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর মারের চোটে হানাদার বাহিনী দারুণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং জেরুজালেমের পাহাড়ের ভেতর গিয়ে আত্মগোপন করতে শুরু করেছিল। আবদুল্লাহ এমন চূড়ান্ত বিজয়ের সময় এমন কাজ করতে বলবে এটা তিনি কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই তিনি টেলিফোনের রিসিভারটি কানের কাছ থেকে একটু সরিয়ে উদাসভাবে (ক্ষণিকের জন্য) ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। তারপর রিসিভারটি আবার স্বীয় কানের সাথে সংযোগ করে বলেনঃ

চিত্র ২৭ ঃ আরব বিশ্বের দ্বিতীয় বিশ্বাস ঘাতক বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দানে জেরুজালেমে প্রবেশ। সাথে বৃটিশচর জন ব্যাগোট গ্লাবের চিত্র।

"Your Majesty, how can I stop these war ? Thay feel victory is within reach."

এর জবাবে বাদশাহ আবদুল্লাহ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন : তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে, সে তারই অধীনস্থ একজন সৈনিক মাত্র। অতএব একজন আদর্শবান সৈনিকের মত বাদশাহর আদেশ মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং আমি দেখতে চাই সকাল দশটার ভেতরই যুদ্ধ থেমে গেছে—এগারটার দিকে পবিত্র কুব্বাতুস সাখরায় আমি গিয়ে জুম্মার নামায পড়বো। এরপরে আর কি বলার থাকে। ফলে ক্ষোভে, দুঃখে ও নিদ্রাহীন রজনীর দহনে মেজর তেল যেন একেবারে উন্মাদের ন্যায় হয়ে গেলেন এবং দেহরক্ষী আবু সাঈদ আবু রেককে ধাক্কা দিয়ে দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনী মুক্তিবাহিনী ও তেলের বাহিনী পুরাতন জেরুজালেম সম্পূর্ণভাবে দখল করে ফেলে। এটা ১৯৪৮ সালের জুনের এগারো তারিখের শক্রবারের ঘটনা। বাদশাহ আবদুল্লাহ ঠিক সময় মতই জেরুজালেমে গিয়ে উপস্থিত হন। এটা তারই সচিত্র প্রমাণ।

যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার সাথে সাথে গোটা প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্দানে জনগণের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। ফলে সর্বত্র করুণ শোকের ছায়া নেমে আসে। নিশ্চিত বিজয় থেকে এভাবে বঞ্চিত করার জন্য বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে জনতা অনবরত মিছিল করতে থাকে। ফলে শুধু প্যালেস্টাইনেই নয় স্বয়ং ট্রান্সজর্দানেও তাঁর নিরাপত্তার অভাব হয়ে পড়ে। তাই তাঁকে সবসময় কড়া নিরাপত্তার ভেতর থাকতে হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা তার হয়নি। ১৯৫১ সালের ১৯ জুলাই রোজ শুক্রবার তাঁকে একজন মুক্তিপাগল প্যালেস্টাইনীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

এদিকে জেরুজালেম উদ্ধারে মেজর আবদুল্লাহ তেলের কৃতিত্ব দেখে প্যালেস্টাইনবাসী তাঁকে দারুণভাবে ভালোবেসে ফেলে। ফলে সেও প্যালেস্টাইনীদের পক্ষে দু'-একটা কথা বলা শুরু করলে বাদশাহ আবদুল্লাহ মেজর তেলের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং সেনাবাহিনী থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেন। এরপর তাঁকে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেন। ফলে তিনি ১৯৫০ সালে কায়রোতে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সেখানে নির্বাসন জীবন যাপন করেন। তারপর বাদশাহ হোসেন ক্ষমতায় আসলে মেজর তেলকে ক্ষমা করে দেন এবং দেশে ফিরার অনুমতি পেয়ে তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন।

উপরোক্ত বীর সেনানীদের সহযোগী হিসেবে যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন তারা হলেন নিমরা টেনাস, ইমাইল ঘুরী, স্যামী আবু সোওয়ান, ইবরাহীম আবু দাইয়াহ এবং আরো অনেকে।

৪.১৮ নিমরা টেনাস 'দি টাইগ্রেস'

চিত্র ২৮ ঃ নিমরা টেনাস 'দি টাইগ্রেস'

নিমরা টেনাস প্যালেস্টাইনের একজন যুবতী মহিলা। ১৯২৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন একজন টেলিফোন অপারেটর। পবিত্র কুব্বাতুস সাখরা থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে রওজাই হাইস্কুলের নিকট নিমরার টেলিফোন ভবনটি ছিলো। এখান থেকেই তিনি ইহুদীদের আক্রমণ পরিকল্পনার যাবতীয় খবরা-খবর সংগ্রহ করতেন এবং ঐগুলোর তরঙ্গরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পৃথক করে এমনভাবে মেশিনের সাহায্যে সংরক্ষণ করতেন যা পরে আবার তিনি সংযোজিত করে পুরো তথ্যটি আবিষ্কার করতে পারতেন। ইহুদীদের ভেতর অবস্থান করে এরূপ করা সত্যিই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কাজ। তবুও তিনি সবকিছু জেনে শুনেই এ দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যান এবং মুক্তি সংগ্রামকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। মুক্তি সংগ্রামে তাঁর এরূপ বুদ্ধিমত্তা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, কূটকৌশল, সাহসিকতা এবং নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও শত্রুদের মধ্যে অবস্থান করে অত্যন্ত চাতুরতার সাথে তাদের গোপন তথ্য প্যালেস্টাইন মুক্তিবাহিনীর নিকট পাচারের নৈপুণ্যতা দেখে প্যালেস্টাইন বীর সেনানীরা তাঁকে 'টাইগ্রেস' উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর এ অবদানের জন্যই তিনি অদ্যাবধিও প্যালেস্টাইনের আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন। তৎকালীন আরব নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি জর্দানে চলে যান। জর্দান সরকার তাঁকে পরে "Refugee Department"-এ চাকুরী দেন।

৪.১৯ ইমাঈল ঘুরী

ইমাঈল ঘুরী ১৯০৮ সালে প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন। বীর কেশরী আবদুল কাদের হুসাইনী শাহাদাতবরণ করলে তাঁর অধীনস্থ বিরাট বাহিনীকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়। হাজী আমিন এর মূল অংশের পরিচালনার ভার দেন শহীদ আবদুল কাদেরের ছোট ভাই খালেদ হুছাইনীর ওপর। আর বাবুল ওয়াদ-এর নিকট এর যে অংশটি ছিলো তার

চিত্র ২৯ ঃ ইমাইল ঘুরী

পরিচালনার ভার দেন বীর সেনানীর সহযোগী এ ইমাঈল ঘুরীর ওপর। তিনি এমন এক মুহূর্তে যুদ্ধ পরিচালনার ভার নেন যখন প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের নৈতিক বল একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল এবং অর্থ ও অস্ত্রের অভাবে ছিলো জর্জরিত। এমতাবস্থায় দেয়ার ইয়াসীনের হত্যাকাণ্ডের বিভৎসতার খবর শুনে যখন গ্রামের জনগণ পাহাড় পর্বতের ভেতর দিয়ে পালানো শুরু করে তখন প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের পক্ষে গুলী ছুড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ইমাঈল ঘুরী যুদ্ধের কলা-কৌশল (আবদুল কাদের হুসাইনীর) পাল্টিয়ে নতুন পথ অনুসরণ করেন। এখন থেকে তিনি রাস্তায় বিরাট বিরাট ব্যারিকেট সৃষ্টি করে শত্রুর অগ্রাভিযানে বাঁধার সৃষ্টি করতে থাকেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এ সমস্ত ব্যারিকেটের আশেপাশে গেরিলা গ্রুপগুলো আত্মগোপন করে থাকতো। আর হানাদার বাহিনী জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে এ সমস্ত ব্যারিকেটে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে পিছানোর বা নেমে পরিস্কার করার চেষ্টা করতেই প্যালেস্টাইনী গেরিলারা আঘাত হেনে তাদের ধ্বংস করে দিতো। এভাবে তিনি সামান্য সংখ্যক হতোদ্দম সৈন্য নিয়েই সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখান। পরে তিনি জর্দান পার্লামেন্টের একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এবং জর্দান সরকারের সাথে ফেদাইনদের সম্পর্কের উন্নতির জন্য কাজ করে যান।

৪.২০ স্যামী আবু সোওয়ান

স্যামী আবু সোওয়ান ১৯১৯ সালে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। এরূপ একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। পরে তিনি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে শ্রেণীর স্তরগুলো পেরিয়ে যেতে থাকেন। আই. এস. সি. পাশ করার পর তিনি ডাক্তারী পড়া শুরু করেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে একজন দন্ত চিকিৎসক হিসেবে বেরিয়ে আসেন। তিনি ইচ্ছা করলে সরকারী চাকুরী করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি প্রাইভেট প্রাক্‌টিস করা অধিক শ্রেয় বলে মনে করেন।

চিত্র ৩০ ঃ স্যামী আবু সোয়ান

প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসন প্রবর্তন হলে মহান জেরুজালেম নগরীর রাস্তা-ঘাটের নামের অনেক পরিবর্তন ঘটে 'রাজা পঞ্চম জর্জ এভিনিউ' এর একটি উদাহরণ। স্যামী আবু সোওয়ান উক্ত রাস্তার এক পাশে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে প্রচুর ঔষধ-পত্র নিয়ে প্রাক্টিস শুরু করেন।

১৯৩৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে অবৈধ ইহুদী প্রবেশকে কেন্দ্র করে অবস্থার দারুন অবনতি ঘটে। জায়নবাদী ইহুদীরা প্যালেস্টাইনীদের ঘরবাড়ী জোর করে ছিনিয়ে নিতে থাকে। এর প্রতিবাদ করে প্যালেস্টাইনের মজলুম জনতা মিছিল করে বৃটিশদের অফিস ভবনের সম্মুখে জমায়েত হলে জায়নবাদী ইহুদীরা পাল্টা মিছিল করে তাদের আক্রমণ করার পায়তারা চালায়। এরূপ একটি মিছিলের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রবীন অধ্যাপক মিঃ আইজাক রোটেনবার্গকে দেখে তিনি অবাক হন। কারণ তিনি এতদিন মিঃ রোটেনবার্গকে অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং শান্তি প্রিয় বলেই জানতেন। কিন্তু এরূপ একটি ভদ্র ইহুদীর ভেতরে এরূপ বাড়বনল লুকিয়ে থাকতে পারে তা তিনি ইতিপূর্বে চিন্তাও করতে পারেননি। কিন্তু সত্যিই যখন তা তিনি সচক্ষে দেখলেন তখন তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি ভাবলেন যাদের সাথে শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত সখ্যতার সাথে বসবাস করে আসছেন তারাই যখন আমাদের মাতৃভূমি থেকে আমাদের সর্বস্ব লুট করে তাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত তখন বহিরাগত সন্ত্রাসবাদী ইহুদীরা কি জঘন্য হতে পারে তা ভাবতেও ভয়ে গাঁ শিহরিয়ে ওঠে। স্যামী আবু সোওয়ানের এ ভাবনা যে অত্যন্ত বাস্তব ভাবনা ছিলো তা পরবর্তীকালের ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় তিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাই এরপর থেকে তিনি ইহুদী বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং প্যালেস্টাইনে অবৈধ ইহুদী প্রবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ফলে তিনি সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের রোষানলে পড়েন এবং পরে তিনি প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হন। এ কারণে তিনি বাড়ী-ঘর ছেড়ে জেরুজালেমের একটি আবাসিক হোটেলে সপরিবারে গিয়ে ওঠেন। হোটেলটির নাম ছিলো 'সেমিরামিস' হোটেল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী ইহুদীরা তাঁর পিছনে ছায়ার মত সর্বত্র অনুসরণ করতে

থাকে। ফলে এরূপ একটি নিরাপদ স্থানে এসেও তিনি ও তাঁর পরিবার পরিজন শেষ রক্ষা পাননি।

একদা দিবাগত রাতে ভীষণ বর্ষণ শুরু হলো। প্যালেস্টাইনী যুবকেরা পালাক্রমে মুসলিম আবাসিক এলাকাগুলো পাহারা দিচ্ছিলো। কিন্তু মুষল ধারে বৃষ্টির দরুন সেন্ট্রিরা ঠিক মত ডিউটি পালন করতে ব্যর্থ হন। এরই সুযোগ নেয় সন্ত্রাসবাদীরা। এ্যাভর‍্যাম গীল (Avram Gil) ও মিশেল স্যাচ্যাম (Mishael Shacham) নামে দু'জন হাগানা গ্রুপের গেরিলা হোটেলের এক পাশে ডিনামাইট ফিট করে বিল্ডিংটি উড়িয়ে দেয়। ফলে আবু সোওয়ানের পিতা-মাতা, তিন চাচা ও দু' চাচি সাথে সাথেই শাহাদাত বরণ করেন। এ সাথে হোটেলের প্রায় সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু দুটি প্রাণ বলতে গেলে এক রকম অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। এদের একজন হলেন স্যামী আবু সোওয়ান। তিনি সমস্ত প্রিয়জনের এরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়লেও তা শীঘ্রই তিনি সামলিয়ে নিতে সক্ষম হন এবং এর উচিত জবাব দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হতে থাকেন। এরপর তিনি অত্যন্ত ক্ষীপ্রতা সহকারে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। কিন্তু ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিগুলোর ক্রিড়নক তৎকালীন আরব রাষ্ট্র প্রধানদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ তিনি চূড়ান্ত লক্ষে পৌছাতে ব্যর্থ হন। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি বৈরুতে চলে যান এবং সেখানে পূর্ব পেশায় নিয়োজিত হন।

৪.২১ ইবরাহীম আবু দাইয়াহ

ইবরাহীম আবু দাইয়াহ ১৯১৯ সালে প্যালেস্টাইনের হেব্রনে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি প্রায় নিরক্ষরই থেকে যান। কিন্তু আসলে তিনি প্রতিভাবান ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রতিটি কাজে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। আর এজন্যই তিনি জেরুজালেমের মুফতী হাজী আমিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কর্মনিষ্ঠায় বিমুগ্ধ হয়ে হাজী আমিন তাঁকে 'সিভিল ডিফেন্সের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইনে অবৈধ ইহুদী প্রবেশের

চিত্র ৩১ ঃ ইব্রাহীম আবু দাইয়াহ

প্রতিবাদে প্যালেস্টাইনী আরবরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আবু দাইয়াহ এর নেতৃত্ব দেন এবং এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় থেকে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, সাহসিকতা, নৈপুণ্যতা দেখে হাজী আমিন চমৎকৃত হন এবং পদমর্যাদা বাড়িয়ে এক দল সুশিক্ষিত বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে হেব্রনের চারপাশের সমস্ত পাহাড়িয়া অঞ্চলসহ গোটা দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেন। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল আবদুল কাদের হুছাইনী হারানো ক্যাস্টেল গ্রামটি পুনর্দখলের জন্য দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। কারণ মিলিটারী স্ট্রাটেজির দিক দিয়ে ক্যাস্টেলের অবস্থান এমন যে, এটা যে পক্ষের হাতে থাকবে তার প্রতিপক্ষ কোনো মতেই বাইরে থেকে জেরুজালেম নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই ক্যাস্টেলের পতন মানেই মহান জেরুজালেম নগরীর পতন। কারণ অবরুদ্ধ জেরুজালেম নগরীতে বিজয়ী পক্ষ আর কতক্ষণ লড়তে পারবে ? যদি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় ? এটা বীর সেনানী আবদুল কাদের হুছাইনী বুঝতে পেরেই মূল বাহিনীকে ভেঙ্গে দু'টি দলে ভাগ করেন। এর একটির নেতৃত্ব দেন আবদুল কাদের নিজে। আর বাকী অংশটির নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন আবু দাইয়াহর ওপর। ফলে দ্বিমুখী আক্রমণে গ্যাজিটের নেতৃত্বাধীন হাগানা বাহিনী ক্যাস্টেলে দারুণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তার উদ্ধারকল্পে ইতিমধ্যে উজিনারসিস-এর নেতৃত্বে পালমাক বাহিনী এসে যোগ দিলে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যায়। ঠিক এমনি এক সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে বীর কেশরী আবদুল কাদের হুসাইনী শত্রুব্যূহ বেদ করে তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে বুলেটবিদ্ধ হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। এরপর আবু দাইয়াহ একাই সমস্ত মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিবার গুরুভার কাঁধে তুলে নেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইতিমধ্যে আবদুল কাদেরের নিখোঁজ সংবাদটি কানে কানে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে চারদিক থেকে মুক্তিবাহিনী ক্যাস্টেলের দিকে ছুটে আসে। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ক্যাস্টেল প্যালেস্টাইনদের হাতে আসে। এতে আবু দাইয়াহর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর হাজী আমিন তাঁকে ক্যাটামোনে পাঠান। কিন্তু পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যের অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত ক্যাটামোন উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। জেরুজালেমে হানাদারদের এটাই ছিলো প্রথম মহাবিজয়।

৪.২২ জেরুজালেমের কালো রজনী

কিন্তু এ বিজয় লাভ করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা যে নৃশংসতার আশ্রয় নিলো তা স্বয়ং নাজী নৃশংসতাকেও হার মানিয়ে দিলো। অথচ যে সমস্ত

ইহুদী সম্প্রদায় এতদিন পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে বসবাস করছিলো তাদের মধ্যে এক অনাবিল শান্তি বিরাজ করছিলো। এ প্রসঙ্গে মিঃ কলিন্স ও লেপিয়ার বলেন ঃ

"Arab-Jewish relations in the Old City had always been good. Most of the property in the quarter was Arab-0wned and one of its familiar sights was the Arab rent collector making his way from house to house, pausing in each for the rent and a ritual cup of coffee. Here the Islamic respect for men of religion hed been naturally extended to the quarters poor artisans and shopkeepers, the most natural of bond, poverty, tied them to their Arab neighbours."

৪.২৩ প্যালেস্টাইনীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত

কিন্তু জায়নবাদীদের নির্দেশক্রমে উক্ত সন্ত্রাসবাদী গোপন দলগুলো জেরুজালেমসহ প্যালেস্টাইনের সর্বত্র সে আগুন জ্বালিয়ে দিলো তার মুকাবিলার জন্য সর্বপ্রথম যে দু'টি নির্ভিক প্রাণ এগিয়ে গেলেন তারা হলেন জেরুজালেম শার্দুল আবদুল কাদের হুছাইনী ও মুফতী হাজী আমিন আল হুসাইনী। এতে বিশেষ করে পবিত্র জেরুজালেমে যে ঘোলাটে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে ভীত হয়ে যে সমস্ত আবাসিক এলাকায় ইহুদীরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ ছিলো তারা নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া উচিত ভেবে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যেতে থাকে। তবে এ অন্ধকারে লুকিয়ে যাওয়ার পিছনে কিন্তু আরব ভীতি ছিলো না, ভীতি জায়নবাদী কর্মী ও তার নেতা ডেভিড বেনগুরিয়নের ; যিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নীলনকশা ও কলা-কৌশল রচনা করতেন। তিনি বিশেষ করে প্যারা মিলিটারী হাগানাদের হুকুম দেন যে, যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো ইহুদী ও ইহুদী পরিবার তাদের বাড়ী-ঘর, খামার, কিবুজ ও অফিসাদি থেকে না নড়ে, যে পর্যন্ত না তাঁর নির্দেশ পায়। কিন্তু প্রাণের মায়া সবকিছুর উর্ধে। তাই তারা বিশেষ করে হাগানাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে স্ব স্ব নিরাপদ স্থানে আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারোর আশ্রয়ে চলে যায়। এ অবস্থার মুকাবিলার জন্য জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, যেভাবেই হোক বিশেষ করে জেরুজালেম শহরের যে সমস্ত আবাসিক এলাকায় ইহুদীরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সেখান থেকে পূর্বাহ্নেই সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনী আরবদের বিতাড়িত করতে হবে। এর প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ তারা রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঐ সমস্ত আবাসিক এলাকায়

সন্তর্পণে অনুপ্রবেশ করে এবং নানারূপ ভীতিপ্রদ শব্দ সম্বলিত পোস্টার প্রাচীরের গা, ঘরের দেওয়াল, দরজা-জানালা ইত্যাদি ছেয়ে দেয়। আর হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে সেগুলো অনুরূপ সতর্কতার সাথে প্যালেস্টাইনী আরবদের কার-গাড়ীর উইণ্ডশীলে' এঁটে দিয়ে আসে। এতে লেখা ছিলো ঃ "...Leave for your own safety...." এমনিভাবে ইহুদী সন্ত্রাসবাদীরা জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইনেই এমন এক সন্ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে যা সত্যিই বর্ণনাতীত। কিন্তু এত কিছুর সত্ত্বেও যখন জেরুজালেমবাসীদের তাঁদের বাড়ী-ঘর থেকে তাড়ানো গেলো না তখন তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে তারা টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে, বৈদ্যুতিক সংযোগ নষ্ট করে, মার্কিন, ফ্রান্স ও বৃটেন থেকে সরবরাহকৃত হাজার হাজার রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে এবং গ্রেনেড ছুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ফলে ভীতি-বিহ্বল মায়ের বুকে কচি শিশুর কান্নার আওয়াজে পরিস্থিতি এমন করে তোলে যে তা সহ্য করা দায় হয়ে পড়ে। সুতরাং বাধ্য হয়ে জেরুজালেমের সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারগুলো পূর্বাহ্নেই নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বাড়ী পাহারা দিবার জন্য থাকে শুধু যুবক-বৃদ্ধ মানুষের দল।

৪.২৪ বিরামহীন সংঘর্ষ

ইতিমধ্যে চূড়ান্ত গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। প্যালেস্টাইনী আরব গেরিলাদের প্রথম নেতৃত্ব যিনি দিলেন তিনি হলেন স্বনামধন্য আবদুল কাদের হুসাইনী ; যিনি ১৯৩৪ সালে প্যালেস্টাইনের বৃটিশ অছি সরকার কর্তৃক দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলো। জাতির এ দুর্দিনে তিনি জীবনকে বাজি রেখে ১৯৪৮ সালে আবার সন্তর্পণে জেরুজালেমে অনুপ্রবেশ করেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে যুবকদের সুসংগঠিত করেন এবং বিরাট গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে গেরিলারা প্রথম আক্রমণ চালায় সালহেদ্রিয়াতে ; যেখানে হাগানাদের একক গ্রুপ ঘাঁটি করে মুসলমান আবাসিক এলাকাতে আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। এ উদ্দেশ্যে তিনি বাছাই করা ১২০ জন গেরিলাকে হেব্রন থেকে নিয়ে আসেন এবং খুব সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। ১৫ মিনিট গোলা-বিনিময়ের পর সন্ত্রাসবাদী হাগানারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সেখান থেকে পলায়ন করে। ইতিমধ্যে গোলাগুলীর শব্দ শুনে বৃটিশ বাহিনী অগ্রসর হলে আবদুল কাদের হুছাইনী তাঁর দলবল নিয়ে চট্ করে সরে পড়েন।

দিন যত যায় ততই পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নেয়। জেরুজালেমের মুফতীর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার লোক—বিশেষ করে পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে রক্তঝরা থেকে রক্ষার জন্য ছুটে এলেও তারা ইসরাঈলদের আধুনিক যুদ্ধ-কৌশলের নিকট এঁটে উঠতে পারছিলো না। কারণ জায়নবাদী সংস্থা ও পরাশক্তিদের পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিক বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে অত্যাধুনিক সামরিক কৌশলে পারদর্শী বহু ইহুদী যুবককে প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রসহ পাঠানো হয়। এদিকে প্যালেস্টাইনে অধ্যয়নরত হাজার হাজার ইহুদী ছাত্রসমাজ তাদের গোপন আড্ডাখানায় বোমা, ছোট আকারের রাইফেল, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের ন্যায় নানা জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে থাকে। এমনিভাবে তারা জেরুজালেম ও তার আশপাশে তেল-আবিবে এবং হাইফাতে প্রচুর গোপন অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলে। আর এ সমস্ত কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর খুচরা অংশসমূহ তারা ফ্রান্স ও আমেরিকা থেকে পেতে থাকে।

ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইনী-আরব যুবক-যুবতীরাও অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁরা তাদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সবাই এস. এস. কমান্ডো ফওজী আল কুতুব ও আবদুল কাদের হুসাইনীর পরিচালনায় দেশের নানা স্থানে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে ক্ষুধার্থ বাঘের ন্যায়ই জেরুজালেমে ফিরে আসেন। ফলে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। একদিকে বৃটিশ রাজকীয় বাহিনীর অবস্থান ; আর দু দিকে যুদ্ধংদেহী দু'টি দল অবস্থান নিয়ে যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ শুরু করে তার মাঝখানে পড়ে পবিত্র জেরুজালেম আদরিনীর যে করুণ দশার সৃষ্টি হয়, তা সত্যিই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয় বিদারক।

যুদ্ধমান পক্ষগুলোর জন্য জেরুজালেমের প্রতিটি বিল্ডিং যেন এক একটি দুর্গে পরিণত হয়। তথাকথিত নিরপেক্ষ বৃটিশ বাহিনী খোদ জেরুজালেমেই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। মৌমাছিরা মৌচাকের ওপর যেরূপ অবস্থান নিয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধা ও জায়নবাদী গেরিলারা জেরুজালেম নগরীতে তাদের স্ব স্ব অবস্থান নিয়ে রক্তের হোলীখেলায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। শহরের প্রতিটি অলি-গলি এবং এ বাড়ী ও বাড়ীর আনাচ-কানাচ থেকে তারা একে অপরের ওপর বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণ করে এবং একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রাণপণ চেষ্টা চালায়।

কথায় বলে পরের চেয়ে ঘরের শত্রুই অধিক মারাত্মক। আর এ মারাত্মক শত্রুই প্যালেস্টাইনী আরবদের মধ্যে বিরাজ করছিলো। যারা চুরি করে

জেরুজালেমে বসবাসকারী আর্মেনিয়ান কোয়াটারের মাধ্যমে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র হাগানাদের নিকট অর্থের লোভে বিক্রি করছিলো। এ প্রসঙ্গে মিঃ কলিন্‌স ও লেপিয়ারের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা বলেন ঃ

"In Tel-Aviv, Haifa and above all, Jerusalem, the Haganah added to it arsenal by buying arms from its enimies. Hidden under trackloads of Carrots or Califlower, a few rifles and cases of ammunition thus reaphed the Haganah's hand, sold to them by the Arabs through Armenian intermediaries."

ফলে যুদ্ধে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এটাকে সামলে নিতে প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুসাইনী, এস. এস. কমাণ্ডো ফওজী আল কুতুব এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হাজী আমিন হুসাইনী অত্যন্ত সাহসিকতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন। যুদ্ধের স্ট্রাটেজি পাল্টিয়ে তাঁরা আবার নতুন করে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বিন্যাস করেন। ফলে দেখতে দেখতে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। এ সমস্ত মহান নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলস্বরূপ হাজার হাজার প্যালেস্টাইনী ট্রেনিং নেয় এবং আগুন-গামী পতঙ্গের ন্যায়ই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে মুক্তি সংগ্রামের পটপরিবর্তন হয়ে প্যালেস্টাইনীদের স্বপক্ষে যেতে থাকে।

৪.২৫ নগ্নতার চরমসীমায় পরাশক্তিগুলো

অবস্থার বেগতিক দেখে পরাশক্তিগুলো সচকিত হয়ে ওঠে এবং প্যালেস্টাইনীদের সাফল্যের কারণ উদঘাটনের জন্য বৃটিশ সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে। ফলে প্যালেস্টাইনের বৃটিশ জান্তারা প্যালেস্টাইনের জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করে। এতে জনগণের জীবন বিষিয়ে ওঠে। প্যালেস্টাইনের মুক্তিপাগল জনতা তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য গোপনে যে ট্রেনিং নিচ্ছিলো তা থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা চলে। অন্যদিকে এ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো জায়নবাদীদের ফ্রান্সে, বৃটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের অত্যাধুনিক কলা-কৌশল সম্বন্ধে ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্র সহকারে স্রোতের ন্যায় প্যালেস্টাইনে পাঠাতে থাকে। এতদসত্ত্বেও ক্ষীপ্ত প্যালেস্টাইনী মুক্তিপাগল জনতা ইহুদীদের ওপর বিজয় লাভ করতে থাকে। এর প্রধান কারণ তাদের এ সংগ্রাম ছিলো বাঁচা-মরার সংগ্রাম। তাই উক্ত সংগ্রামে জয়যুক্ত হবার জন্য তাঁরা প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিলো, ফলে তাঁরা

প্যালেস্টাইন ভূ-খণ্ডের ৮২% এলাকার ওপর তখনও নিজেদের কর্তৃত্ব বলবৎ রাখতে সক্ষম হয়।

এতে করে ইহুদী জাতির প্রপিতা পশ্চিমা শক্তিগুলোর আঁতে গিয়ে ঘাঁ লাগে—বিচলিত হয়ে পড়ে তারা। ফলে তারা আরো উলঙ্গপণার আশ্রয় নেয়। চাপ প্রয়োগ করতে থাকে প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত বৃটিশ হাই-কমাণ্ডোদের ওপর। এর পরে বৃটিশ বাহিনী ইহুদীদের সন্ত্রাসবাদী দল ইরগুইন ও হাগানাদের ইউনিফরম পরে ইহুদীদের সপক্ষে লড়তে থাকে। প্যালেস্টাইনীদের এহেন দুর্দিনে তৎকালীন সৌদী বাদশাহ ইবনে সৌউদ তড়িঘড়ি করে সাহায্যের জন্য বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেন। প্যালেস্টাইনী ভাইদের দুঃখে তিনি কাতর হলেও তাঁদের জন্য যে রাইফেলগুলো পাঠিয়েছিলেন তা দেখে ক্ষোভে-দুঃখে ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায়ই ক্ষীপ্র আবদুল কাদের হুসাইনী ওগুলো নিজের হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ ঐ সমস্ত অস্ত্র ছিলো মানধাতা আমলের—যা প্রথম মহাযুদ্ধের বা তারো আগে ব্যবহৃত হতো।

৪.২৬ আরব লীগের 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি'

প্যালেস্টাইনী ভাইদের এহেন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে এবং জেরুজালেমের মুফতী হাজী আমিন আল হুসাইনীর জেহাদী ডাকে সচকিত হয়ে ওঠে পার্শ্ববর্তী আরব বিশ্ব। এর পরেই আরব লীগ কায়রোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়। সপ্তাহকাল ব্যাপী প্যালেস্টাইন সম্পর্কে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আলোচনা চলে। পরিশেষে সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আরব লীগের পক্ষ থেকে প্যালেস্টাইনী ভাইদের সাহায্যের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী যাবে। এর নাম হবে 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি'। এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন ইরাকী জেনারেল ইসমাঈল শাফাওয়েত পাশা। আর দামেস্ক হবে উক্ত বাহিনীর হেড কেয়াটার—যেখানে শায়িত আছেন বিশ্ব বিশ্রুত বীর গাজী সালাহউদ্দীন ; যিনি ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে

চিত্র ৩২ ঃ জেনারেল ইসমাঈল শাফাওয়েত পাশা ।

পর্যদুস্ত করে মহান নগরী জেরুজালেমকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। এটি ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা।

৪.২৭ মুসলমানদের ঐক্য ধ্বংসে বিশ্বচক্রান্ত

এভাবে মুসলমানরা আবার যখন সুসংগঠিত হতে লাগলো তখনই বিশ্ব জায়নবাদী সংগঠন, ফ্রিম্যাসন সংস্থা, জাইয়ীশ এজেন্সী প্রভৃতি সংস্থাগুলো সংগঠন অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। যদিও এ সকল গোপন সংস্থাগুলোর প্রথম ও প্রধান লক্ষ ছিলো বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস সাধন করে মুসলমানদের ছিন্নভিন্ন করা ; তাদের এ দিশাহারার সুযোগ নিয়েই জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইন মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া এবং প্যালেস্টাইনীদের সেখান থেকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে সেখানে বনী ইসরাঈলদের জন্য একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ; তবুও এটাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ ছিল না। তাদের লক্ষ ছিলো আরো সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক।

তাদের প্রথম লক্ষ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন এবং দ্বিতীয় লক্ষ প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শাসন প্রবর্তন যখন ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়ে যায় তখন তৃতীয় লক্ষ জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। আর এরই ভেতর আরবলীগের বিরোধিতা তারা একেবারেই বরদাশত করতে পারলো না। তাই তারা একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। এবং চারদিক দিয়ে মুসলমানদের পর্যদুস্ত করার চেষ্টা করে। প্রথমে তারা তাদের গোপন সংস্থাগুলোকে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সেই সাথে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস ও নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে এ সকল মুসলমান দেশের কর্ণধারদের নিজেদের বশে নিয়ে এসে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। এতেও ভালো কাজ না হলে বৃহৎ শক্তির প্রভাবকে তারা কাজে লাগায়। এ সাথে সাথে ইহুদীরা বৃহৎ শক্তির সক্রিয় সহযোগিতায় অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মুক্তি-পাগল প্যালেস্টাইনের ওপর মরণ আঘাত হানতে থাকে। হয়তো এতেও মুসলমান বীর মুজাহিদদের দল পরাস্ত হতো না ; কিন্তু মুসলমান দেশ-সমূহের নেতৃবৃন্দ এ সকল মুক্তিপাগল সত্য সৈনিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদী ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত অমুসলিমকে উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেই তাদের সর্বনাশ করে। এ সমস্ত কপট উপদেষ্টারা প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দকে এমন এমন পরামর্শ দিয়ে থাকে, যে পরামর্শে চালিত হয়ে স্ব স্ব দেশের প্রেরীত বাহিনীতে জেনারেলদের আত্মধ্বংসী কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে অচিরেই 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মির' ভেতর নেতৃত্বের কোন্দল বাঁধে। ফলে উক্ত বাহিনী লক্ষে

পৌঁছানোর আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রথম প্রথম এ বাহিনী বেশ সফলতা লাভ করতে থাকলেও এবং মুক্তি সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হলেও পরে দিনের পর দিন তাঁদের ভেতরকার সেই জিহাদী 'স্প্রিট' কর্পুরের ন্যায়ই উঁবে যেতে থাকে। কারণ পরে খোঁজ করে দেখা গেলো 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি' এক বলে মনে হলেও মূলত অন্তরের দিক দিয়ে তাঁরা শতধা বিভক্ত হয়ে গেছে। ফলে 'লিবারেশন আর্মি' ইসমাঈল শাফাওয়েত পাশার বলিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত কমাণ্ডকে অগ্রাহ্য করে স্ব স্ব দেশীয় অফিসারের কমাণ্ডে পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধ করে আক্রমণের ক্ষীপ্রতাকে নিস্তেজ করে দিয়েছিল। এভাবে তারা পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধ করে জেরুজালেম উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালায় তা সত্যিই এক হাস্যকর কৌতুক ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

৪.২৮ ইহুদীদের মহাবিজয়ের পদধ্বনী

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাসবাদী ইহুদী দলগুলো নতুন করে পরাশক্তিগুলোর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা পাওয়াই আরো ক্ষীপ্রতা সহকারে প্যালেস্টাইনীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁরা নতুন নতুন আক্রমণ ব্যূহ রচনা করে চলে জেরুজালেমের প্রতিটি অলিতে-গলিতে। সিনাগগ, মসজিদ এবং হাসপাতাল পর্যন্ত যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের দুর্গে পরিণত হয়। এ আক্রমণ ছিলো অত্যন্ত বর্বরোচিত আক্রমণ। ফলে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর প্রতিটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানেই রক্তের বন্যা বয়ে যায়। আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে ও পিক-আপ ভ্যানের ন্যায় যুদ্ধযানসমূহে সুসজ্জিত হয়ে হাগানা, পালমাক, ইরগুন ও গাডানা সন্ত্রাসবাদীরা যা করে চলে তা বর্বর নাজীদের নৃশংসতাকেও হার মানিয়ে দেয়। অসংখ্য বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুকে তাঁরা নির্মমভাবে হত্যা করে। পবিত্র জেরুজালেম নগরী ও তার সরল প্রাণ নাগরিকদের এহেন অবস্থায় আর নীরব থাকতে না পেরে শয়তানের হাতিয়ার সম্মিলিত জাতিসংঘ মায়াকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। স্বীয় দুষ্কর্ম একটু ঢাকবার জন্য কুমিরের অশ্রুপাত ঘটিয়ে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠায়। আর এর সাথেই আসে রক্তপিপাসু ইসরাঈলী বাহিনীর ধমক। এঁতেই সে অসহায় কচি শিশুটির ন্যায় ভড়কে গিয়ে অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে।

আর এদিকে জঙ্গী ইহুদী চক্র একের পর এক জেরুজালেমসহ প্যালেস্টাইনের শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম অবিরামভাবে আক্রমণ ও ধ্বংস করে চলে। আপনারা এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে স্বয়ং প্রখ্যাত জায়নবাদী নেতা ডেভিড বেনগুরিয়নের উক্তি থেকে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "As April (1948) began, our war of Independence swung decisively from defence to attack." অন্যদিকে মেনাহেম বেগিন এটাকে মহা বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

এ এপ্রিল মাসেই 'পালমাক' ও অন্যান্য ইহুদী বাহিনী উপকূলীয় ইহুদী বসতিগুলো হতে জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার ওপর তাদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। জেরুজালেমের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আরো শক্তিশালী করে তোলবার জন্য এ সমস্ত বাহিনী যখন মার্চ করছিলো তখন তারা রাস্তার দু'পাশে আক্রমণ চালিয়ে এক বিস্তীর্ণ এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। এ সময় সহযোগী বৃটিশ বাহিনী সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কসহ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে ইহুদীদের আক্রমণ রচনায় ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এখানেই শেষ নয়, বৃটিশ সৈন্যরা স্বয়ং ইহুদীদের হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিজয়কে আরো সুনিশ্চিত করে তোলে।

এভাবে জেরুজালেমে অবস্থানরত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার রক্ষক হয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করায় মুক্তিকামী প্যালেস্টাইনী আরবরা শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে ক্ষুৎ-পিপাসায় ও ঘুমহীন দুঃখময় রজনীর বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে যখন প্যালেস্টাইনী মুক্তিবাহিনী নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন ইহুদী ও বৃটিশের

চিত্র ৩৩ ঃ হস্‌পিস্ অব নটরড্যাম ডি ফ্রান্সের চিত্র।

ফ্রান্স থেকে আগত খৃস্টান তীর্থ যাত্রীদের জন্যে নির্মিত ৫৪৬টি সীট বিশিষ্ট হাসপাতাল। জেরুজালেম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ হাসপাতালটির নাম 'হস্‌পিস্ অব নটরড্যাম ডি ফ্রান্স' (Hospice of Notre Dame de France)। ১৯৪৮ সালে জেরুজালেমে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধমান ইসরাঈলী ও প্যালেস্টাইনীয় বাহিনীর দুর্গে পরিণত হয় এবং মুহুর্মুহু হাত বদল হতে থাকে। ফলে এটাই দারুণভাবে বিধ্বস্ত হয়। গোলার আঘাতের চিহ্ন বিল্ডিং-এর গায়ে দেখা যাচ্ছে।

সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে শুধু জেরুজালেমই নয় ; বরং প্যালেস্টাইনের প্রতিটি রণাঙ্গনেই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে থাকে। এভাবে তারা ১৯৪৮ সালের ১০ এপ্রিল 'দেরিয়াসীন', ১৮ এপ্রিল 'টিবেরিয়াস', ২১ এপ্রিল 'হাইফা', 'সালামেহ', 'ইয়াজুর' 'বিতদাজুন' ও 'জাফফার পার্শ্ববর্তী এলাকা' ৩০ এপ্রিল 'জেরুজালেমের নতুন আবাস' ও 'বেইমান', ১০ মে 'সাফাদ', ১৩ মে 'জাফফা' এবং ১৪ মে 'আল বাচ্চা' গ্রামের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

৪.২৯ দেরিয়াসীনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আর. সি. ক্যাটলিং-এর রিপোর্ট

এভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী ইহুদী গোষ্ঠী যে জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করে তাতে শুধু বিশ্বের মানুষেরই নিন্দা কুড়ালো না ; বরং প্যালেস্টাইনের বিবেকবান ইহুদীদের কাছেও প্রচুর গালি-গালাজ খেলো। বিশেষ করে দেরিয়াসীনের নৃশংসতা বিশ্বকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। এ নিয়ে এতবেশি হৈ চৈ হয় যে, প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট সরকারের চীফ সেক্রেটারী Sir Henry Gurney তাঁর ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশনের সহকারী ইনস্পেক্টর জেনারেল রিচার্ড সি, ক্যাটলিংকে ব্যাপারটি সরে জমিনে তদন্তের জন্য পাঠায়। তিনি ১৩, ১৫ এবং ১৬ এপ্রিলে যে রিপোর্ট পেশ করেন (রিপোর্ট সংখ্যা ছিলো 179/110/17/GS) তা প্যালেস্টাইন Red Cross Society-এর মিঃ Jacques de Reynier-এর সাথে মিলে যায়। তাই সুধী মহলের খেদমতে মিঃ ক্যাটলিং-এর ১৫ তারিখের রিপোর্টটি নিচে পেশ করা হলো ঃ

"On 14th April at 10 A. M. I visited Silwan village accompanied by a doctor and a nurse from the Government. Hospital in Jerusalem and a member of the Arab Women's Union. We visited many houses in this village in which approximately some two to three hundred people from Deir Yassin village are housed I interviewed many of the women folk in order to glean some information on any atrocitees committed in Deir Yassin but the majority of those women are very shy and reluctant to relate their experiences especially in matters concerning sexual assult and they need great coaxing before they will divulge any information. The recording of statements is hampered also by the hysterical state of the women who often breat down many times whilst the statement is being

recorded. There is however no doubt that many sexual' atrocities were committed by the attacking Jews. Many young school girls were raped and later slaughtered. Old women were also molested. One story is current concerning a case in which a young girl was literally torn in two. Many infants were also butchered and killed. I also saw one old woman who gave her age as one hundred and four who had been severely beaten about the head by rifle butts. Women had braeelets torm from their arms and rings from their fingers and parts of some of the womens ears were severed in order to remove earrings."

৪.৩০ বৃটিশদের প্যালেস্টাইন ত্যাগের প্রস্তুতি

এ ঘটনার পর বৃটিশরা প্যালেস্টাইনে অবস্থান করা আর উচিত হবে না ভেবে ম্যাণ্ডেটের মেয়াদকাল শেষ হবার আগেই কেন্দ্রের নির্দেশে প্রস্থানের জন্য বাক্স পেটরা বাঁধতে থাকে। প্যালেস্টাইন থেকে চিরবিদায় নিবার সময় তারা কোন্ পথ দিয়ে বেরুবে তার মানচিত্রও তারা তৈরি করে বৃটিশ বাহিনীর ভিতর বিরতণ করে। এর এক কপি একজন বৃটিশ সামরিক অফিসার গোপনে ইহুদীদের হাতে দেয়। ইহুদীরা এটা পাবার পর সাথে সাথে বাহিনীকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করে যাতে বৃটিশ বাহিনী চলে যাওয়ার সাথে সাথে ঐ সকল স্থানগুলো বিনা যুদ্ধে দখল করে নিতে পারে। এতে তারা আরো একদিক দিয়ে প্রচুর লাভবান হয়—তা হলো বৃটিশরা যখন কেন্দ্রের সকল হুকুম পায় তখন কাটা তারের ভেতর বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য এ রকম তড়িঘড়ি করে মাতৃভূমিতে জান পরান নিয়ে ফিরে যাবার জন্য প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ও রসদপত্র ফেলে যায়। ইহুদীরা ঐগুলো লাভ করে যেমন সমৃদ্ধ হয়, তেমনি শক্তিশালীও হয়। ফলে তারা আরো দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে পজিশনের পর পজিশন দখল করে চলে। এ সাথে সাথে তারা জেরুজালেমের আশপাশে অনেক গ্রামের ওপরও নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলে।

৪.৩১ তেলআবিবের মিউজিয়ামে জায়নবাদীদের ইসরাঈল রাষ্ট্র

ইতিমধ্যে বৃটিশ বাহিনী ও কর্মচারীরা জেরুজালেম সম্পূর্ণভাবে খালি করে চলে যায় এবং রামাল্লাহ ও হাইফা বন্দরে গিয়ে জাহাজের জন্য অপেক্ষায় থাকে। এটা ১৯৪৮ সালের ১৪ মে-র সকাল সাতটার সময়ের ঘটনা। এর সাথে সাথে বিশ্বের জায়নবাদী উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ তেলআবীবে

চিত্র ৩৪ ঃ তেল আবিবের মিউজিয়ামে ইসরাঈল রাষ্ট্র ঘোষণা অবস্থায় ইহুদী নেতৃবৃন্দের চিত্র

এসে উপস্থিত হন। তাঁরা তেলআবীবের মিউজিয়ামের অডিটোরিয়ামে মিলিত হয়ে তাঁদের কাংখিত রাষ্ট্রের নাম 'জিইয়ন' হবে না "ইসরাঈল" হবে তা নিয়ে এবং ভাবী রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কোনটি গ্রহণ করতে হবে তা নিয়ে বিকাল ৪টা ৩৭ মিঃ পর্যন্ত আলোচনা করে সব কিছু ঠিকঠাক করে। মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা থিওডোর হারৎজেল-এর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ডাঃ চেইম ওয়াইজম্যান হন প্রেসিডেন্ট এবং এর স্থপতি ডেভিড বেনগুরিয়ন হন প্রধানমন্ত্রী।

৪.৩২ স্যার এল্যান কানিং হামের প্যালেস্টাইন ত্যাগ

এদিকে প্যালেস্টাইনের বৃটিশ ম্যাণ্ডেট প্রশাসনের শেষ হাই কমিশনার স্যার এল্যান কানিংহাম ঐ তারিখের রাত ১০টার দিকে প্যালেস্টাইন পরিত্যাগের জন্য হাইফা বন্দরে গিয়ে পৌছান। এখানে তাঁকে বৃটেনে নিয়ে যাবার জন্য ক্রুজার "Euralyus" অপেক্ষা করছিল।
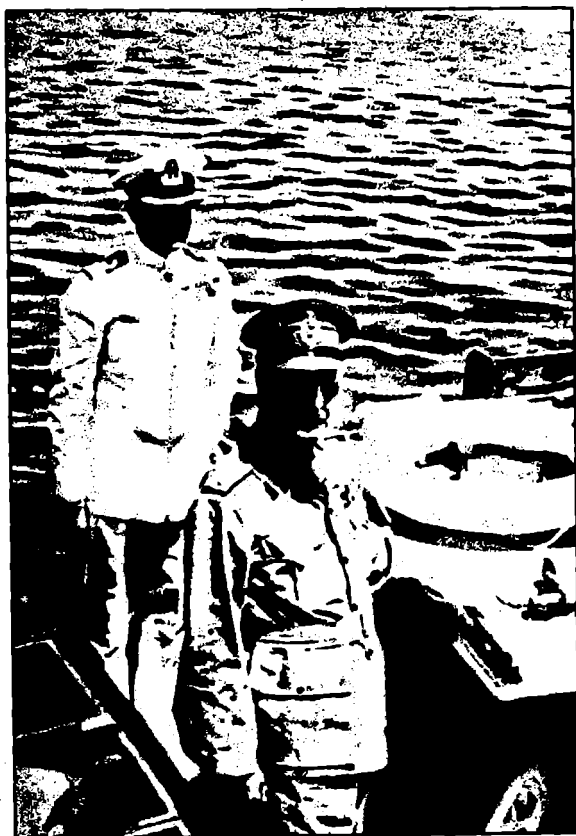
চিত্র ৩৫ ঃ প্যালেস্টাইনের শেষ বৃটিশ হাইকমিশনার জেনারেল স্যার এল্যান কানিং হামের বিদায়ী চিত্র।

এর আর কিছু দূরেই যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে বৃটেনের ভূমধ্যসাগরীয় স্কোয়াড্রন অবস্থান করছিলো। মিঃ কানিংহাম হাইফা বন্দরের 'S S Borea' সেতুটি পার হয়ে ক্রুজারের ডেকে পা দিতেই নৌবাহিনীর অফিসারেরা তাঁদের ভুতপূর্ব নৌবিভাগের

বীর সৈনিক স্যার এল্যান কানিংহামকে সামরিক কায়দায় সালাম জানায়। এর সাথে সাথেই ক্রুজার Euralyus হাইফা বন্দর ত্যাগ করে।

এর পরেও সম্প্রসারণবাদী ইহুদীরা তাদের সর্বগ্রাসী 'হা' নিয়ে প্যালেস্টাইনের সর্বত্রই থাবা বিস্তার করে চলে। ফলে মুক্তি সংগ্রামও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। যার কারণে হাজার হাজার ছিন্নমূল প্যালেস্টাইনবাসী বাস্তুহারাদের দলে গিয়ে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এদের কিয়দংশ ট্রান্সজর্দান অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে, কিয়দংশ মিশর নিয়ন্ত্রিত গাজা এলাকায়; বেশ কিছু সংখ্যক জর্দান ও লেবাননে এবং কেউ কেউ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নেয়।
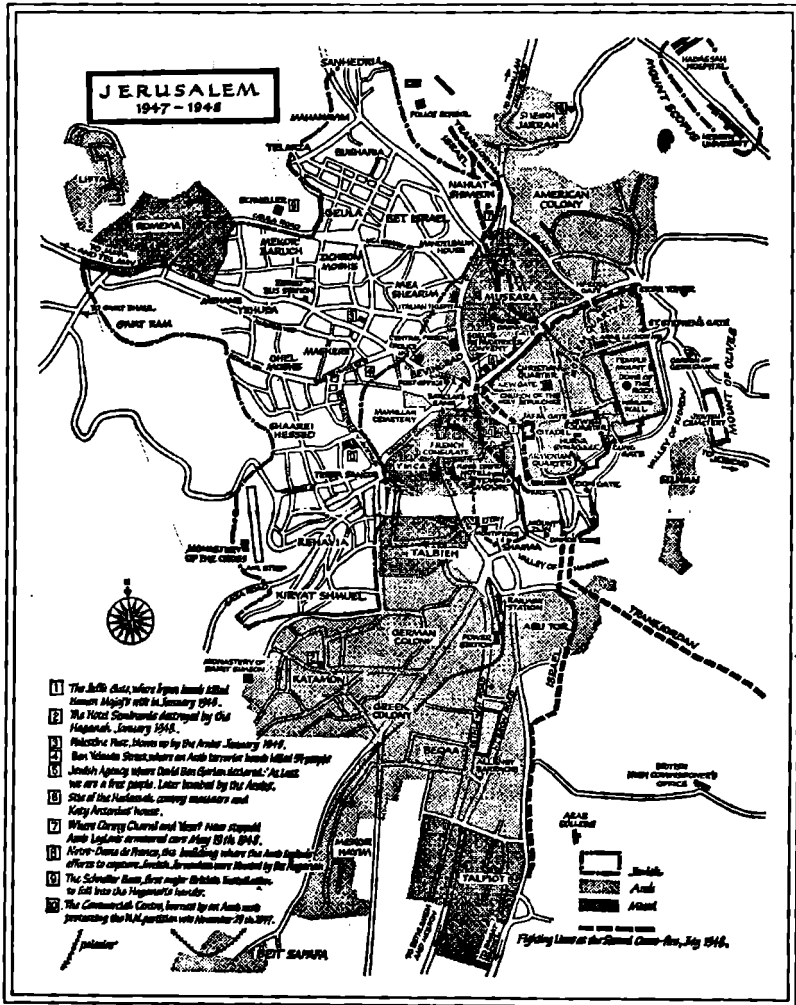
মানচিত্র ৫ ঃ গৃহ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মহান জেরুজালেমের কোন্ অংশের উপর কার আধিপত্য কায়েম ছিল ও তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা সম্বলিত মানচিত্র।

৪.৩৩ একটি উদ্বাস্তু পরিবারের সাক্ষাতকার

এরূপে অস্ত্রের মুখে চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত এবার একটি প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু পরিবারে সাথে সাক্ষাতকার শুনুন। এটা ১৯৮১ সালের ২ মে তারিখে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "নয়া যুগ" গ্রহণ ও প্রকাশ করে। "দুঃখের অমানিশার মাঝেও প্যালেস্টাইনীরা সুখের নীড়ের স্বপ্ন দেখে জন্মভূমিতে আমরা ফিরে যাবোই"—এ শিরোনামে সাক্ষাতকারটি স্বচিত্রে প্রকাশিত হয়, যেটা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

চিত্র ৩৬ ঃ উম গাজী   আবু গাজী

"আমি ১৯৪৮ সালের ৭ মে শুক্রবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং মাত্র ৭ দিন পর ১৪ মে শুক্রবার ইসরাঈলী বাহিনী দ্বারা জোরপূর্বক প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত হই। একথাগুলো বলেছেন আবু গাজী নামে ৬০ বছরের একজন বৃদ্ধ, তিনি এখনও দেখতে যুবকের মত শক্তিশালী। বৃদ্ধ সদা সতর্ক এবং মাতৃভূমি প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবার প্রশ্নে অটল। আমরা যখন লেবাননের দক্ষিণ তায়েরের রশিদিয়া ক্যাম্পে তার ছোট ঘরে গিয়ে বসলাম, তখন আবু গাজী ইসরাঈলী বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত তার ঘরের ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদটিকে মেরামত করে কেবল এসে বসেছেন। আমি আবু গাজীকে জিজ্ঞেস করলাম ১৯৪৮ এর ১৪ মে শুক্রবার কি ঘটনা ঘটেছিল এবং কিভাবে তিনি ও তাঁর স্ত্রী রশিদিয়া ক্যাম্পে সমবেত হলেন। তিনি আমার প্রশ্ন থামিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে বললেন প্রথমে চা খাওয়া যাক। আবু গাজীর স্ত্রী উম গাজী চা বানিয়ে আনলেন, পরে তিনি আমার সন্তানদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। আমি তাঁর সন্তান ও পরিবার সম্পর্কে জানতে

পারলাম আমরা যখন চা খাচ্ছিলাম, তখন আবু গাজী সেই ঘটনার উল্লেখ করে বললেন ঃ এভাবেই আজকে লেবাননে ৫ লাখ প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু অবস্থান করছেন। দেখলাম তাঁর মুখমণ্ডলে এক করুণ বেদনাদায়ক স্মৃতি মূর্ত হয়ে উঠছিল। আমি দ্রুত আবু গাজীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ সেইদিন কেমন ছিল ? আবু গাজী বললেন ঃ আপনি সেই নৃশংস অত্যাচারের কথা বলছেন ? আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আবু গাজী বলতে শুরু করলেন—আমি উত্তর প্যালেস্টাইনের আল বাছ্ছা গ্রামের অধিবাসী। সেখানে আমি আমার নিজস্ব প্রায় ১০০ ডিউনামস আবাদী জমিতে কাজ করতাম। এ জমি আমি আমার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। সে যাই হোক জমিটি খুব উর্বর ছিল এবং আমরা ঐ জমি দিয়ে ভালভাবেই জীবিকা নির্বাহ করতাম।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৩ মে সন্ধ্যায় আল বাছ্ছা গ্রামে আমি কয়েকজন যুবকের সাথে আমাদের দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য বসেছিলাম। তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা ইহুদীদের দ্বারা দায়ার ইয়াছিন গ্রামে ভয়াবহ ধ্বংস যজ্ঞের খবর শুনতে পেলাম। আমরা জানতে পারলাম যে, ইহুদীরা সমস্ত গ্রামটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বৃদ্ধ মহিলা ও শিশুসহ গ্রামের সকল অধিবাসীকে হত্যা করে গ্রামের কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমার কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধু বলেন যে, আমাদের অতি শীঘ্র গ্রাম ত্যাগ করা উচিত। কারণ ইসরাঈলীরা যে কোনো মুহূর্তে আল বাছ্ছা গ্রাম আক্রমণ করতে পারে। আমি তাদেরকে বললাম ঃ গ্রাম ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যাব না। তারপর আমরা বসে কথা বললাম, চা খেলাম এবং যার যার বাড়ীতে ঘুমোতে গেলাম।

কয়েক ঘন্টা পরে ১৪ মে খুব সকালের দিকে ইহুদীরা আল বাছ্ছা গ্রামে গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। আক্রমণের ধরণে প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে অনুমান করা গিয়েছিল যে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রাম এবং অধিবাসীদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। আমরা আমাদের সাধ্য ও সামর্থ মত গ্রামকে রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাদের তুলনায় আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অতি নিম্ন মানের। সন্ধ্যার মধ্যেই গ্রামের সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল অথবা আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। আমাদের জীবন ও মৃত্যু তখন ইহুদীদের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় আমি এবং আমার স্ত্রী লেবাননের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বাড়ী থেকে আসার সময় কোনো কিছুই সাথে করে আনা এমনকি একটি কম্বল পর্যন্ত আনা সম্ভব হয়নি। নিরাপদে চলে আসাটাই ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ

তখনও ইহুদীরা অনবরত গোলাগুলী চালিয়ে যাচ্ছিল। লেবাননের সীমান্ত গ্রাম লাবোনায় পৌঁছার জন্য আমরা সারা রাত ধরে হাঁটলাম। সেখানে কোনো আশ্রয় স্থল ছাড়াই সাতদিন অবস্থান করলাম, এমন কি মাঠ থেকে ঘাস সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। সেখানে আগে থেকে এক দল প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু অবস্থান করছিল। এক সপ্তাহ পর সেখানে লেবাননী পুলিশ এসে হাজির হয় এবং আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। আমরা সদল বলে আরেকটি লেবাননী সীমান্ত গ্রাম আল নাকোরায় রওয়ানা হলাম। সেখানে আমরা এক সপ্তাহ অবস্থান করেছিলাম।

আমি আবু গাজীকে প্রশ্ন করলাম, কেন আপনারা সীমান্তের কাছের গ্রামে অবস্থান করতেন ? উত্তরে আবু গাজী বলেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমরা সমস্ত আরব দেশের সমর্থন ও বিশ্ব বিবেকের সমর্থন পাচ্ছি —আমাদের এ নির্বাসন শুধুমাত্র সাময়িক। আমরা আশা করেছিলাম অতি শীঘ্রই আমরা আমাদের কাছাকাছি গ্রামে অবস্থান করবো যাতে যে কোন সময়ে আমরা অতি সহজে ফিরে যেতে পারি।

কয়েকদিন পর আমি চিন্তা করলাম আমার কিছু কাজ করা দরকার। লেবাননের আরেকটি সীমান্ত গ্রাম আল ক্লেল্লাহতে আমি কৃষকের কাজ পেলাম। সেখানে দৈনিক এক থেকে দেড় লেবাননী পাউন্ড রোজগার করতাম। এ আল ক্লেল্লাহ গ্রামটি ছিল আমার নির্বাসনের তৃতীয় স্থান। সেখানে আমার পুত্র গাজী জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জীবন সেখানে এতই কঠিন ছিল যে, আমরা অবশেষে ঐ স্থান ত্যাগ করলাম। এবং আল হেন্নাহ গ্রামে চলে গেলাম, যেটি ছিল আমাদের নির্বাসনের চতুর্থ স্থান। সেখানে আমরা একটি ঘর বানালাম একটি প্রাচীন পানি সরবরাহ লাইন থেকে পানি সংগ্রহ করে মোটামুটি দিন কাটিয়ে দিতাম। এ জায়গায় আমরা এক বছর ছিলাম। আমার মেয়ে ইকবাল ওখানেই জন্মগ্রহণ করে।

পরবর্তীতে আমি কাজের সংস্থানের জন্য তাবারে যাই এবং সেখানে তিন মাস অবস্থান করি। কিন্তু কোনো কাজ না পেয়ে আমরা আবার আল আজিজিয়া হতে আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসি এবং সেখানে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অবস্থান করি। ঐ বছরে প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের জন্য জাতি সংঘের তত্ত্বাবধানে রশিদিয়ায় এবং আল বাসে উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করা হয়। প্রথমে আমরা আল বাসে এবং পরে ১৯৬৫ সালের দিকে আমরা রশিদিয়ায় অবস্থান করি এবং এখন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ এত অল্প আয়ে কিভাবে নয়টি সন্তানকে ভরণ-পোষণ করতেন ? তখন উম গাজী বললেন যখন জাতি সংঘের তত্ত্বাবধানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা শুরু হলো তখন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করলাম। এভাবে তারা স্কুলের পাঠপর্ব শেষ করেছে। বাকী তিন ছেলেমেয়েও পালাক্রমে স্কুলে যাবে। আমরা যা রোজগার করতাম, তা অনেক কষ্টে সঞ্চয় করে তা দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কাজে ব্যবহার করতাম।

কিন্তু পরিবারের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য ছেলেমেয়েদের কাজে না লাগিয়ে কেন আপনারা শিক্ষাকে এত গুরুত্ব দিলেন ? আমি প্রশ্ন করলাম। কিন্তু উম গাজী এবং আবু গাজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন "জ্ঞান হচ্ছে আলো এবং অজ্ঞতাই হচ্ছে অন্ধকার।" দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে এবং মুক্ত প্যালেস্টাইন সমাজ গঠন করতে জ্ঞান হচ্ছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

রশিদিয়ায় বর্তমানে কতগুলো স্কুল আছে ? উত্তরে আবু গাজী বললেন সতের হাজার জনগণ অধ্যুষিত এলাকায় মাত্র ৪টি স্কুল আছে। এবং প্রতিটি স্কুলই সকালে ও বিকালে দু বার পালা করে কাজ করছে। এখানে কোনো মাধ্যমিক স্কুল নেই। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু 'বিপ্লব' এটাকে পরিবর্তন করেছে। একথার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি প্যালেস্টাইনী নাগরিকের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আজকে আমরা দেখি যে, লেবাননের ভেতরে এবং বাইরে সমস্ত প্যালেস্টাইনী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

উম গাজীকে প্রশ্ন করলাম, আপনি যখন রশিদিয়ায় আসেন তখন আপনার জীবন যাত্রার অবস্থা বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত অবস্থা কি রকম ছিল ? উত্তরে উম গাজী বললেন, একজন মা হিসেবে বলতে গেলে স্বাস্থ্যগত অবস্থা খুবই খারাপ ছিল ? আশেপাশে নর্দমা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণেই রোগ দেখা দিয়েছিল। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মাত্র একটি ক্লিনিক ছিল, যেখানে মাত্র একজন ডাক্তার ছিলেন যিনি শুধুমাত্র সকালে কাজ করতেন। ডাক্তারের সাথে দেখা করা কিংবা ঔষধ সংগ্রহ করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি কখনও কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে কারো হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তখন তাকে কতকগুলো ফরম পূরণ করতে হতো এবং হয়তো অনেক দিন পর তাকে তায়ার বা বৈরুতের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা ছিলো।

কিন্তু 'বিপ্লব' এটাকে পরিবর্তন করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নততর যত্ন নেয়ার প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে আমাদের ৫টি মেডিক্যাল ক্লিনিক আছে। যেখানে একজন ডাক্তার ও নার্স পূর্ণ সময় কাজ করছেন। জরুরী অবস্থার জন্য ২টি এ্যাম্বুলেন্স সবসময় থাকছে। যাতে জটিল কোনো রোগীকে দ্রুত তায়ার, সিদন বা বৈরুতের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায়। 'বিপ্লব' আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। এ হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সংগ্রহ করা যায়।

আবু গাজীকে প্রশ্ন করলাম, শিবির ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পপুলার কমিটির কি কাজ ? উত্তরে আবু গাজী বললেন, আমি এ কমিটির কোনো সদস্য নই, কিন্তু জনগণের প্রয়োজনেই এটা গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি প্যালেস্টাইনী প্রতিটি সংগঠন থেকে একজন করে সদস্য, দু জন নিরপেক্ষ এবং প্যালেস্টাইনী ছাত্র, ইউনিয়ন শ্রমিক, নারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। এ কমিটি মূলত শিবিরে আমাদের চাহিদা ও প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কারো কোনো চাকুরী না থাকে সেক্ষেত্রে পপুলার কমিটি তাকে চাকুরী খুঁজে দেয়ার জন্য সাহায্য করে থাকে। যখন কারো বাড়ীঘর ইসরাঈলী গোলাবর্ষণে বিধ্বস্থ হয়ে যায়, তখন এ কমিটি তাকে ক্ষতি পূরণ দিয়ে সাহায্য করে এবং জনগণকে ইসরাঈলী গোলার আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয়স্থল ও শিবিরের পাশে রাস্তা নির্মাণ সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। পপুলার কমিটি এছাড়াও জনগণের ভেতরকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকে। ১৯৭৮ সালে মার্চে ৮ দিনব্যাপী ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধে আমাদের খাদ্য ও রান্নার জ্বালানী তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। পপুলার কমিটি বৈরুতে পি, এস, ও,-এর সাথে দ্রুত যোগাযোগ করার ফলে আমরা দু দিনের মধ্যেই ময়দা ও জ্বালানী তেল ন্যায্যমূলে সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম।

প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন ? আবু গাজীকে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে আবু গাজী বললেন, প্যালেস্টাইন কি ধরনের রাষ্ট্র হবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমি আমার দেশে—আমার বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই। এবং শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চাই। এটা দীর্ঘ সময়ে বা অল্প সময়ে হতে পারে, কিন্তু আমরা ফিরবোই। আমরা আমাদের সন্তানদের দেশকে ভালবাসার জন্য শিক্ষা দিচ্ছি। প্রতিটি প্যালেস্টাইনী মা তার সন্তানকে প্যালেস্টাইনকে ভালবাসার জন্য গড়ে তুলেছে। যদি আমরা না পারি তাহলে আমাদের বংশধর এভাবে বংশ

পরম্পরায় একদিন প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবে এবং আমরা তখন তাদের চোখের মাধ্যমে বিজয়কে দেখতে পাবো।

চিত্র ৩৭ ঃ ফেদাইনদের চিত্র। বিজয় আমাদের হবেই ...

উম গাজীকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি ইসরাঈলী গোলা বর্ষণে ভীতসন্ত্রস্ত ? উত্তরে তিনি বললেন, অবশ্যই পৃথিবীর যে কোনো মায়ের মত আমিও সন্তানদের জীবনের কথা চিন্তা করে সবসময় সন্ত্রস্ত থাকি। যখন ইসরাঈলীরা গোলা বর্ষণ শুরু করে তখন আমি আমার সন্তানদের একত্রিত করে আশ্রয় স্থলে লুকিয়ে রাখি। আমার মেয়ে নিহাদ ইসরাঈলী গোলা বর্ষণে নিহত হয়েছে। একজন মা হিসেবে আমি চাই—আমার সন্তান এবং সমগ্র পৃথিবীর সন্তানেরা শান্তিতে বেঁচে থাক। ইসরাঈল আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, বাড়ীঘর ধ্বংস করেছে এবং মানসিক অধিকারটুকুও পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। একদিন সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। আমাদের অধিকার স্বীকৃত হবে এবং আমরা প্যালেস্টাইনে ফিরে যাব।

আবু গাজীর দশ বছরের ছেলে মুওয়াফাককে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ইসরাঈলী গোলা বর্ষণে তোমার কোনো বন্ধুকে হারিয়েছ ? মুওয়াফাকের শিশু সুলভ মুখমণ্ডল তখন ক্রোধ ও দুঃখ মিশ্রিত কণ্ঠে শান্তভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ, আলী এবং মোহাম্মদ নামে দুজন বন্ধু। আট দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের সময় একদিন ওরা খেলছিল, তখন ইসরাঈলী ফ্যান্টম বিমান থেকে এক ঝাঁক বোমা বর্ষিত হলে বোমার আঘাতে মুওয়াফাকের দু' বন্ধু নিহত হয়।

আমি মুওয়াফাককে জিজ্ঞেস করলাম, বড় হয়ে তুমি কি হবে ? উত্তরে মুওয়াফাক বললো, আমি আশা করছি ডাক্তার হয়ে আমি জনগণকে সাহায্য করবো। কিন্তু প্রথমে আমি ইসরাঈলী বিমান হামলা বন্ধ করার জন্য পাইলট হতে চাচ্ছি, কারণ ইসরাঈলী বিমানই আমার বন্ধুদের হত্যা করেছে।" এ হলো আবু গাজী পরিবারের দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের একটি চিত্র, যা ইহুদীদের দ্বারা বিতাড়িত প্রতিটি প্যালেস্টাইনী পরিবারের প্রতীক স্বরূপ, যারা উদ্বাস্তু শিবিরে এক বেদনাদায়ক ও কষ্টকর জীবন যাপন করেছে।

চিত্র ৩৮ ঃ ফেদাইনদের চিত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি

৫.১ মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার গোড়ার কথা

এভাবে পরাশক্তিগুলোর ব্যাপক ষড়যন্ত্রে এবং বৃটিশ সরকার ও তার প্যালেস্টাইনে প্রেরিত রাজকীয় বাহিনীর সক্রীয় সাহায্য-সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়ে পবিত্র নগরী জেরুজালেম ও অন্যান্য এলাকার নিরীহ অধিবাসীদের ওপর ইরগুন, হাগানা ও স্টানের বেপরোয়া সন্ত্রাসবাদী বাহিনী যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালালো তা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিলো। এ ঘটনা এমন কি মানবতাবাদী কিছু ইহুদীকেও দারুণভাবে ব্যথিত করে। স্বয়ং ইহুদী লেখক জন কিম্শে এটাকে! "The darkest stain on the Jewish record." বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনিতর পৈশাচিক পন্থা অবলম্বন করে সন্ত্রাসবাদীরা প্রায় দশ লাখ প্যালেস্টাইনীকে তাদের পৈত্রিক বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয়। এ সমস্ত ছিন্নমূল প্যালেস্টাইনী আরবদের সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সকল শক্তির উৎস মহান আল্লাহর অনন্ত কৃপা আর উষা মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর এতটুকু তাবুর আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই রইলো না। আর এটাকে কেন্দ্র করে গোটা আরব বিশ্বে সৃষ্টি হলো এক দারুণ মানসিক যন্ত্রণা। এটাই আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা।

৫.২ মহান জেরুজালেমের আন্তর্জাতিক মান ক্ষুণ্নকরণ ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা

কিন্তু ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে অবৈধভাবে পৃথক একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা নামে যে একটি জটিল সমস্যা সৃষ্টি করলো তা বিশ্ববাসীকে যতটুকু না নাড়া দিয়েছিলো, তার চেয়েও হাজারো গুণ বেশি নাড়া দিয়েছিল ঐতিহাসিক পবিত্র জেরুজালেম নগরীর আন্তর্জাতিক মান ক্ষুণ্ন করাতে। এটা শুধু প্যালেস্টাইনী ও আরব দেশসমূহেরই নয়, বরং গোটা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও খৃস্টান জাতির হৃদয় মন্দিরে এক প্রচণ্ড আঘাত হানে। এমনিভাবে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক নেমক হারাম সম্প্রসারণবাদী ইহুদী জাত যে শুধু বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মানুষকেই আঘাত করলো তা-ই নয়, সে স্বয়ং তার জন্ম ও বৈধদাতা সম্মিলিত জাতিসংঘের মূল্যবান সিদ্ধান্তের প্রতিও চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও অবমাননাও করলো। বিশ্বজাতিসমূহের মুরুব্বী স্বয়ং জাতি সংঘকেও কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বরের পাশকৃত তার সেই ১৮১ প্রস্তাবকে তারা

তাদের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে এবং প্রটোকোলে অঙ্কিত নীলনকশা অনুযায়ীই তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখে। তাদের অভিলাষ জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গোটা আরব জাহানের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে প্রটোকোলে অঙ্কিত নীল নকশা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো। তাই ইহুদী জান্তারা প্যালেস্টাইন থেকে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী শাসনের মেয়াদ শেষ হবার আগেই তাদের সন্ত্রাসবাদী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়ে সকল আইন-কানুন পদদলিত করে জেরুজালেমকে স্বীয় কুক্ষিগত করে নেয়। এরপর তারা ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জেরুজালেমকে ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী বলে ঘোষণা দেয়। অবশ্য বিশ্ববাসী ইসরাঈলের এ পশুসুলভ আচরণ মোটেই পসন্দ করেনি ; বরং তারা ইসরাঈলের এহেন অমানবিক ও গুণ্ডামী কাজ কারবারের জন্য ভীষণভাবে মর্মাহত হয় এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে।

৫.৩ আরব রাষ্ট্র তথা বিশ্বব্যাপী এর প্রতিক্রিয়া

এতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশেই চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং 'রুলিংগভর্নমেন্টের' ক্ষমতায় থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। এর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিশরের ফারুক সরকারের তো পতনই ঘটে বসলো। ৩০ বছরের শক্তিশালী বীর সৈনিক নাসের ক্ষমতায় এসেই বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য সৈন্য মার্চ করায়। এর সাথে সাথেই সিরিয়া, ইরাক ও ট্রান্সজর্দানের নিয়মিত সৈন্য প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। এর জন্যও আরব লীগভুক্ত এ দেশগুলোকে জাতিসংঘের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। আর এরই জন্য আরব লীগের সাধারণ সম্পাদককে প্যালেস্টাইনে সৈন্য পাঠানোর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জাতিসংঘের সাধারণ সম্পাদকের নিকট তারবার্তা পাঠাতে হয়। এতে বলা হয় যে, এর উদ্দেশ্য হলো ঃ

"To prevent the spread of disorder and lawlessness in the neighbouring Arab lands and to fill the vacuum created by the termination of the Mandate."

এক সপ্তাহ যুদ্ধ চলার পর মে মাসের ২২ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র বিরতির আহ্বান জানায়। খণ্ড যুদ্ধ চলতেই থাকে। ফলে ২৯ তারিখে পুনরায় এ আহ্বান জানালে ১১ জুন থেকে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকে। বিরতির দিক হতে আরবদের সামরিক কিছুটা সুবিধা ছিলো। কিন্তু এ বিরতির সুযোগে ইসরাঈলী পক্ষ বিভিন্ন দেশ—বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চেকোশ্লোভাকিয়া হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র ও কয়েকটি বিমান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। অন্য দিকে অস্ত্র আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা

বলবৎ থাকায় আরবরা প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে চার সপ্তাহ যুদ্ধ বিরতির পর জুলাই মাসের ৯ তারিখ হতে আবার যুদ্ধ শুরু হলে ইহুদীরা প্রতিটি রণাঙ্গনে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। আরব অঞ্চলের বহু জায়গাও তারা নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হয়। ১৮ তারিখে পুনরায় অস্ত্র-বিরতির আদেশ দেয়া হয়। যদিও দু পক্ষই যুদ্ধ বিরতিতে স্বীকৃত হয়, তবুও খণ্ড যুদ্ধ চলতেই থাকে। এ সময়েই ইসরাঈল বাহিনী দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে হামলা চালিয়ে পরিশ্রান্ত মিশরীয় বাহিনীর প্রায় সবগুলো অবস্থানই দখল করে নেয়।

৫.৪ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

১৬ নভেম্বর তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ এক প্রস্তাবে যুদ্ধমান দলগুলোকে আলোচনার মাধ্যমে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী মিশর ও ইসরাঈলের মধ্যে, ৩ এপ্রিল ট্রান্সজর্দান ও ইসরাঈলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র ৩৯ ঃ যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের চিত্র।

এ চুক্তি পত্রে ট্রান্সজর্দানের পক্ষে স্বাক্ষরদান করে বীর কেশরী মেজর আবদুল্লাহ তেল এবং ইসরাঈলের পক্ষে পরবর্তীকালের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর প্যালেস্টাইনের বিভক্তির পর যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তার পরিসমাপ্তি এ চুক্তির মাধ্যমেই মূলত ঘটে।

এভাবে ইহুদীরূপ একটি বিষবৃক্ষকে প্যালেস্টাইনীদের বুকের ওপর শক্ত করে পুঁতে দিয়ে তথাকথিত পাশ্চাত্যের মানবতার ধ্বজাধারী পরাশক্তিগুলোও

চিত্র ৪০ ঃ যুদ্ধ বিরতির পর মুসলমানদের জেরুজালেমে প্রবেশের একমাত্র পথ ম্যান্ডেলবাম গেটের চিত্র।

তাদের হাতের পুতুল সম্মিলিত জাতিসংঘ মনে করতে থাকে যে, বিশ্বে পূর্ণাঙ্গ শান্তি স্থাপনের পথ (আপতত) পরিষ্কার হলো। তবে তারা যা-ই ভাবুক না কেন ; আর যত মুখরোচক বুলি ছুড়েই মুসলমান জাতিকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করুক না কেন ; তাদের সাধের গড়া অন্যায়ের ও অত্যাচারের কাঁচের প্রাসাদ অদূর ভবিষ্যতে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে, সত্য একদিন জয়যুক্ত হবেই।

৫.৫ মুসলমানদের পতনের কারণ

তবে সবার মনে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে যে 'সিংহ শাবক' মুসলমান সম্প্রদায়ের এরূপ শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কি ? কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলো পেয়ে থাকি।

প্রথমতঃ এরূপ একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো ; কিন্তু প্যালেস্টাইনীরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগ দিয়েই ইহুদীরা সামরিক বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হলে বৃটেনের সপক্ষে লড়বার জন্য বৃটেনের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ বাহিনী গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বৃটেন ছাড়াও অন্যান্য দেশে বসবাসকারী ইহুদীরা জায়নবাদী নেতাদের নির্দেশে ব্যাপক হারে সামরিক বিভাগে চাকুরী নেয়। পরে এরাই জাতীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে স্রোতের ন্যায় পরাশক্তিদের সহযোগিতায় প্যালেস্টাইনে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত
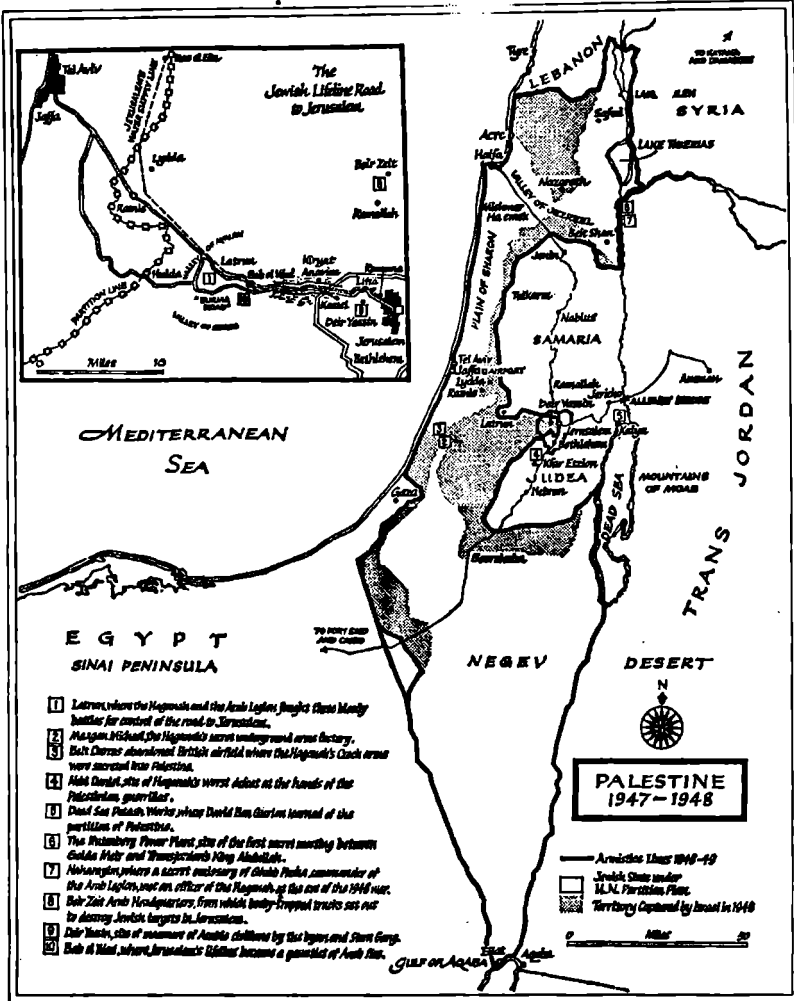
মানচিত্র ৬ ঃ ১৯৪৮-'৪৯ সালের যুদ্ধবিরতির চিহ্ন, জাতিসংঘ ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির যে ভূখণ্ড দিয়ে ছিলে তা থেকে ইসরাঈলীরা কতটুকু বেশী দখল করলো এবং অন্যান্য ঘটনা সম্বলিত মানচিত্র।

তেতাল্লিশ হাজার ইহুদী সামরিক লোক প্যালেস্টাইনের মাটির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। অপর পক্ষে প্যালেস্টাইনের জনগণের একাংশ নিজেদের পেটের সাথে সংগ্রাম করেই পরিশ্রান্ত হচ্ছিলো ; এর আর এক অংশ শহরের বিলাসবহুল জীবনে গা ভাসিয়ে চলছিলো।

দ্বিতীয়ত প্যালেস্টাইনীরা ভাবতো, জাতিসংঘ যতই তাদের দেশে ইহুদীদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুক না কেন পরদেশী

ইহুদীরা কখনোই তাদের মাতৃভূমিকে কর্তন করে নিতে সাহস পাবে না। কারণ প্যালেস্টাইনে অবস্থানরত নবাগত ইহুদীদের সংখ্যা তাদের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। কাজেই জোর করে তাদের পক্ষে আমাদের মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না তা যতই তারা পরাশক্তি কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট হোক না কেন। আর যদি সত্যি সত্যিই তারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তবে পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত মুসলমান দেশসমূহ রয়েছে তারা কোনো মতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। আমাদের সেই আশঙ্কিত বিপদের দিন অবশ্যই সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসবে।

প্যালেস্টাইনীদের এরূপ আশা করা কিন্তু অমূলক ছিলো না। কিছু পরেই তাদের মনের এ সুপ্ত আশাই আরব বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এতে তারা আরো আশ্বস্ত হয় এবং এদিক দিয়ে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। এদিকে আরব বিশ্বের বেতার কেন্দ্র থেকে মুহুর্মূহ প্রচার করতে থাকে যে, যেহেতু প্যালেস্টাইনী আরবরা মুসলমান এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সেহেতু তাদের বিপদ মানেই আমাদের বিপদ। অতএব প্যালেস্টাইনীরা ভাবে কোনো অজুহাতেই তারা প্যালেস্টাইনকে ইহুদীদের রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিবে না। এতে প্যালেস্টাইনীরা মনে মনে আত্মতৃপ্তিও লাভ করে। আর এটাই তাদের দুঃখের মূল কারণ।

তৃতীয়ত, প্যালেস্টাইনে যে সমস্ত ইহুদী এসে ঘাঁটি গেড়েছিলো তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত এবং যে কোনো পরিস্থিতিকে বিচার বিশ্লেষণ করার মত মানসিক ক্ষমতা তাদের ছিলো ; কিন্তু প্যালেস্টাইনীদের তা ছিলো না। তাদের অধিকাংশই ছিলো শান্তি প্রিয় কৃষিজীবি।

চতুর্থত, তুলনামূলকভাবে আরব সমাজ ছিলো মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক এবং সকল দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। মধ্যপ্রাচ্যে—বিশেষ করে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত প্যালেস্টাইনেও মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় অধিকাংশ কৃষক ছিলো ভাগ-চাষী। দারিদ্রতা ও সামাজিক অচলায়তন তাদের জীবনকে সঙ্কুচিত করে রেখেছিলো। অন্যদিকে শিক্ষার দিক দিয়েও তাঁরা অনেক পিছনে পড়েছিলো। আর এজন্যই আধুনিক ভাবধারার সাথে তাদের পরিচয়ের অভাব ঘটে। ফলে সমাজ সংগঠনের মৌলিক সূত্রগুলোর সাথে তাদের পরিচয় ঘটেনি—অন্তত আধুনিক সূত্রগুলোর সাথে তো নয়-ই।

প্যালেস্টাইনের মুসলিম জনসাধারণে শিক্ষায় অনগ্রসরতার বড় প্রমাণ এই যে, সংখ্যায় তারা প্যালেস্টাইনের অমুসলিমদের অপেক্ষায় কয়েক গুণ বেশি হলেও তাদের মধ্যে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিলো। নীচের পরিসংখ্যান থেকে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে ঃ

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা		শিক্ষকের সংখ্যা		ছাত্র সংখ্যা	
	মুসলিম	অমুসলিম	মুসলিম	অমুসলিম	মুসলিম	অমুসলিম
১৯২১-'২২	৪২ টি	১৩৯টি	১১৪জন	৬৮৮জন	২,২৮৭জন	১১,৯৫২জন
১৯২২-'২৩	৩৮ ,,	১৭২ ,,	১১২ ,,	৭৮৬ ,,	২,৪৭৭ ,,	১৩,৩৪৮ ,,
১৯২৩-'২৪	৪৭ ,,	১৭৯ ,,	১৩১ ,,	৮৪৩ ,,	৩,০৪৪ ,,	১৪,৩২৮ ,,
১৯২৪-'২৫	৫০ ,,	১৮৪ ,,			৩,৫৬৫ ,,	১৫,৩২১ ,,
১৯২৫-'২৬	৪৫ ,,	১৮৩ ,,	১৪০ ,,	৮৬৬ ,,	৩,৪৪৫ ,,	১৪,৩৮৫ ,,
১৯২৬-'২৭	৫৩ ,,	১৯৩ ,,	১৮৪ ,,	১,০০৫ ,,	৪,৫২২ ,,	১৪,৯১৯ ,,
১৯২৭-'২৮	৭৩ ,,	১৯১ ,,	১৮১ ,,	৯৯৭ ,,	৪,৫২৫ ,,	১৩,৫৯৭ ,,
১৯২৮-'২৯	৭৫ ,,	১৬২ ,,	১৯৫ ,,	১,০২৩ ,,	৪,৭১৯ ,,	১৪,০৯৬ ,,
১৯২৯-'৩০	৯৪ ,,	১৪৯ ,,	২৩৭ ,,	১,০২১ ,,	৫,৬৪৪ ,,	১৪,১২৪ ,,
১৯৩০-'৩১	১৩৭ ,,	১৮১ ,,	২৭১ ,,	১,০৯১ ,,	৭,২৪৩ ,,	১৪,৩৬০ ,,
১৯৩১-'৩২	১৫৭ ,,	১৫১ ,,	৩৩০ ,,	১,০৬১ ,,	৯.১২৭ ,,	১৪.১০০ ,,

পঞ্চমত, প্যালেস্টাইনের যে সমস্ত শিক্ষিত ও নেতৃত্ব স্থানীয় লোক ছিল তাদের ওপর ইহুদী গোপন সংস্থাগুলোর আঁচড় পড়ায় তারা সংকীর্ণ ও আত্মধ্বংসী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এরই পরিণতি হিসেবে তাদের ভেতর চলতে থাকে অহরহ কোন্দল ও সংঘাত। পবিত্র জেরুজালেমের হুছাইনী ও নাশাশিবী এবং হুছাইনী ও ট্রান্সজর্দানের হাশেমীয় পরিবারের মধ্যে এ একই কারণে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিলো। ফলে জেরুজালেমের নেতৃত্বদানকারী এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারত্রয়ের উচ্চ শিক্ষিত লোকজন কোনো মতেই এক হতে পারেনি। পারেনি যৌথভাবে বহিশত্রুর মোকাবিলা করতে ; বরং ইহুদীরা এ পরিবারত্রয়ের ভিতরে এমন বিষ ছড়িয়ে দেয় যাতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হাজী আমিন ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য প্যালেস্টাইনীদের মধ্যে আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ফলে অসংখ্য মুক্তিসেনা তাদেরই ভাই কর্তৃক আহত ও নিহত হয়। এ দৃশ্য ছিলো বড়ই মর্মস্পর্শী ও করুণ।

ষষ্ঠত, প্যালেস্টাইনী ভাইদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলো যে সমস্ত আরব দেশ তাদের অধিকাংশই ছিলো হয় সদ্য-স্বাধীন না হয় বিদেশী

শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সিরিয়া ও লেবানন মাত্র দু' বছর পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করে ; মিশর ও ইরাকে তখন পর্যন্ত বৃটেনের সেনাবাহিনীরও প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। ফলে দীর্ঘদিন খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর ন্যায়ই এরা ছিলো আড়ষ্ট ; রাষ্ট্র পরিচালনা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মুকাবেলার মত মানসিক বল ও দৃঢ়তা তাদের মধ্যে ছিলো না। অন্যদিকে আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার সাথেও তাদের কোনো পরিচয় ছিলো না।

সপ্তমত, আরবদের মধ্যে একতাবোধের অভাব ছিলো। বিভিন্ন আরব দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো সমঝোতা বা অভিন্ন কার্যক্রম ছিলো না। ফলে ইহুদীগণ তাদের সুবিধামত স্থানে ও সময়ে আলাদা আলাদা এক একটি আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জয়ী হতে থাকে.। প্যালেস্টাইনের মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ মূসা আলামী এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

"The Jews toak full advantage of our disunity and the anarchy of our set-up, when the time was opportune they collected all their forces and ... dealt us heavy concentrated blows ... Thus the country fell, town after town, village after village, position after position, as a result of this fragmentation, lack of unity and of a couuion command."

অষ্টমত, আরব রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি তাদের পরাজয়ের পথ আরো প্রশস্ত করছিলো। মিশরের বাদশাহ ফারুক ও তাঁর দোসররা সেনাবাহিনীর জন্য অকেজো অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে নিজেদের জন্য বিপুল অর্থ উপার্জন করে ; এ অস্ত্র নিয়ে মিশরীয় বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করা সম্ভব ছিলো না। সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী জামিল মারদামের ভাই ক্যাপ্টেন ফুয়াদ মারদাম সিরিয় জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থে ইতালীতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে উৎকোচের বিনিময়ে অস্ত্র ভর্তি জাহাজগুলো ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়। এ ধরনের বহু উদাহরণ হতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীগণ যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ও স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করছিলো তা আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলো না।

নবমত, ভৌগোলিক অবস্থা আরবদের বিপক্ষে কাজ করছিলো। কয়েকটি আরব দেশের বাহিনী বহুদূর হতে এসে এত ক্লান্ত ছিলো যে, তাদের পক্ষে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভবই ছিলো। এ সম্বন্ধে আরব লিজিয়ন সেনাপতি জন ব্যাগোট পাশা মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন ঃ

"It is not redized that the distance from Baghdad to Haifa is seven hundred miles, as far as from Calais to Viena or London to Berlin. Moreover, the greater part of this distance is across waterless desert."

পবিত্র জেরুজালেম নগরী উদ্ধারে মুসলমানদের ব্যর্থতার পিছনে এছাড়াও আরো কারণ আমরা খুঁজে পাই। এ প্রসঙ্গে 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মির' গঠন ও এর পরিণতির কথা উল্লেখ করতে পারি। প্যালেস্টাইনী আরব ভাইদের ব্যথায় ব্যাথিত হয়ে লীগভুক্ত আরব দেশগুলো ঠিক সময়মত এগিয়ে আসে এবং একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে কায়রোর প্রধান সড়ক 'কাসক্রুন-নীল'-এর পার্শ্বে অবস্থিত মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়। এ দেশগুলো ছিলো ঃ মিশর, ইরাক, সৌদী আরব, সিরিয়া, ইয়েমেন, লেবানন, ও ট্রান্সজর্দান—বর্তমানে যেটা শুধু জর্দান নামেই পরিচিত। আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুর রহমান আজম পাশা ছিলেন এ অধিবেশনের অষ্টম প্রতিনিধি। যাই হোক দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর উক্ত দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ বেশ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এগুলো হলো ঃ (ক) লীগভুক্ত দেশগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতে বিরোধিতা করে যাবে ; (খ) আরব লীগ প্যালেস্টাইন স্বাধীন ও অবিভক্ত রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ; (গ) জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইন থেকে শত্রুকে উৎখাত করার জন্য আরব লীগ "ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি" নামে একটি বাহিনী গঠন করবে ; (ঘ) ইরাকী জেনারেল ইসমাঈল শাফাওয়েত পাশা হবেন এ নব গঠিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ; (ঙ) এ বাহিনীর হেড কোয়াটার হবে দামেস্ক—যেখানে শুয়ে আছেন জেরুজালেম বিজেতা কিংবদন্তীর মহান বীর গাজী সালাহউদ্দীন ; এবং (চ) ইহুদী হায়েনাদের কবল থেকে নিরীহ জেরুজালেমবাসীকে দ্রুত রক্ষার জন্য এ বাহিনী পাঠাতে হবে ; এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে দশ হাজার রাইফেল, তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক এবং এক মিলিয়ন পাউন্ট স্টার্লিং সরবরাহ করার জন্য লীগভুক্ত দেশগুলো নৈতিক দিক দিয়ে বাধ্য থাকবে।

কিন্তু আরব লীগের এ গোপন সিদ্ধান্তগুলোর কথা গোপন থাকতে পারেনি। বৃটিশ ও ফরাসীরা ঐগুলো ইহুদী গোয়েন্দা বিভাগের কাছে সাথে সাথেই ফাঁশ করে দেয়। এদিকে কায়রোয় আরবদেশগুলোর একত্রিত হবার কথা শুনে ডেভিড বেনগুরিয়ন ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ পরিস্থিতি

কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তা পুরোপুরি জানতে না পারায় নতুন পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন না। এর ভেতর যখন বৃটিশ ও ফরাসীদের সহায়তায় আরব রাষ্ট্রগুলোর গোপন পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হলেন তখন তিনি আরব জোটকে ভাঙ্গার জন্য ইহুদী গোপন সংস্থাগুলোকে দ্রুত নিয়োগ করেন এবং ইহুদী গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে লীগভুক্ত প্রতিটি আরব দেশের রাজধানীতে দ্রুত পাঠিয়ে দেন, যাতে তাদের যাবতীয় গতিবিধি জেনে নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এটা তিনি তেলআবিবের ১৫ কেরেন কায়েমাত রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত নিজস্ব বাসভবনে বসে বসে করছিলেন। এরপর মুহূর্তেই তিনি জেরুজালেমে মোতায়েন রত হাগানা কমাণ্ডারের সাথে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হবার জন্য বাসভবন ত্যাগ করেন এবং জেরুজালেমের উপশহরের একটি স্কুলে রাতের অন্ধকারে গিয়ে পৌছান। মোমবাতির গম্ভীর মিষ্টি আলোতে ইসরাঈল জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকটি বসে। বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়ার পর অধিবেশনের এক চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি হাগানা কমাণ্ডারদের দিকে একটু ঝুঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিম্নোক্ত কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"If the Arabs could lock Jerusalem in to their strangle hold, they can end us, and our state will be feninished before it is born." তিনি আরো বলেন ঃ "It is time to start plannng for a war aganist five Arab armies."

এর পরপরই শুরু হয় আরব ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করার জোর তৎপরতা। জাইয়ীশ এজেন্সী, ফ্রি ম্যাসন সংস্থা এবং অন্যান্য গোপন ইহুদী সংগঠনগুলো লীগভুক্ত নেতৃবৃন্দের পিছনে উঠে পড়ে লেগে যায়, যাতে তাদের সম্পর্কের ভেতর চিড় ধরাতে পারে। আর এটা করতে ঐ সমস্ত ইহুদী সংস্থাগুলোর মোটেই বেগ পেতে হয়নি। কারণ নীতি ভ্রষ্ট সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত উচ্চাভিলাষী বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবাধীন লীগভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মূলত কোনোই সদ্ভাব ছিলো না। প্রথমত, কায়রো ও ইরাকের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী খিলাফতিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন্দল চলছিলো। দ্বিতীয়ত, তেল সম্পদে সমৃদ্ধ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সৌদী আরব ও এর পার্শ্ববর্তী আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রে বিশ্বাসী গরীব দেশসমূহের মধ্যে প্রতিনিয়তই তিক্ত সম্পর্ক বিরাজ করছিলো। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত, গোত্রীয় ও জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার বশবর্তী হয়ে এরা পরস্পর পরস্পরের সর্বক্ষণই অমঙ্গল কামনা করতো। এটা সৃষ্টি হয়েছিলো কুচক্রী পরাশক্তিগুলোর দীর্ঘদিনের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি প্রয়োগের

জন্য। এরই ফলে সিরিয়া লেবাননকে, ইরাক সিরিয়াকে, কায়রো ট্রান্সজর্দানকে এবং ট্রান্সজর্দান সৌদী আরবের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে মনে মনে প্রস্তুত ছিলো ; কিন্তু পরবর্তীকালে আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুর রহমান আজম পাশা ও সৌদী যুবরাজ মহান ফয়সালের ন্যায় সচেতন প্রতিভাধর নেতৃবৃন্দের প্রাণপণ চেষ্টায় ১৯৪৫ সালে এ আরব লীগ গঠিত হলেও মূলত এত দ্রুত তাদের ভেতর ঐক্য আনয়ন করা সম্ভব হয়নি। এবং এ না হবার পিছনে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তি ও জায়নবাদী গোপন সংস্থাগুলোই মূলত দায়ী ছিলো। কারণ তারা জানে বীরের জাতি মুসলমানদেরকে এক হতে দিলেই বিশ্বব্যাপী তাদের খোদকারী আর চলবে না এবং তারা বিশ্বের সম্পদ রাজিকে এভাবে লুণ্ঠনও করতে পারবে না—পারবে না তাদের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা চরিতার্থ করতে। অপর দিকে তাদের অবৈধ দুষ্ট সন্তান ইহুদীদের জন্যও কখনো আর জেরুজালেমের পবিত্র ভূমিকে কেন্দ্র করে প্যালেস্টাইনে ইসরাঈল নামে এ বিষবৃক্ষকে রোপণ করাও যাবে না। তাই মুসলমানরা খিলাফতকে ধ্বংস করে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যখন আরব লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুসংগঠিত হবার চেষ্টা করে এবং ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আক্রান্ত প্যালেস্টাইনী ভাই মহান নগরী পবিত্র জেরুজালেমকে ইহুদী রাহুমুক্ত করার জন্য যৌথভাবে এক বিশাল বাহিনী প্যালেস্টাইনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় তখন মুসলিম বিরোধী পরাশক্তি ও জায়নবাদী নেতৃবৃন্দের মাথায় বজ্রপাত ঘটে। ফলে তারা লীগ সৃষ্ট 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি'-র ভেতর ভাঙ্গন ধরানোর জন্য দামেস্কের 'হোটেল ওরিয়েন্টাল প্যালেস'-এ গিয়ে ভীড় জমায়। ঠিক সময় মতই আরব লীগভুক্ত দেশসমূহ থেকে প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কমাণ্ডার ও নেতৃবৃন্দও দামেস্কে গিয়ে উপস্থিত হতে থাকে এবং রাজনীতিবিদ ও জেনারেলরা পঞ্চাশ বছরাধীককালের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ বলে পরিচিত 'হোটেল ওরিয়েন্টাল 'প্যালেসে' গিয়ে একত্রিত হলে এদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য উক্ত হোটেলের পাশের কক্ষে কুচক্রীরাও গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং অভিষ্ট লক্ষে পৌছানোর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এ কাজে জাইয়ীশ এজেন্সী, ফ্রিম্যাসন সংস্থা এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিগুলো অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় প্যালেস্টাইন অভিযানের প্রস্তুতি লগ্নেই র‍্যাঙ্ক ও নেতৃত্বের কোন্দল এসে তাদেরকে আঘাত করা শুরু করেছে এবং পরিশেষে এরা প্রায় প্রত্যেকেই একে অপরের কমাণ্ডকে মানতে অস্বীকার করে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে ঃ

"Everything was in short supply in Safwat's head quarters except for the cases of papers and files which spilled throngh the ffice, chairs, tables, telephooes were lacking. There was no radio to link the headquarters to the field. A swarm of syrian and Iraqi officers buzzed arround the bulding seemingly more familiar with the science of political interigue than with that of warfare. The distribution funds, of commands, of rank, of operational zones, of arms and matereals all were objects of bargarning as intensive as any displayed in the city's souks."

এমতাবস্থায় চলতে দিলে পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরো খারাপ হবে ; তাই ভেবে অগত্যা এটাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রত্যেক দেশ থেকে প্রেরিত ভলেন্টিয়ার বাহিনী তাদের স্ব স্ব কম্যাণ্ডারদের নির্দেশ মাফিক জেরুজালেমসহ গোটা প্যালেস্টাইন ইহুদীমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এর পরিণতিটা হাজী আমিন পূর্বাহ্নেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এর মুকাবিলার জন্য বন্ধু হিটলারের দেয় বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে দ্রুত দামেস্কে গিয়ে উপস্থিত হন এবং হোটেল ওরিয়েন্টাল প্যালেস-এ গিয়ে ওঠেন। পরিস্থিতিটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে বিরাজমান তিক্ত অবস্থার মুকাবিলার জন্য লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেন ঃ প্রথমত, তিনি বলেন, প্যালেস্টাইনী ভাইদের মুক্তির জন্য আরব লীগের পক্ষ থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা-পয়সা সংগৃহীত হবে তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'আরব উচ্চ কমিটি' নামে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তা ইহুদীদের জীইয়ীশ এজেন্সীর মুকাবিলার জন্য প্যালেস্টাইনী জনগণের অস্থায়ী সরকার হিসেবে কাজ করে যাবে। এবং তৃতীয়ত, 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি' নামে কোনো বাহিনী থাকবে না। যদি তা রাখতেই হয় তবে আধুনিক কালের মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যের জ্বলন্ত প্রতীক মহান জেরুজালেমের মুক্তি ও প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের প্রথম সৈনিক হাজী আমিনই নিজে নিয়োগ করবেন এই 'ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মি'-র প্রধান কমাণ্ডকে। এ শেষোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে হাজী আমিনের প্রতি বৃটিশদের ক্রীড়নক ইরাকী জেনারেল শাফাওয়েত পাশা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে এবং হাজী আমিনের বিরুদ্ধে হাজারো রকমের অভিযোগ এনে দাঁড় করায়।—তহবীল তছরূপ, অস্ত্র পাচার, স্বজন প্রীতি ইত্যাদি রকমের অসংখ্য অভিযোগ তুলে আরব বিশ্বের সামনে হাজী আমিনের মহান ব্যক্তিত্বকে খাটো করার চেষ্টা করে। এটা উচ্চাভিলাষী আরব জগতের দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতক ট্রান্সজর্দানের বাদশাহ

আবদুল্লাহ এটা সুবর্ণ সুযোগ বলে গ্রহণ করে এবং তার আকাংখা পূরণের পথে প্রধান বাধা হাজী আমিনকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিবার জন্য কুচক্রী বৃটিশ ও জীইয়ীশ এজেন্সীর রাজনৈতিক সেক্রেটারী মিসেস গোল্ড মায়ারের সাথে পরামর্শ করেন এবং স্বার্থান্বেষী ফওজী-আল-কাকজীকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। আর এতে পূর্ণ সমর্থন জানায় ইরাকের রাজ সিংহাসনে সমাসিন বৃটেনের সমর্থনপুষ্ট নূর আস সাঈদ। যার স্যুট, কোট-টাই ও অন্যান্য পোশাকাদি বৃটেন থেকে নিয়মিত পাঠানো হতো। প্যালেস্টাইনের মুক্তি পাগল জনতা প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুছাইনীর সুনিপুণ পরিচালনায় যখন একের পর এক প্রতিটি রণাঙ্গনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের এ অশুভ পাঁয়তারা।

ফওজী আল কাকজী এমনি একটি নাম এবং এমনি একজন ব্যক্তি, যে সারাটি জীবনই পরের স্বার্থে পরের কথামত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে তাকিয়ে হাজারো রকমের জঘন্য কাজকর্মে নিজেকে কলংকিত করেছেন।

উত্তর লেবাননে জন্মগ্রহণকারী ফওজী আল কাকজী প্রথম জীবনে ওসমানীয় খিলাফতের সৈনিক বিভাগে চাকুরী নেন। পরে সেই খিলাফতেরই ধ্বংস সাধনের জন্য বৃটিশ ও ফ্রিম্যাসন সংস্থার পরিচালনায় কাজ করতে থাকেন। পরে তাঁকে বৃটিশরা মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসীদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গোয়েন্দাগিরীর কাজে লাগায়। হিটলারের 'গেষ্টেপো' ফওজী আল কাকজীর সঠিক ও সুনিপুণ গোয়েন্দাগিরী দেখে চমৎকৃত হলে জার্মানি-ফুরার এডল্‌ফ হিটলারকে জানায়। এরপর হিটলার তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের আওতায় নিয়ে গিয়ে ফরাসী ও বৃটিশদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োগ করেন।

১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটরী প্রশাসন এখানকার জনগণের ওপর অবিচার ও নিষ্পেষণ শুরু করলে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে তাতেও তিনি নেতৃত্ব দেন। এতে প্যালেস্টাইনী আরবদের ভেতর যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, তার চেয়েও অধিক শ্রদ্ধা অর্জন করেন প্যালেস্টাইনী জনতার মুক্তি দূত হাজী আমিন আল হুসাইনী। এরপর হাজী আমিন ইরাকের বৃটিশ রাজের পুতুল সরকারকে উৎখাত করার জন্য যে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন তাতেও ফওজী আল কাকজীকে নিয়োগ করেন ; কিন্তু এখানে তার কর্তৃত্বাধীনে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ-সম্পদ এবং যুবক শ্রেণীকে দিয়েছিলেন তা আত্মসাৎ করে ঐ যুব শ্রেণীকে বিপথগামী করেন। ফলে হাজী আমিনের

ইরাকে অভ্যুত্থান ঘটানো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর থেকেই হাজী আমিনের সাথে ফওজী আল কাকজীর সংঘাত শুরু হয়। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে তারা উভয়ে যখন পালিয়ে বার্লিনে চলে যান, তখন এক জায়গায় থাকলেও তাদের ভেতর সম্পর্কের উন্নতি না হয়ে বরং দারুণভাবে অবনতির নিম্নস্তরে গিয়ে পৌছায়। এরই ফলে ফওজী আল কাকজী হিটলারের বন্ধু আমিনের আওতায় থাকা নিরাপদ মনে না করায় ফ্রান্সে চলে যান। তারপরেই মিশরে চলে আসেন। এখান থেকেই তিনি ঘোষণা দেয় ঃ

"... he was at the disposition of the Arab people should they call on me to take up arms again."

এটা ঐ সময়কার ঘটনা যখন দামেস্কে লিবারেশন আর্মির নেতৃত্ব দেয়া-নেয়া নিয়ে এক আত্মঘাতি কন্দোল চলছিলো এবং হাজী আমিন এ অবস্থা উত্তরণের জন্য হোটেল ওরিয়েন্টাল প্যালেসে এসে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত-গুলোর কথা বলেছিলেন। হাজী আমিনের এ খোদকারী এবং জেরুজালেম উদ্ধারের সঠিক নির্দেশনা দেয়াতে মুসলিম বিশ্বের যে সকল বিশ্বাসঘাতক তাদের স্ব স্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলো তারা ক্ষেপে যায়। এ সুযোগে তাদেরকে দিয়ে বৃটিশ কুচক্রী ও জায়নবাদী নেতারা প্যালেস্টাইন উদ্ধারের জন্য হাজী আমিনের নেতৃত্বে যে সঠিক, সুসংহত এবং সুসংগঠিত সংগ্রাম চলছিলো তার ভরাডুবির জন্য ফওজী আল কাকজী নামে এ কপট দুশ্চরিত্র নেতার অধীনে ভলেন্টিয়ার লিবারেশন আর্মির যৌথ কাউন্টার কমাণ্ড অর্পণ করে। এ আত্মঘাতি কাজের পুরো ভাগে ছিলেন ট্রান্সজর্দানের বৃটিশ রাজের পুতুল সরকার বাদশাহ আবদুল্লাহ। এর পরেপরেই বেতার, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, মসজিদের নামাজান্তে ইমামের এবং এমন কি চা-এর স্টলে বসে বসে হাজী আমিনকে বাদ দিয়ে ফওজী আল কাকজীর নেতৃত্বে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য জোর প্রচারণা চালানো হয়। এরই ফলে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনসমাজ, অস্ত্র সংগ্রহের লোভে রাজনৈতিক কর্মিরা এবং লুটতরাজের আশায় হাজার হাজার মানুষ বাস, ট্রাক, বেবী-টেক্সী, মোটর সাইকেল, সাইকেল এবং ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়ে চড়ে প্লাকেট ঝুলিয়ে দামেস্কের দিকে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে আসতে থাকে। ফলে দামেস্কের পরিবেশ এমন বিষাক্ত হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত সিরিয় সরকার বাধ্য হন ফওজী আল কাকজীকে প্যালেস্টাইনের কোনো এক নিরাপদ স্থানে ক্যাম্প করে সেখানে এ সমস্ত নবাগত জনগণকে ভলেন্টিয়ার বাহিনীতে রিক্রুটিং ও অভিযান চালানোর অনুরোধ জানাতে। এদিকে আরো একটি মুশকিল হলো, এভাবে যারা ছুটে আসলো তাদের ভেতর কমান্ড বা ট্রেনিং

দেয়ার মতো তেমন কোনো লোক ছিলো না। অন্য দিকে যারা ট্রেনিং পেলো তাদেরকেও পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র দেয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। ফলে উচ্ছৃংখল জনতা 'Mob'-দের ন্যায় হুড়হুড় করে প্যালেস্টাইনে ঢুকে পড়ে। এদের ভেতর অধিকাংশই ছিলো সিরিয়ার 'বাথ পার্টির কর্মীবৃন্দ, মিশরের 'মুসলিম ব্রাদার্স'-এর কর্মীবৃন্দ, সাধারণ যুব সমাজ, ইরাকের নূর আস সাঈদ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকারী পলাতক সৈনিকবৃন্দ (রশিদ আলীর নেতৃত্বে), সার্কাসিয়ানরা, কুর্দীরা, দ্রুজরা এবং এ্যালাওভিট্সরা। যাদের আগমনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিলো লুণ্ঠন করা। তাদের এ লুণ্ঠন কাজে দোসর হবার জন্য তাদের সাথে অনেক চোর-ডাকাতও অংশগ্রহণ করেছিলো। ফলে এরা প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের হাইকমাণ্ড মুফতী হাজী আমিনের সুষ্ঠু পরিচালনায় যখন প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুসাইনীর বীরোচিত নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর ইউনিটগুলো মহান নগরীর প্রবেশ পথের আশপাশ গ্রামগুলোর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন কাকজীর নেতৃত্বে পরিচালিত ঐ সমস্ত আত্মধ্বংসী উচ্ছৃংখল জনতা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে গ্রামগুলো লুট করা শুরু করে। ফলে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে শত্রুদের ওপর গুলী চালাতে দারুণভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ফওজী আল কাকজীও নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাজী আমিনের প্রভাবকে ম্লান করে দেয়ার জন্য বেশ কয়েকটি স্থানে আক্রমণ চালিয়ে অত্যন্ত পারদর্শীতা দেখায়। এজন্য যে প্যালেস্টাইনের মুক্তি পাগল জনতা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এটা করাতে কুচক্রী বৃটিশ ও তার সমর্থনপুষ্ট বাদশাহ আবদুল্লাহর মনে একটি সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কারণ, তারা মনে করছিলো যদি প্যালেস্টাইনের বীর সৈনিকরা কাকজীর নেতৃত্বে যুদ্ধে জয়ী হয়ে যায়। আর তাহলে তার জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইন নিজ রাজ্যভুক্ত করার স্বপ্নটা আর বাস্তবায়িত হবে না। অন্যদিকে এটা বৃটিশ স্বার্থেরও পরিপন্থি ছিল। তাই সন্ধিহান হয়ে বাদশাহ আবদুল্লাহ স্বয়ং জন ব্যাগোট বা গ্লাব পাশাকে সাথে করে আরব লিজিয়ন বাহিনী নিয়ে প্যালেস্টাইনে ঢুকে পড়ে। আবদুল্লাহ তেল তখন এ বাহিনীর মেজর পদে উন্নীত।

আরব লিজিয়ন বাহিনীর সৃষ্টি ইতিহাস সম্বন্ধে পাঠক সমাজকে একটু ধারণা দেবার জন্য আমাকে আবার পিছিয়ে গিয়ে আলোচনা শুরু করতে হচ্ছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা লগ্নে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাথে কথা ছিলো যে, যুদ্ধ শেষ হলে তারা জাতীয়তাবাদী আরবদের নেতা মক্কার শরীফ হুসাইনের ছত্রছায়ায় তাদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি দান করবে। আর এ

আশ্বাসের ওপর ভরসা করেই তারা ১৯১৬ সালের জুন মাসে তুর্কী খিলাফতের (ওসমানীয় সাম্রাজ্যের) ধ্বংস সাধন করার জন্য মিত্র বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। এবং হাজার হাজার মুসলমান ভাইয়ের বুকের রক্তে আরবের বালুকা রাশি রঞ্জিত করে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক তুর্কীর খিলাফতের ধ্বংস সাধন করে। কিন্তু যুদ্ধ থেমে গেলে দেখা যায়, বিজয়ী কপট বন্ধুদ্বয় বিজিত আরব বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে এটা তারা বৈধ করে নিলে আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে হায়! হায়! রব ওঠে এবং বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য সামাজিকভাবে আরব জাতীয়তাবাদী দলের নেতা শরীফ হুছাইনের তৃতীয় পুত্র ফয়সালকে মধ্য-সিরিয়ার শাসনকর্তারূপে মেনে নেয় ; কিন্তু ১৯২০ সালের ২৫ জুলাই সেখান থেকে ফরাসীরা জেনারেল গুরোর নেতৃত্বে জোরপূর্বক ফয়সালকে উৎখাত করে এবং সমগ্র সিরিয়া ফরাসীদের ম্যাণ্ডেট শাসনের আওতায় নিয়ে যায়। ফলে আবার পরিস্থিতির চরম অবনিত ঘটে। ফরাসীদের এ বিশ্বাসঘাতকতায় ও দুর্ব্যবহারে ফয়সালের ভাই আবদুল্লাহ (বাদশাহ আবদুল্লাহ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং এর একটি সমুচিত জবাব দেবার জন্য দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মা'আন দখল করে নেন। এরপর তিনি সরাসরি আম্মানের দিকে অগ্রসর হন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহর এ ঔদ্ধত্যতা দেখে বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে আবদুল্লাহ আরবদের ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করে নয় ; বরং তাদেরই স্বার্থের কথা চিন্তা করে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, সিরিয়ার ম্যাণ্ডেট শাসক ফরাসীরা কোনোক্রমেই আবদুল্লাহর এরূপ ঔদ্ধত্য বরদাশত করবে না। তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বাহিনী যে কোনো মুহূর্তে তাকে শুধু আক্রমণ করে পরাজিতই করবে না বরং জর্দান নদীর পূর্বাঞ্চলও দখল করে নিতে পারে। আর যদি তা সত্যি সত্যিই নেয়, তবে তা হবে মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থের জন্য চরম পরিপন্থি ও মারাত্মক। তাই এ সম্ভাবনা দূর করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ খুব দ্রুত আবদুল্লাহ ও প্যালেস্টাইনের বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েলের মধ্যে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করে। মিঃ লরেন্স এবং জেরুজালেমে অবস্থানরত বৃটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী মিঃ চার্চিলও এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এ সম্মিলনেই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ট্রান্সজর্দানের শাসনভার আবদুল্লাহর ওপর অর্পিত হবে এবং প্যালেস্টাইনের বৃটিশ হাই কমিশনারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে শাসনকার্য পরিচালনা করবে। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ

পার্লামেন্ট বাদশাহ আবদুল্লাহর সরকারকে বার্ষিক এক লাখ আশি হাজার পাউণ্ড অর্থ সাহায্য সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একই শর্তে তার ভাই ফয়সালকে নিয়ে গিয়ে ইরাকের শাসনকর্তা বানায়।

এভাবে বৃটিশ রাজ একদিকে যেমন প্রশাসনিক ব্যাপারে আরবদেরকে বৃটিশদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে ; অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তারা সুকৌশলে তাদের ওপর নির্ভর করে তোলে। তবুও আর একটি শক্তি আরবদের হাতে থেকে যায়। তাই তারা সেই প্রধান শক্তি 'সামরিক বল'কে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায় এবং বিশেষ করে ট্রান্সজর্দান ও ইরাকীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'আরব লিজিয়ন' (Arab Ligion) নামে এক শক্তিশালী পেশাদারী সামরিক বাহিনী গঠন করে। এটা ছিল শঙ্কর জাতীয় একটি সামরিক সংগঠন ; যার অধিকাংশই ছিলো আরব বেদুঈন। আর বাদবাকী অংশের মধ্যে বৃটিশ, অষ্ট্রেলিয়ান ও অন্যান্য দেশীয় যুবক ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কর্ণেল এফ. জি. পীক (F. G. Peke)। ১৯৩৯ সালে পীক অবসর গ্রহণ করলে জন ব্যাগোট বা গ্লাব পাশা এর নেতৃত্ব নেয়। এই জন ব্যাগোট পাশা এমনি এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে দেখলে বা কথা শুনলে একজন আরব বেদুইন বলেই মনে হতো। অথচ সে একজন বৃটিশ সন্তান। দীর্ঘদিন আরবের সমাজে বসবাস করে আরব নাড়ি-নক্ষত্রের খবর, ভাষা ও চাল-চলন পূর্ণভাবে রপ্ত করে ফেলেছিলেন। ফলে বৃটেনের গোয়েন্দা বিভাগের লোক এ নয়া সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দানের জন্য অত্যন্ত যোগ্যতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। এ ব্যাগোট পাশা যখন আরব লিজিয়ন বাহিনীর পরিচালনার ভার নেন তখন এর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২,০০০ জন। ব্যাগোট পাশা ১৯৪৫ সালের মধ্যেই এর সংখ্যা বাড়িয়ে করেন ১৬,০০০ জন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাদশাহ আবদুল্লাহ অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী লোক ছিলেন। ট্রান্সজর্দানের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ও গরীব দেশের শাসক হিসেবে চিরকাল নিজেকে দেখতে তিনি মোটেই রাজি ছিলেন না। ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্দান-এর সমন্বয়ে সৃষ্ট 'বৃহত্তর সিরিয়ার' বাদশাহ হবার মত যোগ্যতা ও দাবী তাঁর আছে বলে তিনি মনে করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে বৃটেনের সাথে তাঁর একটি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কুচক্রী বৃটিশ তাঁকে 'ট্রান্সজর্দানের হাশেমীয় রাজ্যের বাদশাহ' উপাধী প্রদান করে আবদুল্লাহর সেই আকাংখাকে আরো তীব্রতর করে তোলে। এরপর তিনি তাঁর এ কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠেন এবং এর সপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। এমনিভাবে তিনি

১৯৪৩ সালে সিরিয়ার নির্বাচন অভিযান শুরু হলে প্রকাশ্যভাবে তাঁর 'বৃহত্তর সিরিয়া' গঠনের পরিকল্পনার পক্ষে প্রচারণা চালান। ১৯৪৫ সালে আরব লীগ গঠিত হলে তিনি তাতে এ আশা নিয়ে যোগ দেন এবং আরব লীগের সংবিধানে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তিনি কূটনৈতিক ও অন্যান্য উপায়ে উপরিউক্ত রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রথমত, দু'টি হাশেমীয় রাষ্ট্র (ট্রান্সজর্দান ও ইরাক) কর্তৃক স্থাপিত বৃহত্তর সিরিয়া সৌদী বংশের প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করে সৌদী সরকার এর বিরুদ্ধাচারণ করেন। দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর সিরিয়া সৃষ্টি আরব জগতে মিশরীয় নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ মনে করে মিশরীয় সরকার (ফারুক) এ প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য সচেষ্ট হন। তৃতীয়ত, বৃটিশ বিরোধী হাজী আমিন আল হুসাইনীর নেতৃত্বে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বলে মনে করতেন। প্যালেস্টাইনে আবদুল্লাহর প্রভাব বিস্তারে তাঁরা ঘোর বিরোধী ছিলেন। চতুর্থত, লেবানন ও সিরিয়া—বিশেষতঃ লেবানন শিক্ষা-দীক্ষায় এত বেশি অগ্রসর ছিলো এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিলো যে, কোনো প্রকারের রাজতন্ত্র গ্রহণ করতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না।

এক দিকে বৃটেনের নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে আরব ভাইদের এরূপ বিরোধিতা —এ দুয়ের মাঝে পড়ে উচ্চাভিলাষী আবদুল্লাহ্ ছট্‌ফট্ করতে থাকেন। তাঁর এরূপ মানুষিক অবস্থা দেখে সমসাময়িক একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"He was a falcon trapped in a cannary's Cage, longing to break out, to realize his dream and passions of being a great Arab leader ; but there he was pinned up in the cage of Transjordan by the British."

কিন্তু প্যালেস্টাইন বিভক্তির পর এর প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র জেরুজালেম দখলের জন্য ইহুদী বনাম প্যালেস্টাইনী আরবদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয় তার মাঝে পড়ে প্যালেস্টাইনের 'বৃটিশ কর্তৃক' যখন ঘূর্ণীঝড়ে নিপতিত তরুলতা ও বাঁশ ঝাড়ের ন্যায়ই হা-হুতাশ করছিলো তখনই উচ্চাভিলাষী আবদুল্লাহর কল্পনা রাজ্যের ইপ্সিত সূর্য উঁকি মারতে থাকে।

ইহুদীরা যখন বৃটেনের বলয় থেকে বেরিয়ে মার্কিন ও নাস্তিকত্বে বিশ্বাসী রাশিয়ার বলয়ে চলে যায় এবং প্যালেস্টাইন ভাগ-বাটোয়ারার অশুভ পাঁয়তারা চালায় তখন থেকেই বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য আরবদের পক্ষে দু' একটি কথা বলতে শুরু করে। বলতে গেলে এ কারণেই ঐতিহাসিক

জেরুজালেম নগরীকে ভাগ-বাটোয়ারার বাইরে রাখার জন্য বৃটেন জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং ত্রিধর্মের নিকট এর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ করে বারবার এর নিরপেক্ষ রাখার সুপারিশ করে। অথচ নাস্তিক রাশিয়া ও জায়নবাদী মার্কিন সামাজ্যবাদ তা চাচ্ছিলো না। কিন্তু বিশ্বে ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি থাকায় শেষ পর্যন্ত পবিত্র নগরীকে ভাগ-বাটোয়ারা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনিভাবে বৃটেন রাতারাতি ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করে। এরপরে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কায়রোয় আরব লীগের জরুরী বৈঠক বসলে বৃটেন বেশ জোরেশোরে প্রচার করতে থাকে যে, প্যালেস্টাইনের বৃটিশ ম্যাণ্ডেট প্রশাসক কোনো ক্রমেই জায়নবাদীদের খেয়ালখুশী মত ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে আর প্রবেশ করতে দিবে না। অন্ততঃ যতদিন তারা এখানে ম্যাণ্ডেট প্রশাসক হিসেবে থাকবে। এ সময় প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট প্রশাসকের অধীনে নিয়োজিত এক লাখ সৈন্যের সর্বাধিনায়ক স্যার গর্ডন ম্যাকমিলান-এর দেয় তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সাতচল্লিশটি জাহাজ ভর্তি মোট পঁয়ষট্টি হাজার তিন শো সাত জন বহিরাগত ইহুদীকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্যালেস্টাইনে ঢুকতে দেয়নি। এরই ফলে এবং আরব বিশ্বের আবার সুসংগঠিত হতে দেখে জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ প্যালেস্টাইন দখল করার জন্য এক ভয়াবহ পরিকল্পনা হাতে নেয়। এটা বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরে বৃটিশ নেতৃবন্দকে বিস্তারিত অবগত করায়। এতে বৃটিশ পার্লামেন্ট এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্যালেস্টাইনের প্রশাসনের ব্যাপারে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তটিই ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যালেস্টাইনের হাইকমিশনার স্যার এ্যালান কানিংহাম-এর হাতে এসে পৌছায়। খামে ভরা উক্ত পত্রটির ওপর লেখাছিলো ঃ "MOST SECRET." খামটি দ্রুত খুলে মিঃ কানিংহাম দেখতে পেলেন নির্দেশনামায় লিখা আছে ঃ "dour scot." যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সামনে এমন এক তুলকালামকাণ্ড শুরু হতে যাচ্ছে যার মাশুল হবে কল্পনাতীত। অতএব ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়া অবধি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে আত্মরক্ষা করে চলুন। প্যালেস্টাইনের আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে এখন থেকে প্যালেস্টাইনে কর্তব্যরত বৃটিশ বাহিনীর ওপর আর দায়-দায়িত্ব নেই। এখন থেকে প্যালেস্টাইনের বৃটিশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্যার গর্ডন ম্যাকমিলান তার সেনানীদের আদেশ দেন যে, সামনের আর ক'টা দিন (ম্যাণ্ডেট শেষ হবার ক'দিন) প্যালেস্টাইনে জান-প্রাণ নিয়ে টিকে থাকার জন্য তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করতে পারে।

এর পরপরই বিশেষ করে জেরুজালেমের আশপাশ গ্রামগুলোতে জায়নবাদী সন্ত্রাসবাদী দলের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যায়। এতে যারা অত্যন্ত নৃশংসতা দেখাতে লাগলো তারা হলো ঃ হাগানা ও এর এলিট গ্রুপ পালমাক বাহিনী এবং স্টার্ণের বেপরোয়া দল।

এরূপ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য বাদশাহ আবদুল্লাহ অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন এবং বিশ্ব রাজনীতিতে বৃটেনের এ কোণঠাসা হয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে তাঁর কাংখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ট্রান্সজর্দানে অবস্থানরত বৃটিশ প্রতিনিধি কার্কব্রাইড-এর নিকট তার মন্ত্রী আবুল হুদাকে পাঠান। শুধু এটুকু জানানোর জন্যই যে প্যালেস্টাইনের ইহুদী অংশ বাদ দিয়ে সমস্ত আরব অংশটুকু বাদশাহ আবদুল্লাহ তাঁর রাজ্যভুক্ত করে নিতে চান। এটা তিনি করেছিলেন সম্ভবত তাঁর আহত বৃদ্ধ বন্ধুটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে আছে তা দেখানোর জন্যই—হা-না জবাবের আশায় নয়। এর পরপরই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আবাসিক চিকিৎসক ডাক্তার মুহাম্মদ আল স্যাটীকে প্যালেস্টাইনের জাইয়ীশ এজেন্সীর মূল ঘাঁটিতে পাঠান। বহু পূর্ব থেকেই বাদশাহ আবদুল্লাহ এই স্যাটীর মারফত জেরুজালেমের জায়নবাদী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে আসছিলেন। কারণ বাদশাহ আবদুল্লাহর হয়ত একটা ধারণা ছিলো ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য একটা রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ পেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকবে ; কিন্তু তিনি সম্ভবত ইহুদীদের "The protocol of the Learned Elders of Zion"-এর মহাপরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। আর এজন্যই তিনি ডেভিড বেনগুরিয়নের নিকট স্যাটীর মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান যে, যেহেতু ট্রান্সজর্দান আরব লীগের সদস্য সেহেতু তাঁকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। তবে তাঁর এ অংশগ্রহণের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই—তাঁর বাহিনী কখনোই ইহুদী রাষ্ট্র সীমানা অতিক্রম করবে না—আরব অংশেই আবস্থান করে যুদ্ধ করার ভান করবে শুধু। অতএব ইহুদী বাহিনী যাতে আরব লিজিয়ন বাহিনীর মুখোমুখি না হয় তার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। কিন্তু কথাই বলে 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'। ইহুদীদের অবস্থাও হলো তাই। ইহুদী সন্ত্রাসবাদী বাহিনীগুলো কোনো দিনই মানেনি কো কোনো আইন-কানুন শৃংখল। আর এতো যুদ্ধকালীন সময়। অতএব তাদের অবস্থা তখন শিকারী ধরা হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায়ই ছিলো। আর এজন্যই সম্ভবত আরব লিজিয়ন বাহিনী সর্বক্ষণই তাদেরকে এড়িয়ে চলছিলো। কিন্তু

শেষ রক্ষা হলো না। কারণ হাজার হাজার অর্ধনগ্ন, বিবস্ত্র ও রক্তাক্ত নিরীহ জনতা যখন ইহুদী বাহিনীর শিকার হয়ে দিশেহারার ন্যায় রাত্রির অন্ধকারে প্রাণের মায়ায় চারদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে তখন এর কিছু অংশ ঝড়ে পড়া পাখীর ন্যায়ই মেজর আবদুল্লাহ তেলের ঘাটিতে গিয়ে ছটকে পড়ে। দৃশ্যটি ছিলো বড়ই মর্মান্তিক ও করুণ। মুসলমান ভাই-বোনের ওপর ইহুদী হায়েনাদের এ নৃশংস আচরণ সচক্ষে দেখে বীর মুজাহিদ মেজর তেল আর স্থির থাকতে পারলেন না—বাহিনী নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এমনিভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরব লিজিয়ন বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

প্রথম প্রথম হাগানা, পালমাক, স্টার্নের গ্যাং, এবং ইরগুইন বাহিনী যথাক্রমে ডেভিড শালটিল, উজরী নারসীস, যশোয়া জেটলার এবং মোরডিচাই রেনানের নেতৃত্বে এক যোগে তীব্র আঘাত হানা শুরু করে। এমতাবস্থায় মেজর তেল দারুণভাবে হেস্তনেস্ত হতে থাকে। মেজর তেল তাঁর সামরিক দূরদৃষ্টি দিয়ে তাঁর ক্রটিটি বুঝতে পেরে খুব দ্রুত সমস্ত বাহিনীকেই নতুন করে বিন্যাস করলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা নিয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর আঘাত হানা শুরু করলেন। ফলে দেখতে দেখতে যুদ্ধের গতি পাল্টে গেলো। এতে দেশীয় মুক্তিবাহিনী প্যালেস্টাইন শার্দুল আবদুল কাদের হুছাইনীকে হারিয়ে যেভাবে দমে গিয়েছিলো, মেজর তেলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরশ পেয়ে আবার তারা তেজ ফিরে পায়। ফলে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ উৎসাহ নিয়ে তারা আবার নতুন করে শত্রু বাহিনীর ওপর আঘাত হানতে থাকে। এমনি অবস্থায় পড়ে ইহুদী বাহিনীর নাভীশ্বাস ওঠে। ইতিমধ্যেই পুরাতন জেরুজালেমসহ বেশ কয়েকটি জায়গা মেজর তেল ও মুফতীর বাহিনী ইহুদীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে মুক্তি পাগল সত্য সৈনিকের দল প্রাণপণ লড়ে যেতে থাকে। ফলে ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দলগুলো ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় হাজার হাজার ইহুদী যোদ্ধা ও পরিবারবর্গ ইহুদী আবাসিক এলাকায় আটকা পড়ে যায়। তবু তারা আত্মসমর্পণ না করে বরং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিল্ডিং-এর ভেতর অসংখ্য লাশের গন্ধে পরিবেশ বিষাক্ত করে তোলে। এ অবস্থা থেকে একান্ত বাঁচার তাগিদেই অবরুদ্ধ ইহুদীরা একান্ত আপনজনের লাশকেও দরোজা-জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলতে বাধ্য হয়—তাদের পক্ষে তাদের সৎকাজ করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র ৪১ ঃ আটকে পড়া গোলা বারুদহীন ইহুদী যুবকদের চিত্র।

চিত্র ৪২ ঃ আটকেপড়া ইহুদীদের মেজর তেলের নিকট আত্মসমর্পনের চিত্র।

চিত্র ৪৩ ঃ ইসরাঈল রাষ্ট্র ঘোষণার পর প্যালেস্টাইন মুক্তি বাহিনীর মরণ আঘাত হানার চিত্র।

চিত্র ৪৪ ঃ মেজর তেল ও হিকমাত মুহাইরির কৃতিত্বের একটি প্রামাণিক চিত্র।

চিত্র ৪৫ ঃ জেরুজালেমে আটকে পড়া ইহুদীদের উদ্ধারের জন্য জেরুজালেমগামী ইসরাঈলী যুদ্ধযানের বহরের চিত্র।

চিত্র ৪৬ ঃ হাগানা সন্ত্রাসবাদীরা গোপন রুট বেয়ে চলেছে জেরুজালেম পানে।

চিত্র ৪৭ ঃ এক লক্ষ আটকে পড়া ইহুদীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রেশনে পানি বন্টনের দৃশ্য।
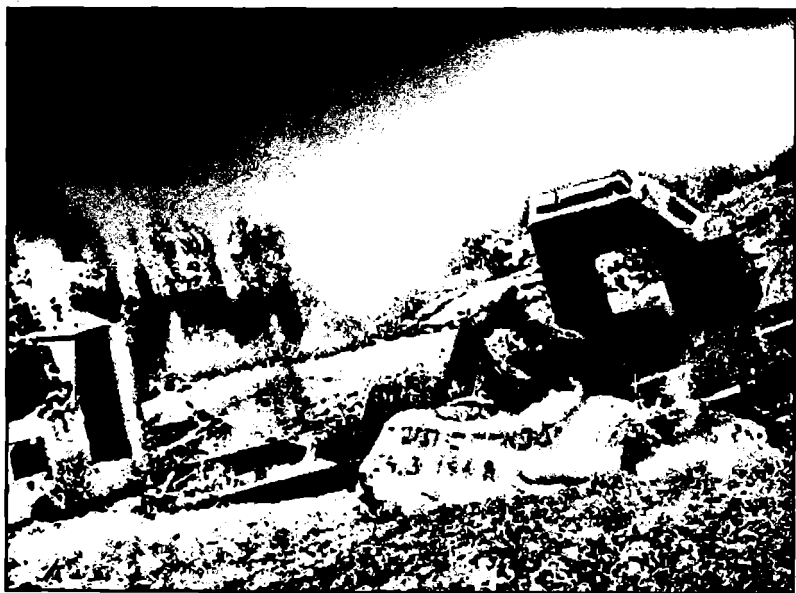
চিত্র ৪৮ ঃ প্যালেষ্টাইনী গেরিলাদের কবলে ইসরাঈলী ট্রাক।

শুধু তা-ই নয়, তাদের খাদ্য ও পানীয় জলেরও তীব্র অভাব দেখা দেয়। ফলে তাদের জীবন এমন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যে, তারা শেষ পর্যন্ত রেড ক্রসের মাধ্যমে ডেভিড বেনগুরিয়নকে অনুরোধ করে পাঠায় শীঘ্রই যুদ্ধ থামিয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য। এতে জায়নবাদী—নেতৃবৃন্দ বিচলিত হয়ে পড়েন। এদিকে ডেভিড বেনগুরিয়ন অত্যন্ত দৃঢ় মন নিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। মিসেস গোল্ড মায়ারকে পঞ্চাশ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার দিয়ে আম্মানে পাঠান। উদ্দেশ্য, মেজর তেল ও তার পরিচালিত বাহিনীকে ঐখানেই স্তব্ধ করে দেবার জন্য বাদশাহ আবদুল্লাহর প্রভাব বিস্তার ও ডলারের বিনিময়ে কিনে নেয়া। তাই ষোলকলায় পরিপূর্ণ মায়ার একটি 'বুলেট প্রুফ কার-গাড়ীতে করে ছদ্মবেশ ধারণ করে ট্রান্সজর্দানের রাজ প্রাসাদে গিয়ে পৌছান এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব সমাধান করে ডেভিড বেনগুরিয়নের কাছে ফিরে আসেন। এরপর বাদশাহ আবদুল্লাহ মেজর আবদুল্লাহ তেলকে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়ে টেলিফোন করেন। এ সময় মুক্তি বাহিনীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইহুদী বাহিনীকে ধরাশায়ী করে ফেলেছিলো। এমনি মুহূর্তে এরূপ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ পেয়ে মেজর তেল সম্পূর্ণভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তবুও তাঁর হাইকমাণ্ড বাদশাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ—না মেনে পারলেন না। এর কিছু পরেই বাদশাহ স্বয়ং জন ব্যাগোট পাশাকে সাথে করে অধিকৃত পুরাতন জেরুজালেমে গিয়ে উপস্থিত হন।

এদিকে বাদশাহ আবদুল্লাহর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় হাজার হাজার ক্ষত-বিক্ষত বীর মুজাহিদ নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই আক্রোশে ফেঁটে পড়েন এবং ডানা-ভাঙ্গা পাখীর ন্যায় ছটফট করতে থাকে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ গুলিবিদ্ধ পাখীর পরিণতিই তাঁদের হয়। অন্যদিকে প্যালেস্টাইনী জনতা সুনিশ্চিত বিজয় থেকে এভাবে বঞ্চিত হওয়াই মাতম করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এ সুযোগে জাতিসংঘও তার কৃতিত্ব জাহির করার জন্য শান্তির ঝুলী নিয়ে ছুটাছুটি শুরু করে এবং এ যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী বিরতি বলে গ্রহণের জন্য উভয় পক্ষকে রাজি করাতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। ক্ষীপ্ত বীর মুজাহিদরা কোনো ক্রমেই এ যুদ্ধ বিরতি চুক্তিকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তারা স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই যুদ্ধবিরতি ভাঙ্গবার জন্য ফাঁকা গুলী বর্ষণ করতে থাকে।

৫.৬ জাতিসংঘের ঘাড়ে ইহুদী ভূত

সম্মিলিত জাতিসংঘ অনেক আগ থেকেই একান্ত নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নেই বার বার যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সম্মিলিত জাতিসংঘ এ জটিলতম

সমস্যাটা সমাধানের জন্য সরল প্রাণ কাউন্ট ফক বারনাডোটকে নিয়োগ করেন। ন্যায়নিষ্ঠ এ মহান ব্যক্তিটি ছিলেন সুইডেনের ভূতপূর্ব রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা। সমস্যার সাথে সম্যক পরিচিত হবার পর তিনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে প্যালেস্টাইনী বাস্তুত্যাগীদের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনের অধিকার এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তার জন্য ক্ষতি পূরণ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, দক্ষিণের নেজেভ মরু অঞ্চল আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এর পরিবর্তে গ্যালিলী ও জাফ্‌ফা এবং এর সংলগ্ন এলাকা ইহুদী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়। লিড্ডা ও রামাল্লা শহর আরবদের নিকট প্রত্যার্পণের কথা বলা হয় এবং মহান নগরী জেরুজালেমের ওপর জাতিসংঘের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশ করা হয়। এ ধরনের মতামত জায়নবাদীদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে এবং স্টার্নের বেপরোয়া দলের সন্ত্রাসবাদীগণ প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর পরেও সম্মিলিত জাতিসংঘ ইহুদীদের শাসন করতে তো পারেইনি বরং তাদের স্বার্থেই অদ্যাবধি কাজ করে যাচ্ছে। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে গোটা প্রতিষ্ঠানটিই জায়নবাদী ইহুদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত ? জাতিসংঘের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ বিশ্বজনীন সংস্থাটিও ইহুদীদের হাতের পুতুল মাত্র। বিশ্বশান্তির নামে স্থাপিত (১৯৪৫ সালে) এ বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানটি এ যাবৎ ইহুদী স্বার্থেরই হেফাজত করে আসছে। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ইহুদী আইনজীবি হেনরী ক্লায়েন (Henry Klaien) তদীয় পুস্তক "Zions rule the world", Newyork, 1948 -এর এক স্থানে লিখেছেন ঃ

"The United Nations is Zionrsism. It is the super government mentioned many tines in the protocols of the Learned Elders of Zion promulgated between 1897—1905."

অর্থাৎ জাতিসংঘও ইহুদীবাদেরই নামান্তর মাত্র। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে জারীকৃত বিজ্ঞ ইহুদীবাদী মরুবাদীদের প্রোটোকোল পুস্তকে পুনঃপুনঃ যে সুপার গভর্নমেন্টের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এটা তা-ই।

বিশেষ করে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের উড়ে এসে জুড়ে বসার সুযোগ দান, ১৯৪৭ সালে অন্যায়ভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক প্যালেস্টাইন বিভক্তি প্রস্তাব গ্রহণ এবং ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত এ প্যালেস্টাইনী ও আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত মুসলিম ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের প্রতি

জাতিসংঘের উদাসীনতা ইত্যাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতিসংঘ ইহুদীদেরই পক্ষে কাজ করছে।

পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'এশিয়া' পত্রিকার ১৬-৭-৬৭ তারিখের সংখ্যায় জাতিসংঘে ইহুদীদের প্রভাব সম্পর্কে যে খবর বের হয়েছিল তা থেকে জানা যায় যে, জাতিসংঘের তেয়াত্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে ইহুদী অফিসার সমাসীন রয়েছেন। জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েটে বাইশটি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ইহুদী। নিম্ন বর্ণিত জাতিসংঘ শাখা কমিটিগুলোতেও সর্বোচ্চ পদগুলো ইহুদীদের দখলে রয়েছে ঃ

১. 'ইউনেস্কো' (UNESCO)-তে নয়টি ;
২. আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা আই. এল. ও. তে তিনটি ;
৩. আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 'ফাও'-তে তিনটি ;
৪. বিশ্ব ব্যাংক-এ ছয়টি ; এবং
৫. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্পোরেশন 'ইফক'-তে নয়টি।

এছাড়াও জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েটে নিম্নতর দায়িত্বে অসংখ্য ইহুদী রয়েছেন এবং তারা একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছেন বলে ঐ একই খবরে প্রকাশ। সুতরাং জাতিসংঘও যে ইহুদীদেরই ইংগিতে উঠা-বসা করবে তাতে আর সন্দেহের কি আছে? চক্রান্তবিশারদ ইহুদী সম্প্রদায় একটি ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী সঠিক পরিকল্পনা মাফিক বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এবং প্রটোকোলে বর্ণিত বিশ্বব্যাপী ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছেন। আর তাদের এ প্রভাবের জন্যই কাউন্ট ফক বারনাডোটের মত নিরপেক্ষ সরল প্রাণ পবিত্র মনের অধিকারী একটি লোককে এভাবে নির্মমভাবে হত্যার পরও জাতিসংঘ এর উপযুক্ত বিচার করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ এতই প্রবল ও নিরঙ্কুশ যে, এ ধরনের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডকেও যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেনি।

প্যালেস্টাইন তথা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরো এগোলো। পরাশক্তিগুলো প্যালেস্টাইনীদের বুকের ওপর 'ইসরাঈল' নামে এ বিষবৃক্ষকে রোপণ ও স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না—এর ভেতরটি আরো মজবুত করে দিবার জন্য একে জাতিসংঘের সদস্য করে নিবার জোর তৎপরতা চালায়। এবং তা তারা করেও ছাড়ে।

বহিরাগত সংখ্যালঘু ইহুদী কর্তৃক অবৈধ ও অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে ৮০% প্যালেস্টাইনী ভূমি জবরদখল ও প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগুরু প্যালেস্টাইনীদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করণ, ভৌগিলিক সংহতি লংঘন, বিশ্বের বৃহৎ তিনটি ধর্মের পবিত্র স্থান মহান জেরুজালেমের অমর্যাদা করণ এবং আন্তর্জাতিক আইন ও 'জাতিসংঘ সনদ' লংঘন করার মতো সীমাহীন অপরাধ করা সত্ত্বেও পরাশক্তিগুলো ১৯৪৯ সালের ১১ মে তারিখে তাদের ঔদ্ধত্য প্রভাব প্রয়োগ করে তথাকথিত ইসরাঈল রাষ্ট্রকে জ াতিসংঘের সদস্য করে নেয়। মূলত প্যালেস্টাইনীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ পরিণতির সূত্রপাত এখান থেকেই।

৫.৭ মহান জেরুজালেম ও ইহুদীদের গোপন পরিকল্পনা

জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ইসরাঈলদের অতীত ইতিহাস জানতো ; তাই তাঁরা নবগঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছ থেকে ঐ সময় (সদস্য পদ দানের সময়) একটি অঙ্গিকার পত্রে সই করিয়ে নেয়। এতে লিখাছিল ঃ "ত্রিধর্মের অনুসারীদের অতিব পবিত্র স্থান জেরুজালেম নগরীকে আন্তর্জাতিককরণ করাকে আমরা মেনে নেবো এবং উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনীদের তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে দিবো।" কিন্তু ইসরাঈল তার চিরাচরিত স্বভাব মাফিক জাতিসংঘের নিকট তথা বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ ও তার জনগণের কাছে দেয় সেই অঙ্গিকারের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরপরেই সে পশ্চিম জেরুজালেমকে ইহুদী করণের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়। এজন্য তারা সন্ত্রাস, খুন, উচ্ছেদ, সম্পদ ও জমি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি ধরনের সকল পন্থাই প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে অবলম্বন করে। এর প্রধান কারণ হলো প্যালেস্টাইন থেকে প্যালেস্টাইনীদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করে সেখানে তাদের নিজেদের নিরঙ্কুশ করে তোলা। তাই ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইহুদীরা রাজ্যের সীমা নিয়ে তুষ্ট হতে পারেনি। তার কারণ তাদের পথনির্দেশক "The Protocol of the Learned Elders of Zion"-এ জেরুজালেমকে রাজধানী করে যে বৃহত্তম ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার নীলনকশা অঙ্কিত রয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে হলে জাতি-সংঘের ঐ মাতবরী মেনে নিলে চলবে কি করে ? এজন্য ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টি লগ্নেই ইসরাঈলী পার্লামেন্ট 'নেসেট' তার 'মটো' হিসেবে নিম্নোক্ত বাক্যটি গ্রহণ করে ঃ

"Your boundaries, O ye Israel, extend from the Euphrates to the Nil."

১৯৪৯ সালে ইসরাঈলের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর উক্তি থেকে নয়া সামাজ্যবাদী শক্তি ইসরাঈলের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। তিনি বলেছিলেন ঃ

"Although we realized our dream of establishing a Jewish state, we are still at the begining."

তাই ইসরাঈল তার প্রতিষ্ঠালাভের বহু পূর্ব থেকেই তাদের সামরিক শক্তি অর্জনের দিকে বিশেষ জোর দেয়। ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতেও তাদের মোটেই বেগ পেতে হয়নি। এ সমস্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য জঙ্গী ইসরাঈলীরা তাদের কিশোর-যুবকদের এমন করে প্রস্তুত করে তোলে যে তারা যে কোনো বৃহত্তম সামরিক শক্তির সাথে সহজে বুঝে উঠতে পারে। এদেরই সুনিপুণ অস্ত্র চালনায় ইসরাঈলীরা ১৯৪৮ সালের গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার প্যালেস্টাইনীকে নির্মমভাবে হত্যা করে মহা উল্লাসে হুড় হুড় করে পবিত্র নগরী জেরুজালেমে ঢুকে পড়ে। উল্লাসিত সমরনায়ক মোশে দায়ান সেদিন ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"We have occupied Jerusalem we are on our way to Yethreb and Babel."–'আমরা জেরুজালেম অধিকার করেছি এবং আমরা ইয়াসরিব (মদীনা শরীফ) ও ব্যাবিলন দখলের লক্ষে এগিয়ে চলেছি।'

উল্লেখ্য, অতীতে ব্যাবিলনের শাসকগণ ইহুদীদেরকে জেরুজালেম থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যাবিলনে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করেছিলো। আবার দুষ্কৃতি ও বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করার দরুন মদীনার নবীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একান্ত নিরপত্তার জন্যই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর শাসনামলে মদীনা থেকে তারা বহিষ্কৃত হয় এবং মদীনা থেকে দূরে খায়বারে তাদের বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও মদীনার ইহুদী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি।

মদীনার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নবী মুহাম্মদ স. ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি যে সদয় ও সহানুভূতিশীল মধুর ব্যবহার করেন তা বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে এটা সর্ববাদীসম্মত। মারাত্মক প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি যে উদারতা ও মহানুভবতা দেখান তার নজীর সত্যই বিরল।

মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো বনু নাজীর, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা। একথা সত্য যে, প্রতিশ্রুত পয়গম্বর—যাঁর আগমন সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বহু পূর্বেই সুখবর দেয়া হয়েছিলো, তাঁর আগমনে মদীনার ইহুদীরা সাদর সম্ভাষন জানায় এ আশায় যে, এ নবাগত প্রতিশ্রুত নবী (Promised Prophet) তাদের স্বার্থে, একমাত্র তাদেরই নির্দেশ মতো কাজ করবে; কিন্তু বাস্তবে যখন দেখলো তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মজলুমের সপক্ষে দাঁড়িয়ে বিশ্ব নিয়ন্তার নির্দেশ মতোই চলছেন, তখন তাদের মাথায় বজ্রপাত ঘটলো। কারণ যুগ যুগ ধরে খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক যেভাবে নির্যাতিত ও নিধন হয়েছিলো তারা তার প্রতিশোধ নেবার আশায় এ প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের পথ পানে চেয়েছিলো। তাঁদের আশা ও পরিকল্পনা ছিল এ নবাগত সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে নেতা করে বিশ্ব-সরটুকু আহরণ করবে এবং ইহুদী নিপীড়ক গইমদের মুণ্ডুপাত করবে। যদিও মুহাম্মদ স.-ও একজন গইম ছিলেন তবুও যেহেতু তিনি আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবী, সেহেতু মুহাম্মদ স. তাদেরই একজন। কেননা স্রষ্টা একমাত্র তাদেরই জন্য নবী প্রেরণ করে থাকেন। এটা তাদের মনের কথা। কিন্তু এ মহামানব যখন ইহুদীদের নির্দেশ মতো চললো না, তাদের নির্দেশ মতো কাজ করলো না, বরং সকলের হয়ে কথা বলতে লাগলেন, সত্যের পথ ধরে চলা শুরু করলেন, তখনই বিপদ ঘটলো—তাদের সকল আশা দুরাশার অমানিসার ঘন কালো অন্ধকারে ডুবে গেলো। তাই তারা ভাবলো—যেহেতু মুহাম্মদ স. তাদের স্বার্থে কাজ করছেন না, তাদের কথা অনুযায়ী চলছেন না, বরং তাদের বল্গাহারা কামনা-বাসনার মুখে লাগাম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন, তখন এটা তাদের নিকট সম্পূর্ণ অসহ্যবোধ হতে লাগলো ; এমন কি তিনি তাদের রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নিলেন। তাই এখন থেকে তাদের একমাত্র লক্ষ হলো মুহাম্মদ রূপ এ কাটাটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়াই উত্তম এবং এ নীতিতে অটল থেকে তারা যৌথভাবে কাজে লেগে গেলো।

নবী মুহাম্মদ স. মদীনায় গিয়ে (৬২২ খৃঃ) মদীনাবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ীই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সনদ প্রদান করেন (৬২৪ খৃঃ)। ইসলামের ইতিহাসে এটা "মদীনার সনদ" (Charter of Medina) নামে পরিচিত। সাতচল্লিশটি শর্ত সম্বলিত এ সনদকে সমালোচকরা মহা সনদ বা Magna Carta বলেও অভিহিত করেছেন। তাঁরা আরো বলে থাকেন ৬২৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত মদীনার সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান (first written constitution of the world)। এ সনদে ইহুদীদের ধর্মীয়

স্বাধীনতা দেয়া হয়। মদীনা বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যান্যের ন্যায় ইহুদীরাও মুসলমানদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিবে বলে অঙ্গিকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধে তারা মুসলমানদের গুপ্ত সংবাদ পৌত্তলিক কুরাইশদের নিকট পাচার করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে। এর ব্যাপকতা এত ছিলো যে বলতে গেলে মদীনার সারা শহর তাদের বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতায় ভরে গিয়েছিলো। মদীনার সনদের শর্ত ভঙ্গ করে বনু কাইনুকা এবং বনু নাজীর গোত্র মুসলমানদের শত্রুপক্ষের চর রূপে কাজ করে যেতে থাকে। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদেরকে ইহুদী, মুনাফিক ও পৌত্তলিক কুরাইশ– এ ত্রিশক্তির মোকাবেলা করতে হয়। বৃটিশ ভারতের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ আমির আলি অভিমত প্রকাশ করেন ঃ "পয়গম্বরের কোনো দয়া অথবা বদান্যতায় ইহুদীদের সন্তুষ্ট করতে পারতো না ; তাদের বৈরী মনোভাবকে তারা কোনো মতেই প্রশমিত করতে পারতো না।" নিগূঢ় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে নবী করীম স.-এর সময়ে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো তা তাদের জিঘাংসামূলক ব্যবহার, ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য ছিলো। ইহুদীদের জঘন্য রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে ; যেমন ঃ (১) মদীনা সনদের পরিপন্থী ইহুদী গোত্র মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মুসলমানদের গোপন খবরাখবর কুরাইশদের নিকট পৌঁছে দেয়া। (২) কা'ব বিন আশরাফ বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের বিপর্যয়ে মক্কায় গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের প্ররোচিত করা, (৩) মুসলিম তরুণীর শালীনতাহানীর চেষ্টা করা ; (৪) আবু রা'ফী সাল্লামের আরব বেদুঈন গোত্র সুলাইম ও গাতফানকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা ; (৫) আমর বিন জাহাসের ঘরের চালের ওপর চড়ে নবী করীম স.-কে বৃহৎ পাথর গড়িয়ে দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা ; (৬) বী'রে মায়মুনায় আরব বেদুঈন গোত্র কর্তৃক মুসলিম ধর্মপ্রচারকের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলো বনু সুলাইম এবং এতে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ছিলো বলে মনে করা হয় ; (৭) বী'রে মায়মুনা হতে আত্মরক্ষা করে একজন মুসলমান ভুলক্রমে বনু আমির গোত্রের দুজনকে হত্যা করলে নবী করীম স. ইহুদী ও মুসলমানদের উভয়কে সনদের শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করেন ; কিন্তু বনু নাজীর গোত্রের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকার এবং হযরত স্বয়ং ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা ; (৮) খায়বার হতে বহিষ্কার হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে ইহুদীগণ কর্তৃক মুসলমানদের বাড়ী-ঘর

লুণ্ঠন ও আগুন দিয়ে ধ্বংস করা। তাছাড়া (৯) ইহুদীদের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত খায়বারের যুদ্ধ ; এবং (১০) খায়বারের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তারা হযরত স.-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার হীন চক্রান্ত করে। তাই ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন ঃ "এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, নগর অবরোধের সময় ঐ সমস্ত লোক (ইহুদীগণ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী ছিলো।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, চক্রান্তশীল ইহুদী জাতের অপরাধের তুলনায় তাদের সাথে অত্যন্ত মানবোচিত ও সদয় ব্যবহারই করা হয়েছিলো। যতটুকু করা হয়েছিলো তা নবীন রাষ্ট্র 'মদীনার প্রজাতন্ত্রের' সংহতি, নিরাপত্তা ও সামগ্রিক শান্তি রক্ষার জন্যেই— বৈরিতা বশতঃ নয়।

৫.৮ আল ফাতাহ ও পি. এল. ও সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহ প্যালেস্টাইনীদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ভোগ করে আসছিল। কিন্তু পরবর্তী ১৬ বছরে প্যালেস্টাইনীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা বরং শত্রু কবলিত উদ্বাস্তু শিবিরে অথবা রাষ্ট্রহীনভাবে আরব ভাইদের শাসিত রাষ্ট্রেই রয়ে যায়। প্যালেস্টাইনী হিসেবে পরিচয় দানের স্বাধীনতা তাঁদের আর থাকলো না। সুতরাং জ্ঞান-দীপ্ত কিছু প্যালেস্টাইনী যুবককে ব্যাপারটি ভাবিয়ে তোলে। তাঁরা মনে মনে ভাবলো যে, তাঁদের হারানো স্বাধীকার তাদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে—এর জন্যে কারোর মুখাপেক্ষী হয়ে নিথর বসে থাকলে চলবে না। এ ভাবনায় তাড়িত হয়ে ঐ সমস্ত নব্য রাজনীতি সচেতন প্যালেস্টাইনীরা 'আরব ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট' এবং 'বাথ' পার্টির মতো চরমপন্থী আরব জাতীয় আন্দোলনে ঢুকে পড়ে।

১৯৫৬ খৃস্টাব্দে মিসরের বিরুদ্ধে ত্রিপক্ষীয় (ইসরাঈল-বৃটিশ-ফ্রান্স) হামলার পর এক দল প্যালেস্টাইনী গাজা এলাকায় রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনিত হয়। এটাই স্বাধীন প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম দেয়। কায়রোর প্যালেস্টাইন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব ইয়াসির আরাফাত এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী 'আল-ফাতাহ' নামে একটি সংগ্রামী সংস্থা গঠন করেন, যা প্যালেস্টাইনীদের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রবর্গের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে প্যালেস্টাইনীদের স্বাধীনতার জন্যে স্বাধীনভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

কিন্তু এখানেও ষড়যন্ত্র আবার তাঁদের পিছু নেয়। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যে আন্দোলনের গতিধারাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এরূপ বিচ্ছিন্ন ধারার একটি হলো পি. এল. ও.। এটা আরব রাষ্ট্রবর্গের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলো। কারণ ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে জেরুজালেম তথা প্যালেস্টাইনকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও প্যালেস্টাইনের কিছু কিছু অংশ আরব রাষ্ট্রবর্গ তা নিজের রাষ্ট্রভুক্ত করে নেয়। ফলে প্যালেস্টাইনীদের সুসংগঠিত হতে দেখে কতিপয় স্বার্থলোলুপ আরব রাষ্ট্র ভীত হয়ে পড়ে। তাই তারা মৃত পথযাত্রীদের ন্যায়ই 'কুরামিন' হিসেবে প্যালেস্টাইনীদেরই নিয়ে এরূপ একটা কাউন্টার সংগঠন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলে। এটা ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ২৮ মে-র ঘটনা। মহান নগরী জেরুজালেম বর্তমান প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার স্বীকৃত মুখপাত্র। এ সংস্থাকে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর আলেকজান্দ্রিয়াতে (মিশর) অনুষ্ঠিত আরব লীগের দ্বিতীয় সম্মেলনে আরব রাষ্ট্রবর্গ স্বীকৃতি দেয়।

এভাবে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে আরব রাষ্ট্রবর্গ প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থা পি. এল. ও গঠন ও স্বীকৃতি দিলে আল ফাতাহ্ প্যালেস্টাইনীদের ওপর আরব রাষ্ট্রবর্গের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার পুনঃ প্রচেষ্টা হিসেবে এটাকে দেখতে থাকে। জনাব ইয়াসির আরাফাত এবং তাঁর সহকর্মীরা জর্দান নদীর প্রধান স্রোত পরিবর্তনের ইসরাঈলী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আরব রাষ্ট্রবর্গের অক্ষমতা এবং অনিচ্ছা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অন্য দিকে তাঁরা পি. এল. ও. কে কার্যক্ষমতাহীন 'কাগুজে কমিটি' হিসেবে বাতিল করেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি আরব রাষ্ট্রবর্গের চাপ এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমেই আল-ফাতাহ সুসংগঠিত হতে থাকে এবং আলজিরিয় বিপ্লবী সরকার ও সিরিয় বাথ বা বা'য়াস দলীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেন। এ সাহায্য নিয়েই তাঁরা প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন। এটা ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারির ঘটনা। এ একই সময় তারা আল ফাতাহর সামরিক বিভাগ আল আসিফা তাদের প্রথম ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের পর প্রথমবারের মতো প্যালেস্টাইনীরা এভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সুসংগঠিত হয়। প্যালেস্টাইনীদের নেতৃত্বাধীন সংস্থা জেরুজালেম তথা গোটা প্যালেস্টাইনীর জন্য লড়তে এবং মরতে অঙ্গিকার করে এবং আরব রাষ্ট্রবর্গের মনোভাবের প্রতি অমনোযোগী হয়। তখন থেকেই কতিপয় আরব রাষ্ট্র পি. এল, ও-র প্রতি নাখোশ হয় এবং তাঁদের স্ববংশে ধ্বংস করার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীকে অসহায় প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর ওপর রাতের আঁধারে লেলিয়ে দিয়ে এক লোমহর্ষক

হত্যাযজ্ঞ চালায়। এরই রক্তাক্ত ফসল—"ব্লাক সেপ্টেম্বর"। এ ব্লাক সেপ্টেম্বর হত্যাযজ্ঞের পর থেকেই প্যালেস্টাইনী মুক্তি আন্দোলনের প্রধানতম ঘাটি জর্দান থেকে লেবাননে স্থানান্তরিত হয়। (১৯৭০, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)।

৫.৯ পি. এল. ও. এবং ইয়াসির আরাফাত

পি. এল. ও. স্বাধীনতা অর্জনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু সংগঠনটি যেন তেমন আশাব্যঞ্জক ফলোদয় করতে পারছিল না। তেমন সক্রিয় ফলাফল লাভে সক্ষম হচ্ছিলো না। হয়তো বা এজন্যই ১৯৬৮ (মতান্তরে ১৯৬৯ খৃঃ) খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে 'প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল' 'আল ফাতাহ' এবং সিরিয়ার বা'য়াস বা বাথ পার্টির সমর্থক 'আস্ সাইকার' প্রথম বৈঠকে পি. এল. ও.-র আহ্মত সুকাইরীকে নেতৃত্বচ্যুত করেন। এরপরে এলেন বিশ্বের অন্যতম সংগ্রামী বীর সৈনিক জনাব ইয়াসির আরাফাত।

ইয়াসির আরাফাত একটি নাম—একটি আপোষহীন সংগ্রাম, ইয়াসির আরাফাত একটি পবিত্র দাহিকা শক্তি—দহন শক্তির প্রতীক এবং বিশ্বের মুক্তিকামী মজলুম জনতার ঐক্যের প্রতীক ; ইয়াসির আরাফাত শান্তির অতন্দ্র প্রহরী ও বিশ্ব-শান্তিকামী মানুষের অগ্রদূত। তাই 'আরাফাত' শব্দটিকে চক্রান্তশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এতো ভয় পায়।

চিত্রঃ ৪৯ ইয়াসির আরাফাত

প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এ মহান জননেতার প্রথম আবির্ভাব ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। তার পরের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের উজ্জ্বল সংগ্রামী অনুচ্ছেদগুলো প্যালেস্টাইনী জনগণের কাছে ভবিষ্যতের আশাব্যঞ্জক দ্বার উদ্ঘাটন করে চলেছে। আরাফাত পি. এল. ও-র চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েই সংগ্রামকে সুসংগঠিত করেন। ফলে প্রতিরোধ সংগ্রাম আগের থেকে অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব আরাফাত অত্যন্ত নম্র ও সরল। আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি যেমন লৌহ কঠিন, ব্যক্তিগত আচরণে তেমনি শিশুর ন্যায় কোমল। সেই চিরপরিচিত পবিত্র ছবি ; হাসিমাখা সংগ্রামদৃপ্ত মুখ। মাথায়

সাদা-কালো চেকের মস্তকাবরণী, পরণে—ঢোলা প্যান্ট ও জ্যাকেট ; পায়ে মোটা সোলযুক্ত জুতো, এ নিয়েই আরাফাত।

কখনো মরুভূমির উষর প্রান্তরে, কখনো বা পাহাড়ের নির্জন গুহায় ; কখনো বাবলা দেবদারু বনের মধ্যে বসে গেরিলাদের পরিচালনা করছেন প্যালেস্টাইন জনতার মহান নেতা এ ইয়াসির আরাফাত। সুখের মুখ হয়তো কখনো তিনি দেখেননি। সবসময় তাঁকে কাটাতে হয় রক্তলোলুপ অত্যাচারী ইহুদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে।

তাঁর সংগ্রাম শুধু দস্যু ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধেই নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেও। সেই সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, তাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়েই (জাতিসংঘে ভাষণ দানকালে) নির্ভিক আরাফাত তাঁদের গালাগালি করলেন ; প্যালেস্টাইনীদের প্রতি চরম অবিচার করা হচ্ছে, একথা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর এ বলার ভেতর কোনো বিষ ছিল না। তিনি যে বিশ্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭৪ খৃস্টাব্দের ২ নভেম্বরে তাঁর সেই জাতিসংঘে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে। নব্বই মিনিট কাল তাঁর স্থায়ী ভাষণের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিলো সেদিন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান, বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর উপলব্ধি, নিপীড়িত জনগণের দুর্দশা, নিপীড়ক শাসকের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ছলা-কলা-কৌশল। তিনি সারগর্ভ তথ্য নির্ভর যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে করে বুঝিয়েছিলেন সেদিন। তাঁর এ দূরদর্শী প্রজ্ঞার মাধ্যমেই তিনি সর্বপ্রথম একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে বিশ্বের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন।

ইয়াসির আরাফাত পি. এল. ও. মুক্তিকামী সংগ্রামকে আরো সম্প্রসারিত করলেন। হাজার হাজার মুক্তিকামী প্যালেস্টাইনী তাঁর পতাকাতলে এসে জমায়েত হলেন। দুর্দমনীয় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান ইসরাঈলী নৃশংসতার প্রতিকারে কমাণ্ডো আক্রমণ পরিচালনা করলেন। শুধু পুরুষই নয়, এ জীবন-মরণ হোলিখেলায় মেতে উঠলেন নারীরাও। বিশ্বে অগ্নি কন্যা বলে সুপরিচিত বিপ্লবী লায়লা খালেদের বিশ্ব কাঁপানো হাইজ্যাক যুদ্ধের কথা কে না জানে ?

প্রতিরোধ আন্দোলন যখন এ বীর মুজাহিদের সংস্পর্শে এসে মুহূর্তের ব্যবধানে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো, তখন সাম্রাজ্যবাদী ইসরাঈল ও তাঁর মরুব্বীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তাই প্যালেস্টাইনীদের এ মুক্তি সংগ্রামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবার জন্যে আবার নতুন করে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়।

ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইন গেরিলাদের আক্রমণ জোরদার হয়ে ওঠে। মুক্তি আন্দোলন যখন এভাবে এগিয়ে চললো এবং ইসরাঈলীদের উত্যক্ত করা শুরু করলো, তখন তাঁরা বেপরোয়া হয়ে উঠলো এবং পার্শ্ববর্তী আরব গ্রামগুলোর ওপর প্রতিশোধাত্মক হামলা শুরু করলো। এরই চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তর আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে।

৫.১০ আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ

১৯৫৬ সালে মিশরের জামাল আবদুন নাসের সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করলে ২৯ অক্টোবর ইসরাঈল পরাশক্তিগুলোর নির্দেশক্রমে মিশরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সিনাই উপদ্বীপ ছিনিয়ে নেয়। এতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে বৃটেন ও ফ্রান্স (১৯৫৬ সালের ৩১ অক্টোবর)। উপযাজক হয়ে বৃটেনের ও ফ্রান্সের এ নাকগলানী রাশিয়া মোটেই সইতে পারলো না। তাই সে হুশিয়ারী উচ্চারণ করার সাথে সাথে তারা ইসরাঈলের পাশ থেকে সরে যায়। ফলে ইসরাঈল সন্ধি মেনে নেয়।

যদিও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও মাঝে মধ্যে জর্দান ও সিরিয়ার সীমান্তে ইসরাঈল বাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোলাগুলী ছুড়তে থাকে। ফলে সীমান্তে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। বহু দিন ধরে এমনি উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। ১৯৬০ সালে ইসরাঈল আরো একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে। নেজেভ মরুভূমিতে চাষাবাদ করার জন্য জর্দান নদীর গতি পরিবর্তনের কথা বললে জর্দানের পক্ষ থেকে তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়। ১৯৬৬ সালে বিনা উস্কানিতে ইসরাঈল সিরিয়া ও জর্দানের সীমান্ত এলাকায় উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে বোমা বর্ষণ করে। এমনি অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে ১৯৬৭ সালের মে মাসে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে মিশরের জামাল আবদুন নাসের তিরাণ প্রণালী বন্ধ করে দেন। এর সাথে সাথে বৃটেন, ও আমেরিকা ইসরাঈলের পক্ষ নেয়। এতে ইসরাঈল আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৭ সালের ৫ জুন বিনা উস্কানীতে আরব দেশগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাত্র ৬ দিন এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এ যুদ্ধে আরব দেশগুলোর সিনাই, গাজা, জেরুজালেম, গোলান মালভূমিসহ বিরাট এলাকা ইসরাঈল অধিকার করে নেয়।

৫.১১ জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ ও ইসরাঈলী হঠকারিতা

১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ২৪২ নং প্রস্তাব পাশ করে। এতে বলা হয়, ইসরাঈল দখলীকৃত আরব এলাকা থেকে

সৈন্য প্রত্যাহার করবে, ৫ জুনের সীমান্তে সকল পক্ষের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। একে অপরের অধিকারকে স্বীকৃতি দিবে, প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এবং চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবরকম শত্রুতা পরিহার করতে হবে। জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট উপরোক্ত শর্তগুলো বাস্তবায়নে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু ইসরাঈল তাঁর স্বভাবে অটল থাকে—সে সরাসরি জাতিসংঘের এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর প্রধান রাব্বি শলোমো গোরেন জেরুজালেমের আরব অংশে এসে দম্ভভরে ঘোষণা করেন ঃ "আমরা পবিত্র নগরী দখল করেছি, আমরা এ নগরী কখনই ফিরিয়ে দেব না। এ পবিত্র স্থান আমাদের এবং আমাদের ঈশ্বরের। এখান থেকে আমরা এক কদমও সরে যাবো না। কখনই না।"

ইসরাঈল ও প্যালেষ্টাইনের পরিকল্পনা, অতীত ও বর্তমান।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শেষ হবার দু' সপ্তাহ পরে ইসরাঈল পার্লামেন্ট 'বৃহত্তর ইসরাঈলের' যে কোনো অংশে প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য ইসরাঈলের প্রশাসনিক কর্মচারীকে নির্দেশ দেয়। এর সাথে সাথেই পূর্ব জেরুজালেম এবং তার সংলগ্ন কিছু অংশকে ইসরাঈল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসরাঈল সরকার এবং সামরিক কমাণ্ড কয়েকটি আইন ও ডিক্রী জারী করে নগরীর আরব অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত জেরুজালেম মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল বাতিল করে দেয়। মেয়রকে বরখাস্ত করে জেরুজালেম থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয় এবং প্রশাসন সংস্থায় ইসরাঈলী আইন প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র নগরীর ওপর তাদের কর্তৃত্ব

অত্যন্ত শক্তিশালী করে নেয়। ডেভিড বেনগুরিয়ন এরপরে বিভিন্ন সময়ে বলেছেন ঃ

"There is no meaning for Israel without Jerusalem and no meaning for Jerusalem without Temple"

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর জাতিসংঘ গৃহীত প্রস্তাবে ইসরাঈলকে অধিকৃত এলাকা ছেড়ে যেতে বলা হয় ; কিন্তু ইসরাঈল সে প্রস্তাব ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যাখান করে। রক্তস্নাত প্যালেস্টাইনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে এভাবে যখনই কোনো শান্তি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তখনই ইসরাঈল তার নিজস্ব ফর্মূলা হাজির করেছে। তার শান্তি ফর্মূলার সারকথা হলো ঃ

'ইসরাঈলকে অস্ত্র দাও। কেননা শক্তিশালী ইসরাঈলই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি।'

৫.১২ মসজিদুল আকসায় অগ্নি সংযোগ ও বিশ্বব্যাপী এর প্রতিক্রিয়া

মহান জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট অতিব পবিত্র একটি প্রতিষ্ঠান। ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ স.-এর মে'রাজের আলোচনায় এর উল্লেখ আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ মসজিদই ছিলো মুসলমানদের 'কেবলা'। এর দিকে মুখ করে মুসলমানরা নামায আদায় করতো। তাই মর্যাদার ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে এ মসজিদুল আকসা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ইসলামী গবেষকদের সর্বসম্মতিক্রমে এ মসজিদেই মহানবী স. ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৭ রজব মাসের বুধবারের দিনগত রাতে মে'রাজে যাবার প্রাক্কালে নবীগণের নামাযের ইমামতি করেছিলেন। এরপর তিনি হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আ.-এর সাথে 'বোরাক' যোগে সপ্ত-আকাশ পরিক্রমা শেষে আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাত করেন। অতীতের বহু নবী-রাসূলদের (প্রায় ৩০০) মাযারে ভরপুর এ মসজিদ ও এর সংলগ্ন স্থানসমূহ। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রাণের সাথে সংযুক্ত এ মসজিদ। আর এজন্যই এর প্রতি ইহুদীদের রয়েছে দারুণ আক্রোশ। এর বাস্তব প্রমাণ বিশ্ববাসী পায় ১৯৬৯ সালের ২১ আগষ্ট। বিশ্ব মুসলিমের প্রাণ প্রিয় এ মসজিদুল আকসাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কুচক্রী ইহুদীরা তা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালায় এ দিন। গাজী সালাহউদ্দীন কর্তৃক স্থাপিত মিম্বরটিও তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ভষ্মিভূত করে। এটা লক্ষণীয় বিষয়, যখন কোনো ইহুদীর গায়ে কোনো কারণ বশতঃ একটু আঁচড়

লাগে তখন পরাশক্তিগুলো তা ফলাও করে তিলকে তাল বানিয়ে পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ করেন, অথচ যখন হাজার হাজার মুসলমান নর-নারী ও শিশু-বৃদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা এবং তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মমভাবে ইহুদী রক্ত পিপাসুরা ধ্বংস সাধন করে, তখন তারা 'না কিছু হয়নি' এমনি ভাবখানা দেখাতে থাকে। কুচক্রীদের এরূপ মানবতা বিরোধী জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও এতে তাদের মনে একটুও অনুশোচনা বা দুঃখের লেশমাত্র রেখাপাত করে না, বরং তারা ও তাঁদের দোসর পরাশক্তিগুলো শরাবের পেয়ালার আসর জমিয়ে তখন খুশীতে হয় ডগমগ।

১৯৬৯ সালের ২২-২৬ সেপ্টেম্বর ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের স্থান ছিলো মরক্কোর রাজধানী 'রাবাত'। বাদশাহ ফয়সলসহ মোট ২৬ জন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে আল আকসা মসজিদের অবমাননার বিরুদ্ধে এবং প্যালেস্টাইনী মুসলমানদের অধিকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে এরপর থেকে বিশ্বজনমত দ্রুত ইসরাইলদের বিপক্ষে যেতে থাকে। জাতিসংঘ বাধ্য হয়েই ১৯৬৭ সালের ৪ ও ১৪ জুলাই-এ পাশকৃত ২২৫৩ ও ২২৫৪ প্রস্তাবে "শান্তির নগরী জেরুজালেমের" আন্তর্জাতিক মর্যাদা রক্ষার আদেশ আবার জোর দিয়ে ঘোষণা করে এবং এ মহান নগরীর কোনোরূপ ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন না করার জন্যও অত্যন্ত বিনীতভাবে বিশ্বজনীন এ সংস্থা ইসরাঈলের নিকট আবেদন রাখে। কিন্তু তার বৈধকরণ কর্তা, বিশ্বজাতিসমূহের একমাত্র প্রবীণ মুরুব্বী সম্মিলিত জাতিসংঘের উক্ত আকুল আবেদন নেমকহারাম ইসরাঈল ছুড়ে ফেলে দেয়। উভয় সংকটে পড়ে এ সংস্থাটি অত্যন্ত অসহায়ের মতই ইসরাঈলের দুয়ারে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে বারবার এবং কায়মনোবাক্যে অনুরোধ করেছে অন্ততঃ বিশ্বজনীন এ সংস্থাটির মান-সম্মানের দিকে তাকিয়ে ত্রিধর্মের অতিব পবিত্র ভূমি ঐতিহাসিক জেরুজালেম নগরীকে অসামরিকিকরণ ও আন্তর্জাতিকিকরণের জন্য একটু সহনশীলতা ও সংযমের পরিচয় দিতে ; কিন্তু ইবলিসের চেলা ইসরাঈল জাতি সংঘের সেই সম্মানটুকুও রাখেনি। বরং সে তার নির্দিষ্ট মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী পথ বেয়েই চলেছে অবিরাম। ইসরাঈলী দখলের ত্রয়োদশতম (নগরীর ইতিহাসে ৪১তম দখল) বছরে পূর্ব জেরুজালেমের ডোমোগ্রাফিক এবং গঠন বৈশিষ্ট্য ধারণাতীতভাবে বদলে যেতে থাকে সবচেয়ে বেশি। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনী আরবরাই যেখানে ছিল সংখ্যায় বেশি ; অথচ এখন (১৯৮০ সালের হিসাব অনুযায়ী) বৃহত্তর জেরুজালেমে

তাদের অংশ মাত্র ২৫%। এ হিসেবে মধ্যে শহরতলী এবং কয়েকটি গ্রামও অন্তর্ভুক্ত।

৫.১৩ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী চক্রান্ত

ইহুদীরা 'বিজ্ঞ ইহুদী মুরব্বীদের কায়দা-কানুন' নামক পুস্তকে অঙ্কিত বৃহত্তম ইসরাঈল রাষ্ট্র গঠনের লক্ষে তার সর্বগ্রাসী থাবা প্রতি মুহূর্তে বিস্তার করে চলেছে সুপরিকল্পিত, ধীর অথচ দৃঢ়রূপে। কেননা তাদের লক্ষ অর্জনের পথ এখন সবটাই সম্মুখে পড়ে রয়েছে। কারণ তারা সমগ্র সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ইরাক, দক্ষিণ তুরস্ক, সিনাই উপদ্বীপ নীল নদের অববাহিকা এবং মদীনা শরীফসহ সৌদী আরবের উত্তরাংশ তাদের স্বাপ্নিক রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলে মনে করে। তাই ইহুদীরা বহু বছরব্যাপী যিশু হত্যার অপরাধী হবার দরুন যখন খৃষ্টানগণ কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত হতে থাকে তখন থেকেই 'গইমদের' (অনইহুদীদের) শায়েস্তার পরিকল্পনা নেয় এবং সেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে থাকে। ফলে তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে গইমদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে চরম উৎকর্ষতা ও পারদর্শীতা অর্জনের জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে এবং সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জগতের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। ফলে একদা যে মুসলমানদের গতি প্রকৃতি ছিলো উল্কার মতোই ধাববান, ফেরেশতার ন্যায়ই পবিত্র, যাঁদের প্রতিটি কাজ ছিলো সৃজনশীল ও গঠনমূলক এবং মানব হিতৈষী, তারাই হলো আজ গো-শকটের ন্যায় মন্থর, চরিত্রের দিক দিয়ে পশুরও অধম এবং ধ্বংসকারী, প্রবঞ্চক ও রক্ত পিপাসু। পরিণতি স্বরূপ, আজ এ মুসলমান জাতই বিশ্বের সবচেয়ে একটি ঘৃণিত, লাঞ্ছিত এবং নিকৃষ্ট জাতি বলে সর্বত্রই বিবেচিত হচ্ছে। আপনজনের রক্তপিপাসায় তবুও তারা আজ পাগল পারা। তাই আমরা দেখতে পারছি, বর্তমান বিশ্বে যত রক্ত ঝরছে—তা অন্য কারোর নয়—মুসলমানদেরই। চক্রান্তশীলদের খপ্পরে পড়ে এভাবে তারা আজ ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে চলেছে। এর প্রধান কারণ পরীক্ষার ক্ষেত্র চলমান বিশ্বে মানুষের জন্য মাত্র দু'টি পথ খোলা রয়েছে—একটি সৎ ও চরম সত্য এবং অপরটি অসৎ ও চরম মিথ্যা। এ দু'টি চরম পথের যে কোনো একটি নিরঙ্কুশভাবে গ্রহণ করলেই মানুষ চরম উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হবে। দু'-নৌকায় পা রাখলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। আর উপরোক্ত চরম দু'টি পথের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ ও অবলম্বন করলে কেবল মাত্র ক্ষণিকের এ পার্থিব জীবনেই চরম ঐশ্বর্যময় জীবন লাভ করা যায়। এরপরে যে অনন্ত কালের জন্য এমন এক জীবন অপেক্ষা করছে সে জীবনটা হবে চরমতম দুঃখময়
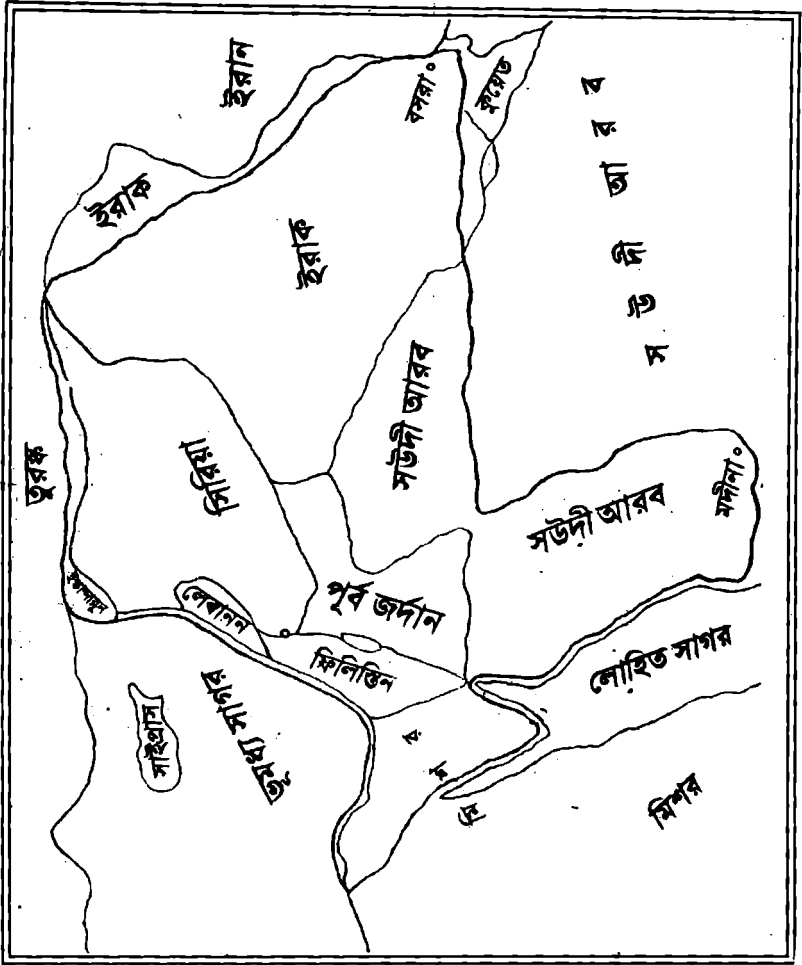
মানচিত্র ৮ ঃ ইসরাঈলী নেতৃবৃন্দ যে ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে।

ও জঘন্যতম। যার বর্ণনা দেয়া মানুষের চিন্তার বাইরে। কিন্তু যাঁরা সত্যের সেবক, সত্যের অতন্দ্র প্রহরী এবং সত্য সৈনিক, তাদের গতি 'সসারের' ন্যায়ই ধাবমান, অন্তর ফেরেশতার ন্যায়ই পবিত্র এবং কর্ম অত্যন্ত পরিমাপিক ও মানব হিতৈষী। হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা. খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা., প্রথম ওয়ালিদ রা., তারেক, মূসা, গাজী সালাহউদ্দীন, তুর্কীর সুলাইমান, মুহাম্মদ বিন কাশিম, সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মদ ঘুরী, কুতুবুদ্দীন আইবেক, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী, সুলতান বলবান

ও বাবরের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ

"ইসলাম সে ত পরশ মানিক তরে কে পেয়েছে খুঁজি
তারি পরশে সোনা হলো যারা তাদেরই মোরা বুঝি।"

যা হোক, এ সমস্ত সত্য সৈনিক যেমন পার্থিব জগতে চরম. ঐশ্বর্য ও যশের অধিকারী হয়েছিলেন, তেমনি পর জগতেও যে তারা চরম শান্তি ও ঐশ্বর্যময় অনাবিল জীবন লাভ করতে পারবেন তা আমরা অত্যন্ত যুক্তি-সংগতভাবেই বুঝতে পারি। কারণ যাঁরা সত্যাশ্রয়ী তাদের জয় সর্বত্র ও অবধারিত ; তা সে হোক ইহজগতে বা হোক পরজগতে। এটা বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তশীল ইহুদী জাতি বেশ ভালো করেই জানে ও বুঝে। তবুও তাদের দ্বারা কোনো কাজ হবার নয়—কেননা তারা নবী-রাসূল ও স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক অভিশপ্ত। অন্য কেউ যে ভালো থাকুক—ভালো কিছু করুক—এটাও তারা বরদাশত করতে পারে না। আর তাই, তারা মুসলমান রূপ এ অপ্রতিহত পবিত্র শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করার জন্য এক শক্তিশালী ষড়যন্ত্রের জাল মুসলমানদের ওপর নিক্ষেপ করে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে তারা প্রশান্তিময় মুসলিম সভ্যতা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তারা এভাবে মুসলমানদের সেই প্রশান্তিময় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করে তার ওপর গড়ে তুলেছে 'মাকাল ফল' সাদৃশ তথা কথিত প্রগতিশীল এমন এক সভ্যতা যেখান থেকে পবিত্রতা ও শান্তি নিয়েছে চির বিদায়।

৫.১৪ ইহুদীদের কু-প্রতিভায় বৃহৎ শক্তির আত্মাহুতি

ইবলিসের প্ররোচনায় নিপতিত দিশেহারা মানুষের দল ইহুদী সৃষ্ট এ ঝলমলে সভ্যতায় ডুব দিয়ে তাঁর উন্নত মানবাত্মার নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে। ঝলমলে সখ্যতায় মদমত্ত মানুষ ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে তা অনুধাবন করার সুস্থ্য মানসিকতাও আজ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। তাই তারা আজ এটাকে 'সুধা' বলে কদর করছে। আর কদর করছে তাদের এ সুধার জনক ইহুদী ও ইহুদী প্রতিভাকে। এরপর থেকে বিশ্বে ইহুদী ও ইহুদী প্রতিভার কদর দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলস্বরূপ শত অপরাধ সত্ত্বেও একমাত্র হিটলার ছাড়া তারা সবারই একান্ত কাংখিত পাত্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার রাজন্যবর্গ ইহুদীদের প্রতি দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ত্রি-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে থাকে, নাজী জার্মান থেকে বিতাড়িত আলবার্ট আইনিষ্টাইন, ফোন ব্রাউন ও ডঃ স্লোটোনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক এবং ক্লড ইথার্লীর ন্যায়

বৈমানিকের কুপ্রতিভাগুলো ব্যবহার করে স্ব স্ব সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা চরিতার্থ করতে। আর এটি করতে গিয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আলবার্ট আইনিষ্টাইনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটের সময় জাপানের হিরোশিমা এবং তার ৯ দিন পর নাগাসিকিতে (বিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো) আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে যে জঘন্যতম ধ্বংসকারী পশু সুলভ নীচু মনের পরিচয় দিয়েছিলো তা বিশ্ববাসী আজও ভুলতে পারিনি—কোনো দিন তা পারবেও না। এরপর থেকে বিশ্বে 'শক্তির ভারসাম্য' নামক তথাকথিত একটি ছুতোকে আশ্রয় করে নীতিজ্ঞান বিবর্জিত জ্ঞান-দীপ্ত ইহুদীদের দিয়ে তারা (সাম্রাজ্য শক্তি) প্রত্যেকেই আনবিক বোমা রূপ নানা জাতীয় মানববিধ্বংসী মারণাস্ত্র বানিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে বিশ্ব বাজারে ইহুদীদের মর্যাদা ও দাম দ্রুত বেড়ে যায়। প্রথম প্রথম গ্রেটবৃটেন ইহুদীদের এরূপ মানববিধ্বংসী কাজে ব্যবহার করে কিছু লাভবান হলেও শেষ পর্যন্ত হাজারো দুধ-কলা দিয়েও ইহুদী সম্প্রদায়ের পোষ মানাতে সে পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তবুও তারা এরূপ একটি মোক্ষম মারণাস্ত্র হাত ছাড়া হয়ে যাবে, এটা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিলো না। তাই তারা শেষবারের মতো ইহুদী প্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাতে গিয়ে জলাতংক রোগাক্রান্তের ন্যায়ই একটি দেশের নিরীহ নাগরিকদের এভাবে মূলোৎপাটন করে সেখানে ইহুদীদের নিয়ে গিয়ে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর বসিয়ে দিলো। তার ইহুদী প্রীতির এ গভীরতা দেখাতে গিয়ে বৃটেন এরূপ একটি ঘৃণ্যতম পথ অনুসরণ করেও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নিজ স্নেহক্রোড়ে আটকে রাখতে পারেনি। এর কারণ ইহুদীরা দেখলো ক্ষীয়মান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে নেচে-গেয়ে খুব একটা বেশি লাভবান হওয়া যাবে না ; বরং উঠন্ত 'সুপার পাওয়ার' সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নিলে অভীষ্ট লক্ষে পৌছানো খুবই সহজ হবে। তাই ইহুদীরা তাদের প্রপিতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখে পদাঘাত করে মার্কিন ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফলে আলবার্ট আইনিষ্টাইনের মতো হাজার হাজার ইহুদী বৈজ্ঞানিক ক্লড ইথারলির ন্যায় বৈমানিক এবং হেনরী কিসিঞ্জারের ন্যায় কূটনীতিকের প্রতিভাগুলোর সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ধন্য হয়। এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবীদার। কারণ একমাত্র তারই বলিষ্ঠ কূটনৈতিক চালের নিকট বৃটেন দিনের পর দিন ইহুদীদের চোখে হেয়প্রতিপন্ন হতে থাকে এবং ফলস্বরূপ তারা (ইহুদীরা) দারুণ-ভাবে মার্কিনীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে।

৫.১৫ গইম-খৃষ্টানদের গইম-মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার

এরপর ইহুদীরা এমন ভাবখানা দেখাতে থাকে যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটি মার্কিনীদের নয়, তাদেরই পৈত্রিক সম্পত্তি এবং প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠা বিভাগের শীর্ষে অবস্থান করে মার্কিনীদের ইহুদী স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। এভাবে তারা গইম-মুসলিম জাতিকে শিকার করার জন্য গইম-মার্কিনী নেতৃবৃন্দকে মুসলিম দেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মুখে এগিয়ে দিতে থাকে, যেমন বেদের ছেলেরা ঘুঘু পাখী শিকারের জন্য তাঁর ফাঁদ যুক্ত খাঁচাটি ঘুঘুসহ ঐ সহজ-সরল প্রাণ মুক্ত ঘুঘু পাখীটির দিকে এগিয়ে দিয়ে থাকে। সরল প্রাণ মুক্ত ঘুঘু পাখীটি তার সরলতা নিয়ে অত্যন্ত খোলামেলা ভাবেই প্রাণের আকুতি জানাতে গিয়ে নিজের যেরূপ ধ্বংস ডেকে আনে ; মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দও ঠিক সেই একই পরিণতির শিকার হয়ে চলেছে আজ। মুসলিম বিশ্বের এরূপ ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফাঁদে যাঁরা পা বাড়িয়েছেন এদের ভেতর মিশরের প্রেসিডেন্ট মরহুম আনোয়ার সাদাতের পরিণতি হয় আরো করুণ।

৫.১৬ ইহুদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লৌহমানব বাদশাহ ফয়সাল

সামরিক দিক দিয়ে আরব বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হলো মিশর। আর আর্থিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের একমাত্র নেতৃত্ব দানকারী দেশ হলো সৌদী আরব। তাই এ দু'টি দেশ ও তার নেতৃবৃন্দকে বশে এনে সারবস্তুটুকু চুষে খেয়ে পরে ধ্বংস করার এক ব্যাপক ইহুদী চক্রান্ত চলতে থাকে। শত চেষ্টা করেও যখন বিশ্ব ইহুদী চক্রান্তে লৌহ মানব বাদশাহ ফয়সলকে তাদের জালে জড়াতে পারলো না, বরং তিনি নিজেই গোটা মুসলিম বিশ্বকে ইহুদী চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন এবং তাদেরকে দিনের পর দিন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতে থাকেন, তখন চক্রান্তশীলরা হতাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় একদা তিনি যখন বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট তাঁর একান্ত মনোবাঞ্ছাটি প্রকাশ করলেন ঃ "আমার জীবনের শেষ আকাংখা মুক্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদুল আকসায় দু' রাকাআত শুকুরানা নামায আদায় করা"—তখন চক্রান্তশীল ইহুদী ও তাদের পদলেহনকারী পরাশক্তিগুলো প্রমাদ গুণলো। কারণ তাঁরা জানতো মুসলিম বিশ্বের এ শক্তিধর মহান নেতা ফাঁকাবুলিতে বিশ্বাসী নয়। তাদের এ ভাবনা অবান্তরও ছিলো না। ইতিপূর্বেই তিনি জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য বিশেষ করে আরব মুসলিম দেশসমূহকে প্রচুর আর্থিক অনুদান প্রদান করে সামরিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। ইহুদী ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিগুলো এ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন ছিলো। তাই বহু আগ থেকেই তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, জেরুজালেম তথা প্যালেস্টাইনে টিকে

থাকতে হলে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক ও চালিকাশক্তি বাদশাহ ফয়সলকে এখনই পৃথিবী থেকে বিদায় দেয়া আশু প্রয়োজন। এটা বাস্তবায়নের জন্য তাই তারা তাদের চালিকা শক্তি 'প্রটোকোলের' ফরমূলা প্রয়োগ করে। বাছাই করে সবচেয়ে সুন্দরী এক ইহুদী যুবতীকে উপযুক্ত তালিম দিয়ে আমেরিকান এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত বাদশাহর ভাইপো মুছাইয়েদের পিছনে লাগিয়ে দিলো তারা এবং তারই নির্দেশক্রমে ১৯৭৫ সালে ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন মুছাইয়েদ পিতৃব্যের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবীর শুভেচ্ছা স্বরূপ মুলাকাত করতে যাবার সময় হত্যার উদ্দেশ্যে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে যায়। বাদশাহ ফয়সল এ ঈদে মিলাদুন্নবীর শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় পিতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে যখন মুছাইয়েদকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ললাটে চুমো দিচ্ছিলেন তখনই ঘাতকের পিস্তল গর্জে ওঠে। পরপর বেশ কতকগুলো গুলীর আঘাতে মুসলিম বিশ্বের মহান নেতা ফয়সালের রক্তাক্ত দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সাথে সাথে কা'বার মিনারটি যেন ভেঙ্গে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের উজ্জ্বলতম আলোর মিনারটি যেন ধ্বসে পড়ে!! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

৫.১৭ ইহুদী খাঁচায় আনোয়ার সাদাত

এদিকে আনোয়ার সাদাত ইতিমধ্যেই পুরোপরি ইহুদী চক্রান্তের স্বীকারে পরিণত হন। তাই আমরা দেখতে পাই শুধু প্যালেস্টাইনীদের প্রতিই নয়, বরং গোটা আরব তথা মুসলিম বিশ্বের মতামতকে উপেক্ষা করে—এককভাবে ইসরাঈলের সাথে 'ক্যাম্প ডেভিড' (১৯৭৮) সাল চুক্তিটি করেন আর এর সাথে সাথেই গোটা প্যালেস্টাইন ও আরব বিশ্বে হাহাকার রব ওঠে। প্রতিবাদের আর সমালোচনার ঝড় ওঠে সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত তাকে আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফলে তিনি দারুণভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। শেষ পরিণামটা উল্লেখ না-ই বা করলাম। এভাবে ইহুদী চক্র ষড়যন্ত্র করে মিশরকে আরব লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসহায় করে এবং নিজেদের কবজায় নিয়ে যায়।

৫.১৮ 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তির সোনালী ফসল জেরুজালেম পূর্ণ গ্রাস

এমনিভাবে অভিনব উপায়ে আরব বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশটিকে নিরব রেখে পবিত্র জেরুজালেমকে ইহুদীরা পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে এবং সংসদে আইন পাশ করে পরে তারা এটাকে ইসরাঈল

রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী রাজধানী বলে ঘোষণা দেয়। অথচ ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তির আগ পর্যন্ত ইহুদীরা মোটেই সাহস পায়নি ত্রিধর্মের পবিত্র স্থান আন্তর্জাতিক শহর মহান জেরুজালেমকে স্থায়ীভাবে ইসরাঈল রাষ্ট্রভুক্ত করতে। 'ক্যাম্প ডেভিড' নামে এ কুখ্যাত চুক্তিটি আনোয়ার সাদাত কর্তৃক স্বাক্ষরের পরেই ইসরাঈলরা শুধু তা করতেই সাহস পায়নি, তারা ইতিমধ্যে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক জেরুজালেমকে ইসরাঈলের চিরস্থায়ী রাজধানীতে পরিণত করার জন্য বেশ কতকগুলো কার্যকরী পদক্ষেপও নেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা সাথে সাথেই পশ্চিম তীরে ইহুদী বসতি স্থাপন দ্রুত বাড়িয়ে চলে। এ কাজটি করতে গিয়ে ইসরাঈল সরকার অধিকৃত এলাকা থেকে প্যালেস্টাইনীদের বিতাড়িত করার জন্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেরও আশ্রয় নেয়। আরব মেয়রদের সন্ত্রাসের মুখে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য ইসরাঈলীরা বোমা মারতেও দ্বিধাবোধ করেনি। ফলে তিনজন মেয়র তাদের এ বোমার আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়। এর মধ্যে একজনের দু'টি পা-ই দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরূপ জঘন্য কার্যকলাপের মহানায়ক ইরগুইন নামক সন্ত্রাসবাদী দলের প্রধান পাণ্ডা ভূতপূর্ব ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেগিনই দায়ী বলে পর্যবেক্ষক মহল ১২/৬/৮০ তারিখে "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করেন। এভাবে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার মুখে প্যালেস্টাইনী আরবদের বিতাড়িত করে সেখানে ইহুদী বসতি স্থাপন দ্রুত বাড়িয়ে চলে। ইসরাঈলী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭৯ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নব্বই হাজার ইহুদী বসতি স্থাপনকারী জেরুজালেমকে ঘিরে এগারোটি ইহুদী এলাকা গড়ে তোলে। এ রিপোর্ট তৈরি করেছে জর্দানের রাজকীয় বিজ্ঞান পরিষদ (আর. এস. এস.)।

চিত্র: ৫০ প্রধানমন্ত্রী বেজিন

৫.১৯ বিশ্বব্যাপি এর প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৮০ সালের ১লা জুলাই পূর্ব জেরুজালেমের মর্যাদা পরিবর্তনের ব্যাপারে ইসরাঈল কর্তৃক গৃহীত আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এক তীব্র নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ১৯৬৭ সাল থেকে জেরুজালেম সহ অধিকৃত আরব এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করার জন্য ইসরাঈলের প্রতি আহ্বান জানায়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, জেরুজালেমের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক মর্যাদার পরিবর্তনের যে কোনো পদক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা থেকে ইসরাঈলকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪টি রাষ্ট্রই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোট দানে বিরত থাকে। এটা তাদের মোনাফিকী মনেরই পরিচায়ক। তার কারণ এভাবে সে সৌদী আরবকে শান্ত রেখে ইসরাঈলের কার্যাবলীর সমর্থন করে যাচ্ছে।

এদিকে ১৯৮০ সালের ১২ আগস্ট তারিখে পি. এল. ও.-এর প্রধান ইয়াসির আরাফাতের উদ্যোগে জর্দানের রাজধানী আম্মানে ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এ সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় আবারো একথা বলা হয় যে, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি এবং মিশর-ইসরাঈল শান্তি চুক্তি প্যালেস্টাইনের স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সামিল। তাই সম্মেলন এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। এ সম্মেলন আরো মত প্রকাশ করে যে, এ ধরনের সবরকম চুক্তির পরিণতি এবং পৃথক বা আংশিক মীমাংসায় প্রবলভাবে বাধা দিয়ে যাবে।

এ একই সালের ৪ ডিসেম্বর প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে জেরুজালেমে আরব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। জেরুজালেম সংক্রান্ত ব্যাপারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এখানে আয়োজিত সেমিনারে জেরুজালেমকে ইহুদীকরণ করার ইসরাঈলী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেমিনারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, মুক্তিযোদ্ধারা আলোচনা পেশ করেন। তাঁরা জেরুজালেমে আরব সার্বভৌমত্ব ও ৩টি প্রধান ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেন। তারা জেরুজালেমের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। সেমিনারে উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডঃ হাবিব চাত্তি। ভাষণে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন মুসলমানরা মসজিদুল আকসায় নামায আদায় করবে।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডের পর জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের অভূতপূর্ব একতা ইতিপূর্বে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। ক্রুসেড যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট গাজী সালাহউদ্দীনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অশ্রুতপূর্ব

ঔদার্যের সাথে যুক্ত হয়েছিলো সমগ্র মুসলিম জাহানের ঐক্যবদ্ধ শক্তি। দিনের পর দিন এ ধরনের ঐক্য আবার নতুন করে দানা বাঁধছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। এদিকে অক্যাথলিক খৃষ্টানরাও জেরুজালেমের পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জোরালো মতামত ব্যক্ত করেছেন। চল্লিশ কোটি অক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংগঠন "বিশ্ব গীর্জা পরিষদ" প্যালেস্টাইনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছেন এবং জেরুজালেমের মর্যাদা নির্ণয়ে ইসরাঈলের একক সিদ্ধান্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৈরুতে সংগঠনের আন্তঃগীর্জা সাহায্য ও উদ্বাস্তু বিশ্ব সেবা কমিশনের ডিরেক্টর জ্যা ফিসার বলেছেন ঃ

"মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে জেরুজালেমের মর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে। জেরুজালেম সংক্রান্ত সকল একক পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করা উচিত।"

৫.২০ জেরুজালেম উদ্ধারে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা

পরাশক্তিগুলোর ইন্ধন পেয়ে অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক সম্প্রসারণবাদী ইসরাঈল যখন পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে হাজার হাজার প্যালেস্টাইনী আরবের রক্তের বন্যা দিয়ে অপবিত্র করে তুলেছিলো তখন নতুন বাংলাদেশের স্থপতি, সত্যের অতন্দ্র প্রহরী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাগ্রত সিংহের ন্যায় গর্জে উঠেছিলেন। এ বিরাট অন্যায়ের ও আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিলেন এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদারদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য যে সমস্ত গাজী মুক্তিযোদ্ধারা জান প্রাণকে বাজি রেখে খানদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতে অত্যাচারীদের কবর রচনা করেছিলেন, তাদেরকে প্যালেস্টাইনী ভাইদের এ চরম বিপদের দিনে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জেরুজালেম তথা গোটা প্যালেস্টাইনকে ইসরাঈলী রাহুমুক্ত করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধারা তখন থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে লেবানন ও অন্যান্য প্যালেস্টাইনী ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে চলেছেন। এদেরই একজন হলেন মুক্তিযোদ্ধা ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল।

'রবিবার' সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদদাতার সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন ঃ

চিত্র ৫৭ঃ ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল।

ইসরাঈলী সিমান্তে বঙ্গশার্দুল।

"ন্যায় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে আমি গর্বিত।" একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়ার নেতৃত্বে আপন জন্মভূমিকে পাক-হানাদার মুক্ত করতে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, একাশিতে এসে সেই একই নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদেশে আবার ইসরাঈল হানাদারদের বিরুদ্ধে তাঁরা অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন প্যালেস্টাইনীদের সপক্ষে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার এ যাদুকরী নেতৃত্ব দেখে বিশ্ব স্তম্ভিত হলো। আর প্রমাদ গুণলো শত্রুরা। মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি বাংলাদেশের এ মহান অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতার ওপর এসে পড়লো। তাঁরা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের সোনালী ভবিষ্যতের আলো দেখতে পেলো। তাই মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট নেতারা ছুটে এলেন ঢাকাতে। প্রায় প্রতিটি ইসলামিক দেশের রাষ্ট্র প্রধানই আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন স্ব স্ব দেশে। শুধু জেরুজালেমই নয় ; গোটা মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সামাধান খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা তাঁর নেতৃত্ব কামনা করলেন। একটি বৃহত্তম মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্বের প্রতি তিনি ছিলেন সদা সচেতন। তাই তিনি মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব হাঁসিমুখেই বরণ করে নিলেন এবং ইসরাঈলের ঐরূপ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কাসাব্লাঙ্কায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি প্যালেস্টাইন সমস্যা ও তার সমাধানের ওপর যে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন, তাতে সম্মেলনের সবাই চমৎকৃত হন। ফলে জেরুজালেমকে ইসরাঈল রাহুমুক্ত করার জন্য সম্মেলন শেষে "আল কুদ্স" নামে যে কমিটি গঠিত হয়, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাতে তিন সদস্যের

চিত্র ৫২ ঃ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে আরাফাত ও সেকাতুরে।
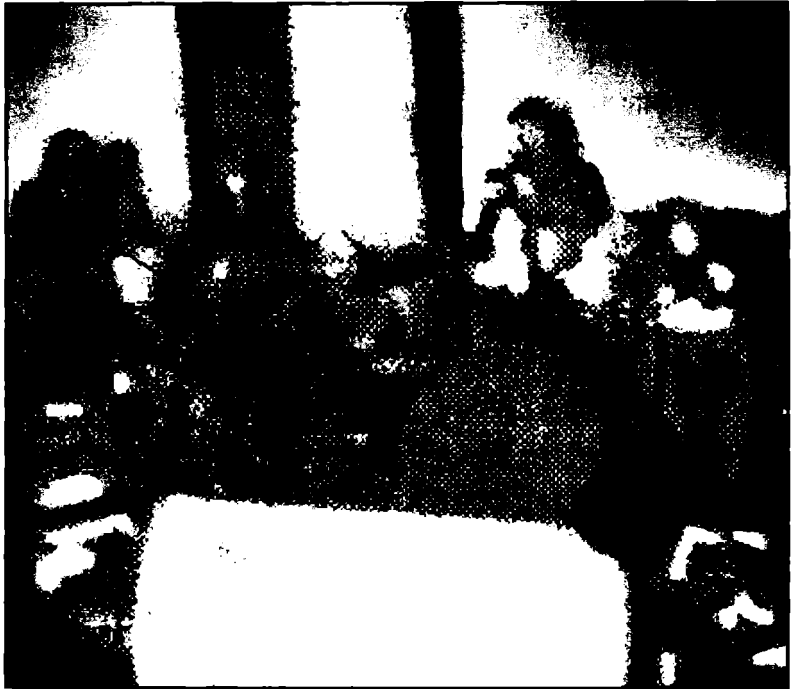
চিত্র ৫৩ ঃ জেরুজালেম শীর্ষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর এ নির্বাচন প্যালেস্টাইনী জনগণের মুক্তির আকাংখার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের নৈতিক সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ছিলো। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জেরুজালেম প্রশ্নে আরব বিশ্ব তথা মুসলিম জাহান এবং সকল দেশের শান্তিকামী ও স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের সাথে ঐক্য ও সংহতি ঘোষণা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় তখনকার পৌর কর্পোরেশনের মেয়র, মন্ত্রী সভার সদস্যবর্গ এবং বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষকবৃন্দ, মসজিদের ইমাম ও সচেতন শ্রমিক ও কৃষকেরা জেরুজালেম গ্রাসের তীব্র নিন্দা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

৫.২১ মেনাহাম বেগিনের ঔদ্ধত্যতা

বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন চলতি সনের (১৯৮১) ১ জুলাই জেরুজালেমকে ইসরাঈলী রাজধানী করা এবং সম্পূর্ণ গ্রাস না করার ব্যাপারে ইহুদী প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনকে পরামর্শ দেন। তিনি রাজধানী জেরুজালেমে স্থানান্তর না করার জন্য বেগিনকে উপদেশ দিলে বেগিন ঔদ্ধত্যসুরে জানিয়ে দেন জেরুজালেম রাজধানী ছিলো, লণ্ডন ইংল্যাণ্ডের রাজধানী হবার বহুবহু বছর আগে এবং সে ইহুদী রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে থাকবে অনন্তকালের জন্য।

এ ঘটনার কয়েক দিন আগ থেকেই জেরুজালেম বেগিনের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য বেশ কতকগুলো প্যালেস্টাইনী আরব পরিবারকে তাদের

চিত্র ৫৪ ঃ জেরুজালেমকে চিরস্থায়ী রাজধানী করার জন্য ইহুদী বিক্ষোভ।

চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত করা হয়। এজন্য কোনোরূপ ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটুকু পর্যন্তও উঠেনি। মার্কিনীদের মানবাধিকার এখানে

প্রযোজ্য নয়—ওটা সাখারাভ পরিবারের জন্য, পোলিশ শ্রমিকদের জন্য। কাম্পুচিয়া উদ্বাস্তুদের অবস্থা দেখার জন্য মার্কিন সিনেটরদের আগ্রহাতিশয্য নিয়ে ধন্য ধন্য রব ওঠে ; অথচ ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদকৃত প্যালেস্টাইনী আরব পরিবারদের দেখার জন্য কোনো মার্কিন সিনেটরকে কথা বলতে পর্যন্ত শোনা যায়নি। উপরন্তু সে ইসরাঈলীদের এহেন মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে আরো উৎসাহ দেবার জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে চলেছে। শুধু তা-ই নয়, সবচেয়ে লেটেষ্ট মডেলের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান এফ-১৬-ও দিয়ে চলেছে অধিক পরিমাণে। আর ইসরাঈল এ অত্যাধুনিক বিমান নিয়েই লেবাননের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে বোমা বর্ষণ করে হাজার হাজার অসহায় বৃদ্ধা ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে।

৫.২২ আল আকসা মসজিদে খননকার্য ও তার প্রতিক্রিয়া

এদিকে ঐ একই সালের (১৯৮১) সেপ্টেম্বর মাসে ইসরাঈল সরকার তার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে জেরুজালেম আবার 'খনন কার্য' শুরু করে। উদ্দেশ্য বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত পবিত্র মসজিদুল আকসা ধ্বংস করে সেখানে একটি বৃহদাকার গীর্জা নির্মাণ করা। এ তথ্যটি প্রকাশ করেন আল আকসা মসজিদের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ শাখরা (১৯৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর)। এ তথ্যটি প্রকাশের সাথে সাথে গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এর আগেই আরব লীগের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আলেস্‌কো'র মহা পরিচালক ডঃ মহিউদ্দীন সাবের পবিত্র জেরুজালেমে অবস্থিত আল আকসা মসজিদে ইসরাঈলের এরূপ ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ১৯৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর 'ইউনেস্কোর' প্রতি আহ্বান জানান। জনাব মহিউদ্দীন সাবের 'ইউনেস্কোর' ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় এ আহ্বান জানান। বার্তায় তিনি ইসরাঈলের এ ধরনের অশুভ তৎপরতাকে সাংস্কৃতিক অপরাধ বলে উল্লেখ করেন। এদিকে ইসরাঈলের এহেন পাঁয়তারার প্রতিবাদে ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাঈল কর্তৃক অধিকৃত এলাকার হাজার হাজার প্যালেস্টাইনবাসী তাদের স্ব স্ব কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। ফলে সমগ্র অধিকৃত এলাকার জনজীবন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, জেরুজালেমের সর্বোচ্চ ইসলামী পরিষদ এ ধর্মঘটের ডাক দেয়। অন্যদিকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব ডঃ হাবিব চাত্তি আল আকসা মসজিদে ইসরাঈলের খনন বন্ধ করণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। ডঃ চাত্তি এ উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব ডঃ কুর্ট ওয়াল্ড হাইম, ইউনেস্কো

প্রধান ডঃ মুখতার এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত সকল দেশের সরকারের নিকট তারবার্তা পাঠান। জনাব চাত্তি, ডঃ হাইম ও ইউনেস্কো কর্ম-কর্তাদেরকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং নিরাপত্তা পরিষদ ও ইউনেস্কোর প্রতি ইসলামী সনদ 'আল কুদস' সংরক্ষণের আহ্বান জানান। তিনি ইসলামী দেশসমূহের সরকার-গুলোর প্রতিও বৈদেশিক দূতাবাসের মাধ্যমে এহেন ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার কৌশল হিসেবে ইসরাঈলের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য সর্বাত্মক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান।

৫.২৩ প্রার্থনারত মুসলিম-খৃস্টান জনতার ওপর এল্যান গুডম্যানের গুলীবর্ষণ ও তার প্রতিক্রিয়া

জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে ইহুদী চক্রান্ত আরো এগিয়ে চলেছে। এর বাস্তব প্রমাণ পাই আমরা ১৯৮২ সালের ১১ এপ্রিলের রবিবার দিন। এ্যালান গুডম্যান নামক একজন জায়নবাদী ইহুদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে। অত্যাধুনিক অস্ত্র চালনায় সে ভীষণ পারদর্শী। জেরুজালেমে গিয়ে সে ইসরাঈল বাহিনীতে যোগদান করে। পরে এখানে অবস্থান করে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস সাধন করার জন্য পবিত্র আল আকসা মসজিদের প্রাঙ্গনে বিস্ফোরক স্থাপন করে। উক্ত দিনটিতে খৃস্টানদের আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন ছিলো। গুম্বুজ-ই-খিজায় খৃস্টান সম্প্রদায় যখন ইষ্টারের প্রার্থনা সভায় মিলিত হয় তখন এ্যালান গুডম্যান নামে এ নবাগত ইহুদী সৈনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলী শুরু করে। ফলে সাথে সাথেই দু'জন প্রার্থনারত খৃস্টান নিহত হয় এবং বহু আহত হয়। এর পরেই সৈনিকটি নিকটবর্তী উমর মসজিদে প্রবেশ করে এবং সেখানেও সে উন্মত্তের ন্যায় গুলীবর্ষণ করে। এতে বহু লোক (৩০ জন) আহত ও মসজিদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। অতপর মুসলমানরা জীবনকে বাজী রেখে গুডম্যানকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য কব্জায় আনার চেষ্টা করলে ইসরাঈলী সৈন্যরা এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গন হতে সংস্থাপিত ঐ বিস্ফোরকটি উদ্ধার করা হয়। সংবাদে প্রকাশ, মুসলমান ও খৃস্টানদের ধর্মীয় সমাবেশ ও পবিত্র মসজিদে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জেরুজালেমসহ সমস্ত অধিকৃত এলাকায় তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় এবং ইসরাঈলী সৈন্যরা এ বিক্ষোভ দমনে বহু স্থানে গুলীবর্ষণ করে। ইসলামী সম্মেলনের চেয়ারম্যান বাদশাহ খালেদ ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ ও প্যালেস্টাইনীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিশ্বের মুসলমানদের প্যালেস্টাইনীদের সাথে একাত্মতা

প্রকাশের আহ্বান জানান। ফলে গত ১৫/৪/৮২ তারিখে গোটা মুসলিম জাহান ইহুদীদের এ গুণ্ডামীর প্রতিবাদে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। এ ঘটনার পরপরই সম্মিলিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গত ২০/৪/৮২ তারিখে এক তীব্র নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে। এ নিন্দা প্রস্তাবের সপক্ষে পড়ে ১৪ ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে মাত্র একটি ভোট। জাতি সংঘের মার্কিন প্রতিনিধি Jeane Kirkpatriek এ ভোটটি প্রদান করেন। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদীদের সমস্ত ধ্বংসকারী কার্যকলাপই সমর্থন করে আসছে বহু পূর্ব থেকে। আর এটাই ইসরাঈলী শক্তির ও তার ঔদ্ধত্যের প্রধান কারণ। তাই জেরুজালেম থেকে ইসরাঈলকে হটাতে হলে তার পিছনে কোন্ শক্তি সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে—ইসরাঈলের শক্তির মূল উৎসে আঘাত হানতে হবে। রূপকথার রাক্ষসের প্রাণ ছিলো অতল সরোবরে নিমজ্জিত এক সোনার কৌটায়। ইসরাঈলের সামরিক শক্তি ও দম্ভের উৎস, তার আগ্রাসী মনোভাবের জন্ম ও লালন-পালনের ধারা অব্যাহত রেখে জেরুজালেমের মর্যাদা উদ্ধার করা যাবে না—মুক্ত করা যাবে না মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত বায়তুল মোকাদ্দাস।

৫.২৪ মার্কিনীদের ইহুদী প্রীতির ইতিহাসটা একবার খুঁজে দেখা উচিত

তবে এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, মার্কিনীরা ইহুদী বা ইসরাঈলদের নিয়ে যত নাচানাচিই করুক না কেন, এতে তাদের নিজেদেরই ভবিষ্যত নষ্ট করছে—একদিকে তারা যেমন ইহুদীদের মরণ নাচনে নাচতে গিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের নৃশংস মৃত্যুর কারণ হয়ে রাশি-রাশি অভিশাপ কুড়াচ্ছে, অন্যদিকে আরো লাখ লাখ সরল প্রাণ মানুষকে তাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত করে পার্শ্ববর্তী আরবদেশে উদ্বাস্তু সমস্যা দিনের পর দিন বাড়িয়েই তুলছে। ফলে মুসলমানদের অন্তর থেকে মার্কিনীদের স্থান যেমন দিনের পর দিন উঠে যাচ্ছে, তেমনি গতিতে মুসলিম বিশ্ব থেকে আমেরিকার পা-এর তলার মাটি দিনের পর দিন সরেই যাচ্ছে। আর সম্প্রসারণবাদী নেমকহারাম ইসরাঈলকে কোটি কোটি মার্কিন ডলার ও এফ-১৬ রূপ অসংখ্যা মারণাস্ত্রের ভিটামিন খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে ইসরাঈল রূপ কালনাগিনীকে যেভাবে বেপরোয়া করে তুলছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, সে নিজেই এ কালনাগিনীর মরণ ছোবলে অদূর ভবিষ্যতে ঢলে পড়বেই পড়বে। তার আলামত ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখাও গিয়েছে। কেননা এখন সে যতটুকু শক্তিই অর্জন করেছে তা নিয়েই সে তার প্রপিতা আমেরিকার মতামতকে ছুড়ে ফেলতে শুরু করেছে। ২১/১২/৮১ তারিখের

'দৈনিক ইত্তেফাক' জেরুজালেমে অবস্থানরত 'এপি'-র সংবাদদাতার বরাত দিয়ে সম্মুখ পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে যে—

"মার্কিন নীতিকে আক্রমণ করিয়া ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরাঈলের নয়া কৌশলগত মৈত্রী চুক্তি বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। বেগিন ইসরাঈলকে নিজের সামান্তরাজ্য বিবেচনা করার দায়ে আমেরিকাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার দীর্ঘ ক্রোধপূর্ণ বিবৃতিতে ইসরাঈল কর্তৃক সিরিয়ার গোলান পার্বত্য অঞ্চলকে ইসরাঈল রাষ্ট্রভুক্ত করার প্রশ্নে ইসরাঈলী-মার্কিন সম্পর্ক চরম সংকটের সম্মুখীন বলে উল্লেখ করা হয়। দুই দেশের সম্পর্ক এমন নিম্ন পর্যায়ে আর কখনো উপনীত হয় নাই। উল্লেখ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোলান এলাকা ইসরাঈলী রাষ্ট্রভুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য কৌশলগত মৈত্রীচুক্তি স্থগিত রাখিয়াছে এবং রাষ্ট্রভুক্তকরণ আদেশ বাতিল করিতে বলে। মন্ত্রিসভার বিবৃতিতে বলা হয় যে, ইসরাঈল কৌশলগত মৈত্রীকে বাতিল বলিয়া গণ্য করে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বে এমন কোনো শক্তি নাই যে গোলানের ইসরাঈল ভুক্তির সিদ্ধান্ত উল্টাইতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বেগিন বলেন যে, ইসরাঈল গোলান হইতে হটিয়া আসিবে না। মন্ত্রিসভার সচিব এ্যারে নাওর বলেন যে, তিনি যাহা পাঠ করিতেছেন তাহা হইতেছে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পূর্বে বেগিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, শ্যামুয়েল লুইকে যাহা বলিয়ছেন উহার পূর্ণ বিবরণী। রয়টার জানায়, একজন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, প্রধানমন্ত্রী বেগিনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে কৌশলগত সহযোগিতার মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। উক্ত মুখপাত্র বেগিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া জানান যে, ইসরাঈলী পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত এ আইন কখনও বাতিল করা হইবে মা। তিনি বলেন, চুক্তি স্থগিত করিয়া মার্কিনরা ইসরাঈলকে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তির জিম্মি করিতে চাহিয়াছিল। ৪ ঘণ্টা স্থায়ী সভায় মন্ত্রিসভা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিকট পেশকৃত বেগিনের বক্তব্য অনুমোদন করে। বিগত ৩৩ বছরে মার্কিন-ইসরাঈল সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য অভূতপূর্ব। জেরুজালেমের সংবাদপত্রসমূহে বলা হইয়াছে যে, দুই দেশের সম্পর্ক নিম্নতম পর্যায়ে পৌছিয়াছে।"

এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, ইসরাঈল তার লক্ষ অর্জনের দিকে রুটিন মাফিক এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিহত গতিতে। এখন এমন কি সে আমেরিকাকেও তোয়াক্কা করতে রাজি নয় ? উপরোল্লেখিত ইত্তেফাকের

সংবাদটা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। অতএব এখনও সময় আছে মার্কিনীদের তাদের নিজেদের শুধরে নিবার।

কিন্তু শুধরাবার ইচ্ছা করলেই তো আর সহজে শুধরানো যায় না। কারণ শিক্ষিত ও মিলিয়নিয়ার জায়নবাদী ইহুদীরা মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে সেখানে এমন পাক্কা বাঙ্কারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে যে, সেখান থেকে সরাতে গেলে পরাশক্তি হিসেবে মার্কিনীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। এটা মার্কিনবাসীও যেমন জানে ইহুদী কুচক্রীরা জানে তার চেয়েও অধিক। আর মার্কিনীদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ইহুদীরা এত ঔদ্ধত্য ব্যবহার করতে সাহস পাচ্ছে। আর এজন্যই কুচক্রী ইহুদীরা যেমন খুশী তেমন করে নাচালেও আজ মার্কিনীদের প্রতিবাদের বাকশক্তি রহিত ; বরং অসহায়েরই ন্যায় তাদের ইহুদী ডাইরেক্টরের আঙ্গুলী ইশারায় 'মূক অভিনয়' করতে হচ্ছে। এর বড় প্রমাণ অদ্যাবধি সম্মিলিত জাতিসংঘ যতবারই ইসরাঈলকে শান্ত ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য তার ঔদ্ধত্য ও ধ্বংসকারী কার্যাবলীর প্রতিবাদে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়েছে প্রায় ততবারই সে মার্কিন ইহুদী নেতৃবৃন্দের নির্দেশের প্রতি ভেটো দিয়ে বসেছে। এরূপে সে আজ পর্যন্ত সর্বমোট একত্রিশ বার ভেটো প্রয়োগ করেছে।

তবে নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব একটি প্রতিষ্ঠিত ন্যায় এবং সত্যের পুনঃ পুনঃ স্বীকৃতি। জোরপূর্বক অপরের ভূ-খণ্ড দখল করলে এককালে সেটা দখলকারীর নিজের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত বলে বিবেচিত হলেও জাতিসংঘ সনদ মাফিক এখন কোনো ভূ-খণ্ডের জবর দখল দ্বারা সেটাতে দখলদারদের মাকিলকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু ইসরাঈলের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। তার গোটা অস্তিত্বটাই যেমন অবৈধ তেমনি এ তথাকথিত রাষ্ট্রটি তার জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক সকল নিয়ম-কানুন ও আইনের প্রতিও সে বেআইনী আচারণই চালিয়ে আসছে। এ বেআইনী প্রবণতা থেকেই সে জোরপূর্বক দখলকৃত এলাকাসমূহ নিজের এলাকার মতোই মনে করছে।

৫.২৫ ইহুদীদের স্বরূপ ও তার পরিণাম

১৯৬৭ সালে বেআইনীভাবে পূর্ব-জেরুজালেমসহ পুনরায় অধিক আরব এলাকা দখল এবং এরপর মিশর ইসরাঈল যুদ্ধে পুনরায় আরব ভূমির বিরাট অংশ দখল—এ প্রত্যেকটি আগ্রাসী ভূমিকার মধ্যে দিয়েই বারবার ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও সম্প্রসারণবাদিতার নগ্নরূপই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ইসরাঈলের প্রত্যেকটি আগ্রাসী পদক্ষেপই বিশ্বসংস্থা কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই ইসরাঈলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এমনিভাবে এ সংস্থা মে, ১৯৬৪ (২৫২নং), জুন, ১৯৬৯ (২৬৭নং) সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ (২৭১নং) সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (২৯৮নং), মার্চ, ১৯৮০ (৪৬৫নং), জুলাই, ১৯৮০ এবং এপ্রিল ১৯৮২-তে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর প্রতি ইসরাঈল কর্তৃক অসম্মান প্রদর্শন করার প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে এবং এর প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই পরিষদ ইসরাঈলকে ১৯৬৭ সাল থেকে অধিকৃত আরব অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক নগরী জেরুজালেমকে ছেড়ে যাবার জন্য জোর দাবী জানায়। তাছাড়া এর আগেই পবিত্র নগরীর মর্যাদা ও তার নিত্যনৈমিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। কিন্তু ইসরাঈলী নেতারা জাতিসংঘ ও তার সংগঠনসমূহের সকল আবেদন উপেক্ষা করেই চলেছে।

নীতি-নৈতিকতাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন কিংবা সমালোচনা কিছুটা কাজ করে। ন্যায় ও শান্তিকামী বিশ্ব বিবেকের প্রতিবাদ বা নিন্দা তাঁদের ওপর নৈতিক চাপের সৃষ্টি করে ; কিন্তু ইসরাঈলের মতো নির্লজ্জ নেমকহারাম আগ্রাসী দেশের ক্ষেত্রে এহেন নৈতিক চাপ যে কোনোই ফলদায়ক নয়, তা এমনিভাবে একাধিকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে স্থায়ী ইহুদী বসতি, নির্মাণ কিংবা পূর্ব জেরুজালেমে অন্যায়ভাবে ইসরাঈলের রাজধানী স্থাপন—এ প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে সে ধূর্তামিরই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের বহু বিতর্কিত 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তিকে অর্থহীন করে তোলা এবং নিরাপত্তা পরিষদে নিন্দা প্রস্তাব পাশের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ইসরাঈলী সংসদ নেসেটে জেরুজালেমের মর্যাদা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিলটি গৃহীত হওয়া তার বড় প্রমাণ। তড়িঘড়ি করে এ বিলটি গৃহীত হওয়ার অর্থই হলো ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ পূর্বেই নিজেদের এ অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া এবং এ ব্যাপারে বিশ্বসংস্থার মতামত কি হবে তা আঁচ করে নিয়েছিলো।

একটি দেশ কর্তৃক অব্যাহতভাবে নিজের অন্যায় আচরণ চালিয়ে যাওয়া এবং বারবার বিশ্বসংস্থার সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করার অর্থই হলো সে বিশ্বজনমতকে আদৌ পরোয়া করে না। তার এহেন ঔদ্ধত্য এবং নিরাপত্তা পরিষদের মতামতের প্রতি পৌনঃপুনিক বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন যেমন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোনো উদ্যোগকে অনিশ্চিত করে তুলেছে, তেমনি বিশ্বসংস্থার মর্যাদাকেও দিনের পর দিন খাটো করে ফেলছে। বিশ্ব উত্তেজনা

হ্রাস এবং বিশ্বসংস্থাকে মানবতার কল্যাণ সাধনের উপযোগী হিসেবে তার ভাবমূর্তি বজায় রাখতে হলে ইসরাঈলের এরূপ বেআইনী এবং ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া আশু প্রয়োজন।

ইসরাঈল কোন খুঁটির জোরে যে এরকম বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণ এবং কার্যকরী করে চলেছে তা আজ আর কারোর অজানা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবতার কল্যাণে যত মুখরোচক বুলিই আওড়াক না কেন ইসরাঈলের অন্যায় ভূমিকার প্রতি তার অন্ধ সমর্থন এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তার পৃষ্ঠপোষকতা যুক্তরাষ্ট্রের সকল বক্তব্যকে অন্তঃসারশূন্য করে তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উত্তেজনা হ্রাসের ব্যাপারে আন্তরিক হলে ইসরাঈলের ব্যাপারে তার সকল দুর্বলতা ও জুজুর ভয়কে অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। তা না হলে তাকেও খুব তাড়াতাড়িই অতীতের অত্যাচারী পারস্য সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায় করুণ পরিণতিরই স্বীকার হতে হবে ; ইতিহাস সেটাই প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে চলেছে।

প্যালেস্টাইনে জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ভাবে জেরুজালেমকে রাজধানীতে পরিণত করার ইসরাঈলী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এসেছে। অন্যথায় মধ্যপ্রাচ্যে আরেকবার দারুণভাবে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

❐

৬ষ্ঠ অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ স.-এর ভবিষ্যদ্বাণী

৬.১ ইহুদীদের পরিণাম সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ স. ভবিষ্যদ্বাণী

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرَای ثُمَّ لاَ یَكُوْنُ بَعْدَهُ وَقَیْصَرُ لَیَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ یَكُوْنُ قَیْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتَقْسَمَنَّ عُنُوْزُهُمَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَسَمَّی الْحَرْبَ خُدْعَةً -

"হযরত আবু হুরাইরা রা হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম স. থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল স. বলেছেন, অচিরেই পারস্য-সম্রাট ধ্বংস হবে ; তারপর আর কেউ পারস্য সম্রাট হবে না। তদরূপ অচিরেই রোম সম্রাট ধ্বংস হবে ; তারপর আর কেউ রোম সম্রাট হবে না। (উভয় সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়ে) তাদের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়ে যাবে। উক্ত ভবিষ্যত বাণীটি করার সময় তিনি এটাও বলেছিলেন যে, কৌশলই যুদ্ধের প্রাণ বস্তু।"

"আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (কেয়ামতের আগে) তোমরা মুসলমান (জাতি) ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি জিহাদ করবে। (সেই জিহাদে ইহুদীরা পরাজিত হবে এবং দুনিয়ার কোনো বস্তু তাদেরকে আশ্রয় দিবে না। এমন কি) কোনো ইহুদী কোনো পাথরের (বা গাছের) আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও ঐ পাথর মুসলমান ব্যক্তিকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দেখ, একজন ইহুদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা করো।"

৬.২ মুক্তির পথ

তবে এর আগ দিয়ে সমকালীন তথাকথিত মুসলমানদেরকে অবশ্যই আত্মশুদ্ধি করতে হবে। তাদেরকে কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে অনুশোচনার মন নিয়ে তাওবা করতে হবে এবং শান্তিবিধি ইসলামের অনুশাসনগুলো নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। এতে করে সে এমন এক দুর্জয় শক্তির উৎস পেয়ে যাবে, যার সম্মুখে বিশ্বের কোনো বৃহৎ অত্যাচারী শক্তিই তিষ্টিতে পারবে না ; যেমন পারিনি ইতিপূর্বেও। অতএব

পবিত্র জেরুজালেমকে অত্যাচারী ইহুদীদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে মুসলমানদেরকে অবশ্যই মু'মিন হতে হবে। কেননা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

"এবং তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না, আর চিন্তিতও হয়ো না ; তোমরাই হবে জয়ী—যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯

অতএব প্রকৃত ও খাঁটি মু'মিন হওয়ার মধ্যেই রয়েছে মুসলিম জাতির সাফল্য ও মহাবিজয়।

মুসলিম জাহানের এ সংকটময় মুহূর্তে প্যালেস্টাইনের আজাদী লাভের এ সংগ্রামে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর কাছেই সাহায্য পাওয়া যাবে না—প্রকৃত সাহায্যকারী মুসলমানদের আর কেউ নেই, একথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔

"আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট থেকেই।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৬

অর্থাৎ মুসলমানদের সাহায্য শুধু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই আসে। অতএব, তাঁর প্রতি ভরসা রাখা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

বস্তুতঃ ইসলামের গৌরবোজ্জল যুগে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ দু'টি গুণেই বিশেষভাবে গুণান্বিত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা। ফলে সেদিন মহাবিজয়ের বিজয়-মালা তাদের কণ্ঠে শোভা পেয়েছিলো। অথচ সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত দ্বন্দ্বে সত্য সৈনিক মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। নিম্নের পরিসংখ্যান তা-ই প্রমাণ করে ঃ

যুদ্ধ	মুসলমানদের সংখ্যা	অমুসলমানদের সংখ্যা	বিজয়
বদরের যুদ্ধ	৩১৩ জন	১,০০০ জন	মুসলমানদের
ওহোদের যুদ্ধ	৭০০ ,,	৩,০০০ ,,	,,
খন্দকের যুদ্ধ	৩,০০০ ,,	১২,০০০ ,,	,,
মুতার যুদ্ধ	৩,০০০ ,,	১০,০০০ ,,	,,
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৪০,০০০ জন	২,৪০,০০০ জন	মুসলমান

কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৮,০০০ ,,	৬০,০০০ ,,	,,
স্পেনের যুদ্ধ	৭,০০০ ,,	১,০০,০০০ ,,	,,
সিন্ধুর যুদ্ধ	৬,০০০ ,,	৫০,০০০ ,,	,,

মূলত একজন প্রকৃত মুসলমান যখন কালেমায়ে তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"পাঠ করে তখন সে এক ঈমানী শক্তি অর্জন করে। তখন তাঁর মোকাবিলা করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। কিন্তু আরও শর্ত রয়েছে ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেননা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায় যেন একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ! বলেছেন আধুনিক জগত কর্তৃক স্বীকৃত অতি মহামানব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স.! কাজেই দেহ যন্ত্রে যদি কোনো গোলমাল থাকে তা নিয়ে যেমন কোনো বৃহৎ কাজ সমাধা করা যায় না তেমনি অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখার যায় না। এমতাবস্থায় শতধা বিভক্ত বিশ্বের অসুস্থ-বিকলঙ্গ মুসলিম দেহটি দিয়ে কি করে পরাশক্তিগুলো কর্তৃক সাহায্য পুষ্ট অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত রক্ত লোলুপ ইসরাঈল বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব ? অতএব মুক্তি লাভ করতে হলে ইহুদীদের সৃষ্ট মুসলিম দেহের অসুস্থতা ও বিকলঙ্গতা আগেই দূর করতে হবে—ইহুদী ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত পরাশক্তিগুলোর গোলক ধাঁধার চক্রজাল থেকে অবশ্যই প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রকে দ্রুত মুক্ত করতে হবে ; আর তখনই মহাবিজয় মুসলমানদের পদ চুম্বন করবে। এজন্য ইরাক ও ইরানকে অবশ্য যুদ্ধ পরিহার করা উচিত। কারণ অমুসলিম শক্তিগুলো সবসময় এটাই কামনা করে যে মুসলমানকে মুসলমান শক্তি দিয়েই ধ্বংস সাধন করতে হবে। আর এজন্যই নানাভাবে এবং নানা ছলে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে বন্ধু সেজে কুমন্ত্রণা দিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিপথগামী করে থাকে। মুসলমান এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর এক রাষ্ট্রকে প্ররোচিত করে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে আর একটি শক্তিশালী দলকে ব্যবহার করে মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করে। তাতেও সফল না হলে সি. আই. এ. এবং কে. জি. বি. র' এ এজেন্টরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের সামরিক বাহিনীর অতুষ্ট অথবা উচ্চাভিলাষী এক শ্রেণীকে দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে থাকে। এভাবে দেশের ভবিষ্যত একটি অনিশ্চিতের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্যই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সতর্ক বাণী শুনিয়েছেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْ ص -

"আর তোমরা সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরো একতাবদ্ধ অবস্থায় এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

পরস্পরের কলহ দ্বন্দ্ব পরিহার করার তাগিদ করে আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ط-

"আর তোমরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্ব করো না (তোমাদের অনৈক্যের কারণে) দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব দূরীভূত হয়ে যাবে।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৪৬

অতএব প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশকে অবশ্য মেনে চলতে হবে এবং সমন্বিত শক্তি দ্বারা সমস্যার সমাধানকে সহজতর করতে হবে। আর তা করতে হলে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ, সামরিক অফিসার প্রভৃতিকে ভাড়া করে দেশে না নিয়ে এসে এবং না পুষে স্বদেশীয় বুদ্ধিদীপ্ত বাছাই করা যুব শ্রেণীকে কুরআন ও হাদীসশাস্ত্রের মৌলজ্ঞান দিয়ে ঐ সকল বন্ধু ভাবাপন্ন শিল্পোন্নত দেশ-সমূহে পাঠাতে হবে সেখান থেকে তারা অত্যাধুনিক কলা-কৌশলে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে আসবে এবং দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করবে। যেমন আধুনিক রাশিয়ার জনক পিটার দি গ্রেট করেছিলেন।

তাই মুসলমান জাতিকে উদ্দেশ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ع-

"এবং তোমরা সাধ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন কর—অশ্বপালনসহ যুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা কর যদ্দারা তোমরা আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।"-সূরা আল আনফাল ঃ ৬০

বর্তমান যুগ আনবিক শক্তির যুগ। তাই আমাদের তথা বিশ্ব-মুসলিম জাতিকে অবশ্যই আনবিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। আর হতে হবে সেই সাথে একতাবদ্ধ, পরিশ্রমী এবং শীশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় ও কর্তব্যনিষ্ঠ, জ্ঞানী-গুণী, সত্য সৈনিক। এ সত্য সৈনিকদেরকে জিহাদের মাধ্যমেই মহাসাফল্য ও বিজয় আবারো মুসলমানদের পদচুম্বন করবে।

❒

নির্ঘন্ট (ইন্‌ডেক্স)

অ

আ

ই

ট

ড

ত

থ

দ

ধ

ন

প

হ

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা

১. সোভিয়েট সমীক্ষা, ১৯৮০, বর্ষ ৯, ডিসেম্বর, ১৮।
২. Jeursalem, Larry Collins and Dominique Lapierre.
৩. ছবির সাহায্যে হজ ও যিয়ারত, তালহাহ্ মওলানা এ. বি. এম. শফিকুর রহমান। ১৯৭৬
৪. আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, সফিউদ্দিন জোয়ারদার, ১৯৭৮
৫. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মুদূদী
৬. বাংলা বিশ্বকোষ
৭. বাইবেল
৮. Roum and Jerusalem, M. Waxman (Nwyork, 19118)
৯. Jsrael Society, sN. Eiesnstadt (London : Weidenfeld and Nieolson, 1967)
১০. Prelude to Israel, An Analysis of Zionist Diplonacy, 1897—1947, Alan R. Taylor.
১১. The Balfour Declarasion, Leonard Stein.
১২. Palestime the Reality, Joseph M.N. Jeffries (Newyourk : Longmens, Green and co., 1939).
১৩. Wisi Dominus, Nevill Barboun (London : George G. Harrap & co., 1946)
১৪. The Idea of Jewish state, Ben Halpern (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1961).
১৫. Zionist Archives, s/25, 4380, dated, Jedz 18, 1923)
১৬. British white paper, Command 3692.
১৭. Trial and Error.
১৮. Diplomany in the Near and Middle East, 11.
১৯. Americm Zionism and U. S. Foreign poliey (Newyork, 1962).
২০. What Price Israel ? Alfred Lilienthal, (chicago, 1953).
২১. Man chester Guardian, the Newyork Times, The Newyouk Herald Tribune, News week S London Times.
২২. U. S. Congresseonal Report, 18 December, 1947. We Need Not, Fail, Summer Welles, (Boston, 1948)

২৩. Rebirth and Destiny of Isral, David Ben Guuon, (Newyork, 1954).
২৪. Uri Rillstein, Haaretz, Angust 30th, 1968
২৫. "নয়া যুগ" পত্রিকা, ১৯৮১, ২রা মে।
২৬. U. N. Command No. 956.9 — A/658.
২৭. The Fmergence of Palestine-Arab Nasional Movement, 1918 – 1927)London Frank-Cass, 1974)
২৮. The Lesson of Palestine, Mussa Alammi, Middle East Jouranal, October, 1949.
২৯. A Soldier with the Arab, sir Bagot Glub, (London, Hadder & Stoughton, 1959).
৩০. ইহুদী চক্রান্ত, আবদুল খালেক, ১৯৬৯।
৩১. Zions Rule the world, Henry Klien, (Newyork, 1948).
৩২. দৈনিক "সংগ্রাম"
৩৩. সাপ্তাহিক "এশিয়া" (পাকিস্তান, ১৯৬৭)।
৩৪. সাপ্তাহিক "রোববার"
৩৫. সচিত্র "স্বদেশ"।
৩৬. দৈনিক "ইত্তেফাক"
৩৭. Bangladesh Times
৩৮. কুরআনের তরজমা ও তাফসীর, আবু তাহের।
৩৯. বুখারী শরীফ।
৪০. আল-মুসছেদ, লুবিছ মা'লফ।
৪১. ইসলামের ইতিহাস, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
৪২. Leagne of Nasions, Permanent Mand ates Coummission Minutes, 36 the Session.
৪৩. Government of Palestine, A survey of palestine, 1945 – '46 part I.
৪৪. The Arab-Israel war, 1948, Edgar O'Bllance, (Newyork, 1957).
৪৫. The Seven Fallen Pillars, Jon Kinche, (Newyork, 1953).
৪৬. The Revolt story of th eIrgun, Mnacgem Beigin, (Newyork, 1951).
৪৭. The Palestine Problem, Pamela Ferguson, (London : Martin Brian, 1973).
৪৮. U.N. Resolution273 (III), May 11,1949.

৪৯. "The Other Fxodus", Erskine B. Childers, London Spectator, 12 May, 1961.
৫০. U.N. Document A/5813 - NRWA Report, 1963 – '64.
৫১. The Disinherited, Fawaz Turki : Journal of a palestiman Exile (Newyork, 1972)
৫২. The Faithful City, Dov – Joseph.
৫৩. The Resurreetion of Israel, Ann Latour.
৫৪. Bitter Harvest, Sami Hadawi.
৫৫. Three Days, Zeef Sharaf.
৫৬. The Arab-Israel Dilemma, Fred J. Khouri.
৫৭. Jerusalem is called Liberty, Watter Levr.
৫৮. ইউরোপের ইতিহাস, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
৫৯. আল-আনুয়াররুল মুহাম্মাদীয়া
৬০. Archer and Kingslord – 347 (Crusades).
৬১. Bahauddins The Autobiography of Saladin, palcstin pilgrinm Text Society, 1897.
৬২. টায়ারের আর্চাবিশপম উইলিয়াম– Hostoria.
৬৩. আনুলের– "Chronicle"
৬৪. টি. এ. আর্চার – Crusade of Richard I.
৬৫. গেলি, স্ট্রেঞ্জের – Palestine under the Muslims.
৬৬. লেফটেন্যান্ট কর্নেল, সি. আর. স্যান্ডার–Latinking of Jerusalen
৬৭. Sir G. W. Cox, Bort, M.A. Crusades.
৬৮. স্টেভেনশন – Crusade in East.
৬৯. Stanely Lane-Pool, Saladin.
৭০. স্কটের – Talismean
৭১. Archibald J. Dunn – Rise and decay of the Rule of Islam
৭২. ÍThe Cupture of Acre alone was said to have cost 3,00,000 of men "– Cround work of British History, p. 97.
৭৩. Gibon, vi, 369, Decline and the fall of the Roman Empire, vol. vi.